ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

Journal of Saadat College

Volume-04 December 2023

Govt. Saadat College
Karatia, Tangail, Bangladesh
Phone & Fax: +88-0921-62559, Cell: 01777-486054
E-mail: principalsaadatcollege@gmail.com, Web: www.saadatcollege.gov.bd

J ournal of Saadat College

Volume-04 December 2023

Govt. Saadat College

Karatia, Tangail, Bangladesh

Phone & Fax: +88-0921-62559, Cell: 01777-486054

E-mail: principalsaadatcollege@gmail.com

Web: www.saadatcollege.gov.bd

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

Editorial Board

Chief Adviser : **Professor Subrata Nandi**
Principal, Govt. Saadat College

Advisor : **Professor Sultan Ahmed**
Vice Principal, Govt. Saadat College

Editor : **Professor Dr Tahmina Khan**
Head of the Department
Department of History, Govt. Saadat College

Executive Editor : **Solaiman Kabir PhD**
Associate Professor, Department of History,
Govt. Saadat College

Member : **Professor Dr Md. Saiful Malek Ansari**
Department of Economics, Govt. Saadat College

: **Sheikh Farid M Phil**
Associate Professor, Department of Political Science
Govt. Saadat College

: **Dr Arman Hossain Azam**
Assistant Professor, Department of Bangla
Govt. Saadat College

Price : BDT 400.00
USD 8.00

Cover Design : **Binay Krishna Dey**

Printed by : **Lubdhak Computer Gateway**
CDC Shopping Complex, Tangail
Cell: 01623-558595

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023
ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

সূচিপত্র

মো. আমির হোসেন
বাংলাদেশের রম্যরচনা: বিষয়দর্শন ও প্রবণতা **5**

ড. আরমান হোসাইন আজম
স্মৃতিকথায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অগ্নিসংযোগ প্রসঙ্গ **23**

ওয়াসীম পারভেজ সিদ্দিকী
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রণদাপ্রসাদ সাহা **40**

প্রফেসর ড. তাহমিনা খান
পূর্ববাংলার সাংগঠনিক রাজনীতি ও যুবসমাজ: ১৯৪৭-৫৭ **55**

মোহাম্মদ আব্দুস সবুর
সুলতানি ও মোগল আমলে রচিত বাংলা কাব্যে বাঙালি ও বাঙালিত্ব **84**

শেখ ফরিদ
১৯৪৯ সালের টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে শামসুল হকের বিজয় পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের বাঁক **106**

সুলায়মান কবীর
আঞ্জুমানে ইসলামি: বাংলার প্রথম মুসলিম সংগঠন **128**

S.M. Afzal Hossain, M Azizul Islam Kazi, Md. Aminul Ahsan, M. Zahurul Alam Chowdhury, Zainul Abedin Siddique
Presence of Trace and Toxic Metals in Pulses, Spices and Sauces in South-eastern Region of Bangladesh **139**

Ferdousi Akter and M. Abdul Aziz
Do Birds Prefer Native Plants over the Non-native one? A Comparative Analysis Using Avian Diversity Index in Human-dominated Landscape of Bangladesh **152**

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

Khadija Aktar
Bangladesh's Foreign Policy Peaceful Coexistence Views of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman **164**

Md. Sirajul Islam, A.K.M. Mohiuddin, A.K. Obidul Huq and Ajmer Singh Malik
Institutional Quality Assurance at Higher Education in Bangladesh: A Study in the Mawlana Bhashani Science and Technology University, Bangladesh **178**

গ্রন্থালোচনা
সানজিদা আক্তার কেয়া, শিপন রহমান
সুলায়মান কবীরের বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী একটি পর্যালোচনা **199**

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

বাংলাদেশের রম্যরচনা: বিষয়দর্শন ও প্রবণতা

মো. আমির হোসেন*

সারসংক্ষেপ: রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সাহিত্য, শিক্ষা, ভ্রমণ, ভোজন-সহ চলমান জীবন ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র বিষয় নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের রম্যরচনা। এক কথায় বলা যায়, বাংলাদেশের রম্যলেখকগণ রম্যরচনার স্বাধীনতাকে পূর্ণ ব্যবহার করে বিচরণ করেছেন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে। বিষয়বৈচিত্র্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের রম্যরচনায় বহুমুখী প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। লেখকগণ তাঁদের নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করেছেন। বাংলাদেশের রম্যরচনায় একদিকে যেমন রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নানা অসঙ্গতির প্রতি ব্যঙ্গের কশাঘাত, অন্যদিকে রয়েছে সমাজবাস্তবতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের হাস্যরসাত্মক উপস্থাপন। অপরাপর বিষয়সমূহ উপস্থাপনেও লেখকদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের রম্যরচনায় লেখকগণ কী কী বিষয় উপস্থাপন করেছেন এবং বিষয় নির্বাচনে তাঁদের প্রবণতাসমূহ কী তা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের রম্যরচনার বিষয়দর্শন ও প্রধান প্রবণতাসমূহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করাই বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। যদিও বাংলাদেশের রম্যরচনার বিষয়বৈচিত্র্য, প্রবণতা ও প্রকরণশৈলী নিয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

১. ভূমিকা

রম্যরচনা প্রবন্ধের একটি বিশেষ ধরন যেখানে ব্যক্তিনিষ্ঠতা, কাব্যগুণ ও সরসতা থাকে। বস্তুনিষ্ঠ ও মননশীল প্রবন্ধে কাব্যগুণ ও সরসতা থাকলেও, রম্যরচনা মূলত হালকা চালের সাহিত্যিক রচনা যা পাণ্ডিত্য ও তথ্যপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ থেকে দূরবর্তী। রম্যরচনাকে লঘুনিবন্ধ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, আমেজি সাহিত্য, বৈঠকি রচনা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধরনের রচনার নাম দিয়েছেন বিচিত্র প্রবন্ধ। কেউ বলেছেন ব্যঙ্গ বা রসাত্মক রচনা। যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন রম্যরচনার মূল উদ্দেশ্য খোশ মেজাজে গল্প করা।[২] ইংরেজি সাহিত্যে রম্যরচনা বেশ পুরোনো হলেও, বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার বয়াস দেড়শো বছরের কিছু বেশি। উনিশ শতকে কালীপ্রসন্ন সিংহের হাত ধরে এই ধরনের রচনার সূত্রপাত হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত রম্যরচনা নামে না হলেও একই আঙ্গিক ও গঠনের নানা রসের রচনার আবির্ভাব লক্ষ

***পিএইচডি গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।**

করা যায় বাংলা সাহিত্যে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশকে এই ধরনের রচনার ব্যাপক চর্চা পরিলক্ষিত হয়।[৩]

বাংলাদেশের সাহিত্যে রম্যরচনার সূত্রপাত ঘটে আবুল মনসুর আহমেদের (১৮৯৮-১৯৭৯) হাত ধরে।[৪] এরপর মাহ্‌বুব উল আলম (১৮৯৮-১৯৯৪), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪), কাজী দীন মোহাম্মদ (১৯০৯-১৯৭৫), আসহাবউদ্দীন আহমদ (১৯১৪-১৯৯৪), লুৎফর রহমান সরকার (১৯৩৪-২০১৩), খোন্দকার আলী আশরাফ (১৯৩৬-২০১৫), আবদুশ শাকুর (১৯৪১-২০১৩), আতাউর রহমান (১৯৪২-২০২১), ফরহাদ খান (১৯৪৪-২০২১), আনিসুল হক (১৯৬৫-), রণজিৎ বিশ্বাস (১৯৬৫-২০১৬) প্রমুখ বাংলাদেশের রম্যরচনার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়া হানিফ সংকেত (১৯৫৮-) এবং হুমায়ূন আহমদের (১৯৪৮-২০১২) নামও উল্লেখ করা যায়। সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) এবং গোলাম মুরশিদের (১৯৪০-) মতো মননশীল ও বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের লেখক ও গবেষকও কখনো কখনো রম্যরচনায় হাত দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে আরও অনেকে রম্যরচনায় অবদান রাখছেন। সকলের নাম অর্ন্তভুক্ত করা হলে তালিকাটি আরও দীর্ঘ হতে পারে। লেখকগণ একদিকে যেমন বিষয়নিষ্ঠ-মননশীল প্রবন্ধ রচনায় অবদান রেখেছেন, তেমনি রম্যরচনায়ও তাঁদের অবদান উল্লেখ করার মতো। এঁদের রম্যরচনার বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র, তেমনি প্রবণতার দিক থেকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এঁদের রম্যরচনা বিশ্লেষিত হলে বাংলাদেশের রম্যরচনার বিষয়দর্শন ও প্রবণতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

২. রম্যরচনার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

'রম্য' শব্দের আভিধানিক অর্থ রমণীয়, মনোরম বা সুন্দর। আভিধানিক অর্থ বিবেচনা করলে সংজ্ঞাটিকে ব্যাপক বলেই মনে হয়। কারণ, যেকোনো সাহিত্যকে সাহিত্য হতে হলে রসোত্তীর্ণ হতেই হয়। আর যে রচনা রসোত্তীর্ণ, তা নিঃসন্দেহে রমণীয় বা সুন্দর। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে সব ধরনের সাহিত্যকেই রম্যরচনা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তারপরও রম্যরচনা বলতে এক ধরনের বিশেষ সাহিত্যরীতিকে বোঝানো হয়। সাধারণভাবে রম্যরচনা বলতে হাস্যরসাত্মক লঘু রচনাকে বোঝায়। ইংরেজি সাহিত্যে এক ধরনের রচনা রয়েছে, যার নামকরণ করা হয়েছে 'বেল লেতর' (Belles Lettres)। নামটি এসেছে ফরাসি ভাষা থেকে। ইংরেজি ভাষায়ও একে 'বেল লেতর'ই বলা হয়। অষ্টাদশ শতকের শুরুতে জোনাথন সুইফট ইংরেজি সাহিত্যে শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেন।[৫] আকর্ষণীয় ঈষৎ লঘু ঢঙে রচিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অভিধাটি ব্যবহার করা হয়।[৬] এগুলো হালকা চালের

সাহিত্যিক রচনা। এরই বাংলা নাম রম্যরচনা। ভারতকোষে প্রবন্ধসাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে– যুক্তিমালার বিন্যাসপ্রধান বুদ্ধিসাপেক্ষ প্রবন্ধ এবং রসানুভূতির আবেদনপ্রধান রম্যরচনা।[৭] রম্যরচনা মূলত লঘুচালে লিখিত হাস্যরসমিশ্রিত সুখপাঠ্য রচনা।[৭] একটি রচনা তখনই রম্যরচনা হিসেবে গণ্য হবে যখন লেখক নিজের মনের খেয়াল-লঘুচিন্তা ললিত ভাষায় হালকাভাবে বর্ণনা করে পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পারবেন। কোনো কোনো রম্যরচনায় ছোটগল্পের উপাদান থাকতে পারে। কারণ, লেখক অনেক সময় একটি কাহিনিসূত্র অবলম্বন করে অগ্রসর হন। কিন্তু ছোটগল্পের যে সুসংহত বন্ধন থাকে, রম্যরচনা তা থেকে মুক্ত।[৮] রম্যরচনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন–

> আপন স্বভাবের সঙ্গে মিশ খেয়ে গেলে যে জিনিসের সৃষ্টি হয় তা লেখককে যতখানি আনন্দ দেয়, পাঠককে ততখানি। স্বভাবজাত বলেই এ জিনিস স্বতঃস্ফূর্ত। যত্নকৃত অধ্যাবসায় দ্বারা এ জিনিস আয়ত্ত করা সম্ভব নয়– ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। কেননা এখানে বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশটা বড় কথা নয়, আসল কথাটা হলো ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এজন্য ইংরেজি সাহিত্যে এর নাম হয়েছে Personal Essay বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। সোজা কথায় জিনিসটা হলো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালী চিত্তের ক্ষণকালীন বহিঃস্ফুরণ। ইংরেজ মনীষী একে বলেছেন– A loose sally of the mind. আমরা এরই নাম দিয়েছি রম্যরচনা।[৯]

সাহিত্যের প্রতিটি শাখারই বিশেষ কিছু প্রকরণশৈলী বা গঠনশৈলী থাকে, যার মাধ্যমে ঐ শ্রেণির সাহিত্যকে নির্দিষ্ট শাখায় বিন্যস্ত করা যায়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো রম্যরচনাকেও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে রম্যরচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়– এই ধরনের রচনায় থাকবে হালকা বৈঠকি চাল, ঘরোয়া মেজাজ, লঘু হাস্যরস। ভাষা, আঙ্গিক ও বিষয়ে সর্বদাই ভার বর্জনের প্রয়াস থাকবে। পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা যেমন থাকবে না, তেমনি কোনো গভীর তত্ত্বকথা প্রচারের তাগিদও থাকবে না।[১০] সেই সাথে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব প্রমাণের চেষ্টাও থাকবে না। গম্ভীর আলোচনা বা বিশ্লেষণের পরিবর্তে মজাদার আলাপচারিতার প্রাধান্য থাকবে। কৌতুক, বিদ্রুপ, শ্লেষ, ব্যঙ্গ-সহ যাবতীয় কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হাসি সৃষ্টির প্রয়াস থাকবে। রম্যরচনায় সর্বত্রই থাকে এক ধরনের আড্ডার মেজাজ। ফলে আলোচনার কোন কথাটি কখন মুখ্য কথায় পরিণত হয়, সে ব্যাপারে সবসময় লেখকের নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে মনে হয় না।[১১] রম্যরচনার বিষয় খুবই গুরুগম্ভীর হতে পারে কিন্তু ভাষা বা প্রকাশভঙ্গী গুরুগম্ভীর হলে চলবে না। পাঠকের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলাই রম্যরচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেবল সুনিশ্চিত লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না রেখে, তথ্য ও তত্ত্বের চাপে ভারাক্রান্ত না করে নিজের হৃদয়ের সংবাদ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই থাকে লেখকের মৌল উদ্দেশ্য।[১২]

৩. বাংলাদেশের রম্যরচনার পরিচয়

বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার সূত্রপাতের পর থেকে অনেক লেখক এই শাখাটিকে আলোকিত করেছেন। বাংলাদেশ পর্বের রম্যরচনার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বাংলাদেশ পর্বের রম্যলেখকগণের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন– *আয়না* (১৯৩৫), *ফুড কনফারেন্স* (১৯৪৮), *আসমানী পর্দা* (১৯৫৭) ও *গালিভরের সফরনামা* (১৯৫৯)। মাহ্‌বুব উল আলম লিখেছেন– *গোঁফসন্দেশ* (১৯৫৩), *পল্টনে* (১৯৯৮), *রঙবেরঙ* (১৯৯৮), *সাতসতেরো* (২০০২) এবং *প্রধান অতিথি ও তাজা শিঙ্গি মাছের ঝোল* (২০০২)। শেষ চারটি রম্যরচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরচনার মধ্যে *পঞ্চতন্ত্র* (প্রথম পর্ব ১৯৫২ এবং দ্বিতীয় পর্ব ১৯৬৬), *ময়ূরকণ্ঠী* (১৯৫৭), *ধূপছায়া* (১৯৫৭), *চতুরঙ্গ* (১৯৬০) ও *হাস্যমধুর* (১৯৬৫) উল্লেখযোগ্য। আসহাবউদ্দীন আহমদের রম্যরচনার মধ্যে *ধার* (১৯৫০), *সের এক আনা মাত্র* (১৯৬০), *হাতের পাঁচ আঙ্গুল* (১৯৭০), *দাড়ি সমাচার* (১৯৭১), *দামশাসন দেশশাসন* (১৯৮৫) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খোন্দকার আলী আশরাফ লিখেছেন *দুর্জন উবাচ* (১৯৭৬)। আবদুশ শাকুর লিখেছেন *চুয়াত্তরের কড়চা* (১৯৮১), *মধ্যবিত্তের কড়চা* (১৯৮৫) *ভেজাল বাঙালি* (২০০৯), *নির্বাচিত কড়চা* (২০১০), *করিবকর্মা* (২০১৩) ইত্যাদি রম্যরচনা। ফরহাদ খানের রম্যরচনার সংখ্যা পাঁচটি– *অ্যাকাডেমিক শিরঃপীড়া ব্যুরোপ্যাথি ও অন্যান্য* (১৯৮৬), *চিত্র ও বিচিত্র* (১৯৯৯), *বাঙালির বিবিধ বিলাস* (২০০৯) *অরণ্যে বিশ্বাসের বলি ও অন্যান্য* (২০২০) এবং *স্মৃতিমেদুর যতো গল্প-কথা* (২০২২)। লুৎফর রহমান সরকার লিখেছেন– *দৈনন্দিন* (১৯৭৬), *সূর্যের সাত রং* (১৯৭৬), *জীবন যখন যেমন* (১৯৮০), *কতিপয় জনপ্রিয় কার্যকলাপ* (১৯৮৮)। রণজিৎ বিশ্বাস লিখেছেন– *রম্যকথার এক ঝাঁপি* (২০১৫), *রম্যারম্য বচনকথন* (২০১৫), *পুরো সিরিয়াস আধা রম্য* (২০১৬) প্রভৃতি রম্যরচনা। আতাউর রহমানের রম্যরচনার মধ্যে *নঞ্ তৎপুরুষ* (১৯৯৩), *অল্প অল্প বিস্তর মধুর* (২০০৬), *যৎকিঞ্চিৎ* (১৯৯৯), *ষষ্ঠী তৎপুরুষ* (২০১১), *দুই দুগুণে পাঁচ* (২০১২), *রম্য রত্ন সম্ভার* (২০১৬), *সাত সতেরো* (২০১৮), *সেরা রম্য* (২০১৮), *বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনী ও রম্য-কাহিনী* (২০১৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুমায়ূন আহমেদের *এলেবেলে প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব* (১৯৯০) এবং *হিজিবিজি* (২০১৩) গ্রন্থেও রম্যরচনার লক্ষণ দেখা যায়। হানিফ সংকেতের রম্যরচনার মধ্যে *বিনীত নিবেদন* (১৯৯৯), *আটখানার পাটখানা* (১৯৯৯), *নিয়মিত অনিয়ম* (২০১৩), *ফুলের মত পবিত্র* (২য় মুদ্রণ ২০১৩), *খবরে প্রকাশ* (২য় মুদ্রণ ২০১৩), *প্রতি ও ইতি* (২য় মুদ্রণ ২০১৩), *হামানদিস্তা* (২য় মুদ্রণ ২০১৩), *এপিঠ ওপিঠ* (৩য় মুদ্রণ ২০১৮), *সৎ খোঁজার পথ খোঁজা* (২০১৭), *টনক নড়াতে টনিক* (২০২০),

আবেগ যখন বিবেকহীন (২০২৩) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আনিসুল হকের রম্যরচনার মধ্যে রয়েছে– *অশ্বডিম্ব* (২০০০), *সেই গাধা সেই পানি* (২০০২), *রাজা যায় রানি আসে* (২০০৭), *ছাগলতন্ত্র* (২০০৭), *সরস কথা নিরস কথা* (২০০৭), *হাসতে হাসতে খুন* (২০১৪) ইত্যাদি। তাঁর রম্যরচনা নিয়ে চার খণ্ডে *গদ্যকার্টুন সমগ্র* প্রকাশিত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের *কথা সামান্যই* (২০০৬) গ্রন্থটি রম্যরচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এছাড়া গোলাম মুরশিদের *নারী ধর্ম ইত্যাদি* (২০০৭) গ্রন্থের বেশ কিছু রচনায় রম্যরচনার লক্ষণ দেখা যায়।

৪. বাংলাদেশের রম্যরচনার বিষয়দর্শন ও প্রবণতা

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো রম্যরচনার কারবার জীবন নিয়ে। জগৎ ও জীবনের সবকিছুই রম্যরচনার বিষয় হতে পারে। জীবন ও অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় রম্যরচনা থেকে বাদ পড়ে না। বিষয় বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সীমাহীন কল্পনাও এতে পাখা বিস্তার করে। বাংলায় 'রম্য' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে 'রম্' ধাতু থেকে। এর অর্থ ক্রীড়া করা। অর্থাৎ যেকোনো বিষয় নিয়ে লেখক রচনা শুরু করতে পারেন। গুরুগম্ভীর ও বহুল আলোচিত বিষয় থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র-সাধারণ বিষয়ও রম্যরচনায় সমানভাবে স্থানলাভ করতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন হয় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুগভীর অভিজ্ঞতা। সুগভীর জীবনাভিজ্ঞতার কারণেই রম্যলেখক বিচরণ করেন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে। সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে রম্যরচনার বিষয়েও এসেছে বহুমাত্রিক পরিবর্তন। বাংলাদেশ পর্বের রম্যরচনার বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্যপূর্ণ। লেখকগণ বিচিত্র বিষয়ে লঘু ভঙ্গিতে তাঁদের ভাব-কল্পনাকে প্রকাশ করেছেন। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভ্রমণ, ভোজন-সহ জীবন ও অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ই রম্যরচনায় উপস্থাপিত হয়েছে। প্রেম ও বিরহের মতো রোমান্টিক বিষয়ও রম্যরচনা থেকে বাদ যায়নি। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে লেখকদের নিজস্ব প্রবণতার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। রম্যরচনায় একদিকে যেমন রয়েছে নানা অসংগতির প্রতি ব্যঙ্গের কশাঘাত, অন্যদিকে রয়েছে সমাজবাস্তবতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের হাস্যরসাত্মক উপস্থাপন। অপরাপর বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যবিষয়ক লেখায় ইতিবাচকভাবেই হোক আর নেতিবাচকভাবেই হোক ব্যক্তিত্ব কোনো না কোনো ভাবে উপস্থিত থাকেই।[১৩] এসব বিবেচনায় বাংলাদেশের রম্যরচনার বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রবণতা আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের রম্যলেখকদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন একাধারে আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক। যদিও তাঁর সর্বাধিক সাফল্য সাহিত্যিক

হিসেবে। বাংলাদেশের সাহিত্যে রম্যরচনার অগ্রপথিকও তিনি। জীবনের বিচিত্র কর্মযজ্ঞের অভিজ্ঞতাকে তিনি সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। রাজনীতির অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছেন নির্বাচনের নামে প্রহসন, ভোট কেনাবেচার ব্যবসা, মন্ত্রিত্বের কল্যাণে পকেট ভারী করার কৌশল, শাসনের নামে শোষণ, ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য নিজের দলের প্রতি অপরিমেয় ভক্তি ও প্রীতি, পারমিটবাজদের তোষণনীতি, ফটকাবাজি ব্যবসায় আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার ব্যাপার, দলীয় স্বার্থের খাতিরে দলন ও দমননীতি, সামাজিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দলাদলি, দুর্বলের ওপর সবলের নিপীড়ন, ব্যাভিচার, অনাচার ও মিথ্যাচার। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন ভণ্ডামি, মূর্খতা, ধর্মের নামে গোঁড়ামি, লোভ-লালসা, আসঙ্গ-লিপ্সা, কুসংস্কার ও মোল্লা-মৌলভীদের পারস্পরিক কুৎসা রচনা, হীনম্মন্যতা, ইসলামী শিক্ষার নামে প্রতিবাদী ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িক কলহে ইন্ধন সৃষ্টি।[১৪] এসব অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি রম্যরচনায় সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয়ের অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন। হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় চরিত্রের বাস্তব দিক এবং বাঙালি চরিত্রের নানা দিকও রূপায়িত হয়েছে তাঁর রম্যরচনায়। আপাত কৌতুকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গভীর দুঃখবোধ স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। বাঙালি চরিত্রের নানা কর্মকাণ্ড পাঠকের মধ্যে প্রচুর হাসির উদ্রেক করলেও, হাসির পেছনে আবুল মনসুর আহমদ অন্তরের যে গভীর বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা পাঠকের নজর এড়িয়ে যায় না। তাঁর রচনায় যে প্রবণতা ও রাজনীতি-সচেতনতা রয়েছে, সমসাময়িক অন্য কারও রচনায় তা দেখা যায় না।[১৫] ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত *আয়না* এবং বাংলাদেশ পর্বে প্রকাশিত তিনটি-সহ মোট চারটি রম্যরচনার বিষয়কে রাজনীতিবিষয়ক, ধর্মবিষয়ক ও অর্থনীতিবিষয়ক – প্রধানত এই তিন ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে। রাজনীতিবিষয়ক রম্যরচনার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে– ভারতবর্ষে ব্রিটিশের বিভাজননীতি ও হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর, সংগঠন, ব্রিটিশপ্রদত্ত খেতাবপ্রীতি, নির্বাচন ও নির্বাচনসংশ্লিষ্ট বিষয়, সরকারের নানা নীতি ও রাজনৈতিক ভণ্ডামি প্রভৃতি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মাযহাব নিয়ে বিরোধ, পীরপ্রথা ও মাজার ব্যবসা, ধর্মীয় নিয়ম পালনে বাড়াবাড়ি ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে ধর্মবিষয়ক রম্যরচনায়। অর্থনীতিবিষয়ক রম্যরচনায় বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ, দেশভাগপূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বাঙালির ব্যবসা-সম্পর্কিত অনৈতিক অবস্থা, লবণ সংকট প্রভৃতি।

বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ সমকালীন সমাজ ও জীবনের বাইরে যাননি বরং বিষয় নির্বাচন করেছেন সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতার মধ্য থেকেই। কাহিনির বিন্যাসেও ব্যবহার করেছেন সমকালীন তথ্য।

সমাজমানসের অসংগতি নির্দেশই তাঁর রম্যরচনার প্রধান উদ্দেশ্য বলে প্রতিভাত হয়। ইংরেজের বিভেদনীতি, দেশসেবার নামে ভণ্ডামি, রাজনীতির ক্ষেত্রে আদর্শহীনতা, সমকালীন সংকট, ধর্মব্যবসা, রক্ষণশীলতা প্রতি ক্ষেত্রেই সংকটের স্বরূপ অনুধাবনে তাঁর চেতনা যেমন স্পষ্ট, তেমনি ব্যঙ্গের শাণিত কশাঘাতও নির্মম।[১৬] সবক্ষেত্রেই সমাজ সংশোধনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা ও সমাজকল্যাণের আকাঙ্ক্ষা আবুল মনসুর আহমদের রম্যরচনার পেছনে কাজ করেছে। তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও দেশের মানুষের চৈতন্য জাগরণ। একারণেই তাঁর সাহিত্য দেশ ও দেশের মানুষের কাছে তাৎপর্যবহ।[১৭] বিষয় উপস্থাপন করতে গিয়ে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কারও প্রতি গালিগালাজ করেননি। ল্যাম্পুন, ইনভেকটিভ বা কোনো বিশেষ ব্যক্তির কুৎসা-কাহিনি রচনা না করে রূপক ও আয়রনির মাধ্যমে বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন।[১৮] ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আঘাতে সমাজ ও দেশের চৈতন্য জাগরণ ছিল আবুল মনসুর আহমদের মৌল প্রবণতা। এ কারণেই তাঁর রম্যরচনার পেছনে রয়েছে তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা বা সমাজ-কল্যাণ উদ্দেশ্য।[১৯] তিনি দুঃখকে ব্যক্ত করেছেন পরিহাস দিয়ে। সমসাময়িক সমাজ বা জাতীয়জীবনের যেসব অসঙ্গতি তাঁকে পীড়া দিয়েছে, সেসব বিষয়কেই তিনি রম্যরচনায় বিদ্রুপবাণে বিদ্ধ করেছেন।

আবুল মনসুর আহমদের প্রায় সমসাময়িক সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলাদেশের রম্যরচনাকে নিয়ে গিয়েছেন অনন্য উচ্চতায়। মজলিসি ভঙ্গি আর অসাধারণ রচনাশৈলীর মাধ্যমে রম্যরচনায় তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় ও তথ্য পরিবেশন করেছেন। *মুজতবা আলী রচনাবলির* একাদশ খণ্ডে সম্পাদকমণ্ডলী স্বীকার করেছেন– বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও বহুমুখী আলোচনার জন্য মুজতবা-সাহিত্যের শ্রেণিকরণ করা দুরূহ।[২০] ধর্ম-ভাষা-সাহিত্য থেকে রাজনীতি-সমাজচিন্তা একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতি এমনকি ফুটবল খেলা পর্যন্ত তাঁর রচনার বিষয়সীমায় ধরা পড়েছে। কথকের মেজাজে অলস আড্ডার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বাক্যাবলি জ্ঞানভান্ডারের একেকটি উজ্জ্বল মুক্তোমালা বিশেষ।[২১] তারপরও মুজতবা আলীর রম্যরচনার বিষয়কে মোটা দাগে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন– ধর্মবিষয়ক, ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক, চরিতকথা এবং ভ্রমণবিষয়ক। ভ্রমণবিষয়ক রম্যরচনায় নিসর্গ বর্ণনার পাশাপাশি বিচিত্র ধারার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ লক্ষ করা যায়। এছাড়াও রয়েছে ভোজন ও শিক্ষাবিষয়ক রম্যরচনা। বিদেশে শিক্ষাগ্রহণ ও ভ্রমণে তিনি নিজে সমৃদ্ধ হয়েই থেমে থাকেননি বরং সাহিত্যে সেই রস পরিবেশন করেছেন। বলা যায়, তাঁর সব রম্যরচনাই বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির ফসল, রয়েছে বহুমুখী মনোভাবের প্রকাশ। রসিকতার পেছনে তিনি যে বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তা নিছক রসিকতাই নয় বরং পেছনে লুকিয়ে রয়েছে গূঢ় বক্তব্য।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রায় সব রচনাই আড্ডার মেজাজে লেখা। রম্যরচনাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাঁর সব রম্যরচনাই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ফসল। রম্যরচনায় বিচিত্র তথ্যের সম্মিলন ঘটালেও কাউকে জ্ঞান দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। রসিকতার মাধ্যমে তিনি যে বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তা সবসময় রসিকতা নয়, বরং অনেকক্ষেত্রেই লুকানো রয়েছে গূঢ় বক্তব্য। তাঁর কোমলহৃদয় হাহাকার করে উঠেছে অত্যাচার, দুঃখ ও শোক, নিরপরাধ লোকের শাস্তিভোগ দেখে। যদিও পড়তে শুরু করলে মনে হয় তিনি হাসাতে বসেছেন, কিন্তু তা হাসি নয়, অনেকক্ষেত্রেই তা কান্নার ছদ্মবেশ। ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছেন অনেক, কিন্তু তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে অশ্রুসজল দুটি চোখ।[২২] সৈয়দ মুজতবা আলীর আপাতদৃষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আড়ালে লুকিয়ে আছে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা, পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্যের নিচে লুকিয়ে আছে অকৃত্রিম সারল্য। হালকা মেজাজের নিচের স্তরে আছে গভীর সংবেদনশীল মন। তাঁর রম্যরচনার প্রবণতাও বহুমুখী। পাঠবিমুখ ও বই কেনায় বাঙালির অনীহার প্রতি বিদ্রুপ, পুস্তক ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক বুদ্ধির সমালোচনা, অর্থকৃচ্ছ্রতায় পঙ্গু লেখক সম্প্রদায় এবং এ বিষয়ে সরকারের অস্বচ্ছ নীতির প্রতি বিদ্রুপ; স্বজনবিয়োগে গভীর শোক ও তাঁদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকাশ; বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ; সাহিত্য-সাহিত্যিক বিষয়ে নিজস্ব অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ; ভারতবর্ষের বৈদগ্ধের উত্তরাধিকার অটুট রাখার আহ্বান; বহির্বিশ্বে ভারতের সংস্কৃতির বিনিময় ও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের মহত্তম রূপায়ণ; শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি; ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের আত্মস্বার্থবাদী মনোভাবের প্রতি বিদ্রুপ; ব্রিটিশ বিদ্বেষ; পুঁজিবাদী শক্তির শোষণনীতির সমালোচনা; ধর্মীয় নিয়ম পালনে বাড়াবাড়ি ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতি বিদ্রুপ; রন্ধন-ভোজন বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ; তীব্র রবীন্দ্রানুগত্য; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রকাশ ইত্যাদি তাঁর রম্যরচনার প্রধান প্রবণতা।

বাংলাদেশের রম্যরচনায় সৈয়দ মুজতবা আলীর পরেই আসে আসহাবউদ্দীন আহমদের নাম। তাঁর রম্যরচনায় সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে সরস ব্যঞ্জনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন সফল শিক্ষক, সরস লেখক ও নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান আমলে এক বছর জেল খাটেন এবং প্রায় ১৫ বছর আত্মগোপন করে জীবন কাটান। কারাবাস এবং অজ্ঞাতবাসের কারণে সৃষ্ট সমাজচেতনা ও গভীর জীবনবোধ থেকেই তাঁর সাহিত্য উৎসারিত হয়েছে।[২৩] জীবনের অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করেছেন লেখার বিষয় হিসেবে। তাঁর রম্যরচনায় হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে সমকালীন রাজনীতি,

সমাজবাস্তবতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য-অবিচার এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। তাঁর লক্ষ্যই সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরা। এ কারণেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন– মরিচ, পেঁয়াজ, তেল, নুন, শুঁটকি মাছ থেকে শুরু করে কাঠ, খড়, বাঁশ, কালি, কলমের পাশাপাশি উগ্র জাতীয়তাবাদের দংশন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে লুটেরা বুর্জোয়াদের লেজুরবৃত্তি, ধর্মের নিশান উড়িয়ে ব্যাপক নরহত্যা ও নারীধর্ষণ– যা কিছু মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে– সবই তাঁর রম্যরচনার উপাদান।[২৪]

আসহাবউদ্দীন আহমদের রম্যরচনার বিষয়বৈচিত্র্য থেকেই অনুমান করা যায় যে, সমকালীন সমাজব্যবস্থার ওপর সীমাহীন অনাস্থা ও ক্রোধের প্রকাশ ঘটানোই মূল প্রবণতা। বদরুদ্দীন উমরের মতে, তাঁর রচনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাঠকের সামনে বিদ্যমান সমাজের স্বরূপ উন্মোচন। তিনি বিষয়ের অবতারণা করতেন হালকাভাবে এবং উপহাসের মাধ্যমে শোষক-শাসকদের রীতিনীতি, অভ্যাস, আচরণ, শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতেন উপহাসের মাধ্যমে।[২৫] অকৃত্রিম সারল্য, হাস্যকৌতুক ও যুক্তির সমাহার তাঁর রম্যরচনাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। সমকালীন সমাজকাঠামোর ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সংকল্প করেছিলেন তাকে ভেঙে ফেলার জন্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই যোগ দিয়েছিলেন সক্রিয় রাজনীতিতে। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছাড়া কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয় বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার ভেতরের অসামঞ্জস্য-প্রতারণা-আদর্শহীনতা দেখে তিনি আরও বেশি তৎপর হয়ে উঠেছেন। এসবই তিনি প্রকাশ করেছেন লেখার মাধ্যমে। রম্যরচনাতেও তাঁর স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। ক্রোধ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তিনি হাস্যরসকে বেছে নিয়েছেন। জনপ্রিয় ও বক্তব্যসর্বস্ব রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে যেভাবে তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, তাতে মুহূর্তেই তাঁদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়ে ওঠে। নেতাদের ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতাও তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। বলা বাহুল্য, এসব কিছুই তিনি করেছেন হাস্যরসের মাধ্যমে। একটি উন্নত জীবনব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা তাঁর লেখনী ধারণের পেছনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। নিজেকে নিয়ে কৌতুক করতেও তিনি দ্বিধা করেননি।

বাংলাদেশের আরেকজন রম্যলেখক লুৎফর রহমান সরকার জীবনের বিচিত্র প্রবাহকে রম্যরচনায় উপস্থাপন করেছেন। জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সামাজিক বাস্তবতার দৃষ্টিতে। অসামান্য দক্ষতার সাথে সামাজিক অন্যায়-অবক্ষয়কে তীক্ষ্ণ-তীর্যক ও রসাত্মক ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। আসহাবউদ্দীন আহমদের রম্যরচনায় যেখানে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়, লুৎফর রহমান সরকার সেখানে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সমাজবাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর রম্যরচনার মূল বিষয় মানুষ ও সমাজবাস্তবতা। সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে তিনি

গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। রম্যরচনায় তাঁর গভীর জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমাজবাস্তবতা ব্যঙ্গের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর রম্যরচনায়। ছিনতাই, চৌর্যবৃত্তি, ভেজাল, ভিক্ষাবৃত্তি, প্রতারণা, কালোবাজারির মতো সামাজিক অবক্ষয়কে তিনি যেমন ব্যঙ্গ করেছেন, তেমনি বাঙালি চরিত্রের নানা অসঙ্গতিকেও উপস্থাপন করেছেন সরস ভঙ্গিতে। দাম্পত্য থেকে শুরু করে রাজনীতির মাঠ পর্যন্ত বিচরণ করেছেন রম্যরচনায়। সবকিছুর অন্তরালে তাঁর গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে জীবনকে উপস্থাপন করা লুৎফর রহমান সরকারের মূল প্রবণতা। সমাজের নানা অন্যায়-অসংগতিতে তিনি ভাবিত হয়েছেন। রম্যরচনায় সেগুলোকে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু প্রতিকারের প্রত্যাশায় আঘাত করেননি। তাঁর কিছু রম্যরচনার শিরোনামের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে– 'ছিনতাই আজকাল বড়ই জনপ্রিয় ব্যাপার', 'চৌর্যবৃত্তির জনপ্রিয়তা', 'জ্ঞানের চেয়ে সার্টিফিকেট দামী', 'মানুষের চেয়ে মানিব্যাগ দামী' ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, জীবনযন্ত্রণাকে তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। ব্যঙ্গের মাধ্যমে তাঁদের অচেতন মনকে উচ্চকিত করার সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায় লুৎফর রহমান সরকারের রম্যরচনায়। তবে তিনি কাউকে আঘাত করেননি বরং নিজের মতো করেই লঘুভঙ্গিতে বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন।

লুৎফর রহমান সরকারের প্রায় সমসাময়িক খোন্দকার আলী আশরাফের নাম বাংলাদেশের রম্যরচনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। সমকালীন সমাজবাস্তবতা, অর্থনীতি ও রাজনীতির নানা অনুষঙ্গকে তিনি রম্যরচনার বিষয় করেছেন। 'দুর্জন উবাচ' শিরোনামে পত্রিকায় কলাম লিখতেন। পরবর্তীকালে এই শিরোনামেই তাঁর রম্যরচনা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে দুরবস্থা দেখা দিয়েছিল তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন এসব রচনায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ, বন্যা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে সৃষ্ট গণদুর্ভোগ প্রভৃতি। গল্পের আকারে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন এবং রম্যরচনায় উপস্থাপন করেছেন সরস ভঙ্গিতে।

সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাস্তবতা তুলে ধরা খোন্দকার আলী আশরাফের রম্যরচনার মূল প্রবণতা। লিখেছেন মূলত স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায়। এ সময়ের অসাধু ও সুযোগসন্ধানী লোকের কপটতা ও আত্মস্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ

করেছেন। দীর্ঘকাল তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজের বাস্তবতা, দুর্নীতি, রাজনীতিকদের স্বার্থকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগ-দুর্বিপাক। রম্যরচনায় এসবকেই তিনি হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন।

আবদুশ শাকুর বাংলাদেশের রম্যরচনায় একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। সৈয়দ মুজতবা আলীর পরে বাংলাদেশের রম্যরচনায় তাঁকে 'রম্যের রাজা' হিসেবে অভিহিত করা যায়।[২৬] তাঁর রম্যরচনার বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ। যাই লিখুন না কেন, তা তাঁর প্রখর মেধার আতসকাচে যাচাই হয়ে আসে। তাতে রসবোধের কোনো ক্ষতি হয় না।[২৭] রম্যরচনার বিষয় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন সত্তরের দশকের সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বিচারিক নানা বৈষম্য ও অবিচারকে। আরও রয়েছে চারপাশের চেনা-জানা মানুষের আচার-আচরণ-কর্মকাণ্ড, নানা ঘটনা, এমনকি বাঙালির জাতীয় চরিত্র নিয়েও নির্মল হাস্যরস। অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরেছেন আমলাতন্ত্রের জটিল মারপ্যাঁচ। কৃত্রিমতার নাগপাশে আবদ্ধ সমাজবাস্তবতাকে তিনি রম্যরচনার হালকা লঘু চালে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও রয়েছে মধ্যবিত্তজীবনের দৈনন্দিন সমস্যা ও অসহায়তা। জীবনকে দূর থেকে বিচার না করে তিনি জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং সারবস্তুটুকু গ্রহণ করে রম্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।[২৮]

আবদুশ শাকুর তাঁর রম্যরচনায় নিজেকেই দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি করে। নিজের সবরকম কথাই বলেছেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন আর লক্ষ করেছেন বিভিন্ন সমাজের বিচিত্র প্রথা। এসবের কথাই উঠে এসেছে রম্যরচনায়। কৃত্রিমতার নাগপাশে আবদ্ধ সমাজবাস্তবতার কৃত্রিম ভাবকে তিনি বিদ্রুপবাণে বিদ্ধ করেছেন। কখনো দেখা যায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, ঠাট্টা-মশকরা, আবার কখনো লক্ষভেদী খোঁচা। তাঁর কড়চা জাতীয় রম্যরচনাগুলো গড়ে উঠেছে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বুর্জোয়া মানসিকতাকে ঘিরে। মধ্যবিত্ত বাঙালির উচ্চাভিলাষ, লোভ, মোহ, ঈর্ষাকাতরতা, অভাববোধ ও ঊনতা– এসব রম্যরচনায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।[২৯] সমাজবাস্তবতাকে তিনি তুলে ধরেছেন নিজস্ব উপলব্ধির আলোকে। একদিকে যেমন কটাক্ষ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ব্যঙ্গ আর শ্লেষের আঘাতে বিদ্ধ করেছেন। রাজনৈতিক কর্মীদের আচারসর্বস্ব চারিত্র্য ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আতিশয্যে সমাজের পর্যুদস্ত অবস্থাকেও তিনি তুলে ধরেছেন। সমাজজীবনের নানা টানাপড়েনে মানুষ কীভাবে প্রতিনিয়ত অস্থির, শশব্যস্ত ও হাঁসফাঁস করছে, তারই চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর রম্যরচনায়। এছাড়া

রয়েছে বাঙালি চরিত্রের বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে স্বরূপটি তুলে ধরার প্রবণতা। বাঙালির বাহুল্যদোষ, স্বাধীনতা-পরবর্তী অসততা, আদর্শহীনতা, আত্মস্বার্থসর্বস্বতা, চাটুকারিতা, সরকারি প্রশাসনের ভেতরের খুঁটিনাটি, আদালতে সাধারণ মানুষের হয়রানি ইত্যাদি বিষয়কে লঘুভঙ্গিতে প্রকাশের মাধ্যমে বাঙালির চরিত্রবৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশের রম্যরচনায় আবদুশ শাকুরের পরেই আসে আতাউর রহমানের নাম। তাঁর রম্যরচনায় বিষয়ের বৈচিত্র্য ব্যাপক। দাম্পত্য জীবনের নানা খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ যেমন– লেখক, অধ্যাপক, সিভিল সার্ভেন্ট, ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, পুলিশ, চোর, আদালত-আইনজীবী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পরিচারিকা-সহ অসংখ্য বিষয়কে কৌতুকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া রয়েছে সচিবালয়, আমলাতন্ত্র, সংসদ, সংবাদপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, পাওনাদার, নির্বাচন, বিজ্ঞাপন, পর্যটন, ব্যাংক, পাঠাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, হরতাল, দ্রব্যমূল্য-সহ নানা বিষয়। আরও রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির রসবোধ, কিপটেমি, বোকামি নিয়ে রম্য। বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনী ও তাঁদের জীবনের লঘু দিককেও উপস্থাপন করেছেন রম্যরচনায়। তাঁর রচনায় হাসির পাশাপাশি তির্যক বাক্যে কঠিন সত্যের উন্মোচন লক্ষ করা যায়।

আতাউর রহমানের রম্যরচনা শুধু বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে নয়, বরং প্রবণতার দিক থেকেও বিশিষ্ট। তিনি হাস্যরসের মাধ্যমে ব্যক্তিগত-সামাজিক-রাজনৈতিক নানা অসঙ্গতি ও অব্যবস্থাপনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর রম্যরচনায় হিউমার ও উইটের অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। তাঁর রম্যরচনায় যে রসবোধ বা বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে একদিকে যেমন আত্মসমালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়, তেমনি হাস্য-কৌতুকের অন্তরালে তীর্যক কথার মাধ্যমে সমাজের অসংগতি বা ব্যক্তির ভুল-ত্রুটিগুলো সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাঁর কৌতুকহাস্য শুধু চতুর কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং পরিস্থিতি, ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদি নানা বিষয়কে অবলম্বন করে বিস্তার লাভ করেছে। এ কারণেই তাঁর রম্যরচনার মূল প্রবণতা হাস্যরসের মাধ্যমে ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজের ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়া। অনেক রম্যলেখকের লেখার রস আস্বাদনের জন্য অনেক সময় পাঠককে বেশ পরিশ্রম করতে হয়, আতাউর রহমান সেখানে নিয়ে এসেছেন সহজ-সরল-প্রাঞ্জল হাস্যরস। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পাশাপাশি চাকরি-জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকেও তিনি রম্যরচনার বিষয় করেছেন নির্দ্বিধায়। হাস্যরসের মাধ্যমে বিষয়কে উপস্থাপন করে পাঠককে যেমন বিমলানন্দ দিতে

চেয়েছেন, তেমনি হাস্যরসকে তিনি চৈতন্য জাগরণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

বাংলাদেশের আরেকজন রম্যলেখক ফরহাদ খান রম্যরচনায় বিচিত্র বিষয় ও তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রম্যরচনায় মেধা, শ্রম ও মনীষার দীপ্তি লক্ষ করা যায়। প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়ের উৎস অনুসন্ধান, আহার থেকে ঘুম, বাইসাইকেল থেকে রেলগাড়ি, ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে জগদ্বিখ্যাত ঘটনা, দেশীয় থেকে আন্তর্জাতিক, শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিচারণ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় এসেছে তাঁর রম্যরচনায়। ঘুম, হাঁচি রহস্য, অসুখ-বিসুখ, দেহনদীর জোয়ার-ভাটা ছাড়াও বিশ্ব ও বিশ্বসুন্দরী, দেহভাষা ইত্যাদি-সহ জীবনের নানা বিষয় ও বেশ কিছু স্মৃতিকথা লঘু ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া বাঙালির ভোজন, বাঙালির শাকসবজি, বাঙালির পানীয়, বাঙালির ফুটবল, ঈদের স্মৃতিকাতরতা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন রম্য ধাঁচে। রাসপুতিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ভিক্টোরিয়া ক্ল্যাফলিন উডহাল, ইতালির স্বৈরশাসক মুসোলিনির প্রেমিকা সিনোরা ক্লারা পেতাচ্চি এবং চীন সাম্রাজ্যের সর্বশেষ বিধবা সম্রাজ্ঞী ইয়েহোনেলার মতো ব্যক্তিত্বও স্থান পেয়েছে তাঁর রম্যরচনায়। তথ্য পরিবেশনের সাথে সাথে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দিতে পারতেন।[৩০]

ফরহাদ খানের রম্যরচনায় বিষয় নির্বাচনে ব্যাপকতা থাকলেও সুনির্দিষ্ট কোনো প্রবণতা লক্ষ করা যায় না। বিচিত্র বিষয়কে তিনি তথ্যবহুল করে উপস্থাপন করেছেন। এসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি যে ব্যাপক অধ্যয়নের পরিশ্রম স্বীকার করেছেন, তা তাঁর রম্যরচনার বিষয়ের দিকে তাকালেই অনুধাবন করা যায়। পাঠককে বিচিত্র বিষয়ে জানানোর প্রবণতা লক্ষ করা যায় তাঁর রম্যরচনায়। সারা পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া অবিস্মরণীয় ঘটনা, আলোচিত-সমালোচিত ব্যক্তিত্ব, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র আহার থেকে শুরু করে বাঙালির ভোজন, ফল, শাকসবজি, ফুটবল, রেলগাড়ির ইতিবৃত্ত-সহ সব রম্যরচনাতেই তিনি হাজির করেছেন বহু তথ্য। *চিত্র ও বিচিত্র* গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি বলেছেন– 'লাভলোকসানের দিকে না তাকিয়ে যারা অনেক কিছু জানতে চান এবং কারণে-অকারণে আনন্দিত হন– তাঁদের চিত্ত পরিতৃপ্ত করতে পারে।'[৩১]

বাংলাদেশের রম্যরচনায় ফরহাদ খানের পরবর্তীকালে রণজিৎ বিশ্বাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনের আনন্দ-বেদনা, হরিষ-বিষাদ, মানুষ, মানবতা, গৃহবিবাদ-সহ জীবনের নানা জটিলতার কথা তিনি তুলে ধরেছেন রম্যরচনায়। এককথায় বলা যায় তাঁর রম্যরচনার মূল বিষয় মানুষ। রয়েছে তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও বঞ্চনার কথা। প্রসঙ্গক্রমে বা প্রসঙ্গ না পেলেও বারবার উঠে এসেছে

যুদ্ধাপরাধ, রাজাকার-আলবদর, বাই-চান্স মুক্তিযোদ্ধা প্রসঙ্গ। তাঁর রম্যরচনায় এদের প্রতি ঘৃণা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া রয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণা ও পাঠের প্রসঙ্গ। তাঁর রচনায় রম্যের পাশাপাশি কোনো না কোনো বার্তা দেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে। অনেক লেখায় শ্লেষ ও ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে মূল বিষয়কে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

রণজিৎ বিশ্বাস রম্যরচনায় লঘু ভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। মানুষের দৈনন্দিন বাস্তবতা, সমাজ ও পরিবারে ব্যক্তির অবস্থান, তার অন্তর্চারিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষকে তিনি মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করতে চেয়েছেন। সেই সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সর্বগৌরবের বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন। এর বিপরীত মানসিকতার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রম্যরচনায় যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদী, মানবতাবিরোধী, বাইচান্স মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, আলবদর, সাম্প্রদায়িক, ছদ্মসাম্প্রদায়িকতার প্রতি গভীর ঘৃণা ফুটে উঠেছে। *পুরো সিরিয়াস আধা রম্য* গ্রন্থের 'প্রসঙ্গকথন' থেকেই তাঁর রম্যরচনার মৌল প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়–

> নষ্ট-ভ্রষ্ট, অসৎ-অসাধু, সাম্প্রদায়িক-ছদ্মসাম্প্রদায়িক এবং অশিক্ষিত-কুশিক্ষিত যে মানুষগুলো ভেদবুদ্ধিতাড়িত হয়ে সমাজ দেশ রাষ্ট্র ও সবার ওপরে মানুষের খুব ক্ষতি করে চলেছে, তাদের রোখা দরকার, তাদের দুষ্কর্মের প্রতিবাদ হওয়ার দরকার সকল তীব্রতায়।[৩২]

বাংলাদেশের রম্যরচনার ধারায় হানিফ সংকেতের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁর রম্যরচনায় উঠে এসেছে চলমান জীবনের নানা অসঙ্গতি। রাজনীতি, সমাজনীতি ও আদর্শবাদের নামে প্রতিনিয়ত লোক হাসানোর যে আয়োজন চলছে, সেই বিনোদন তাঁর রম্যরচনার মূল উপজীব্য বলে তিনি নিজেই বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকাতে জানিয়েছেন। এছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার হাস্যরসাত্মক প্রকাশ। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'ইত্যাদি' অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে আসছেন। সেখানেও তিনি সমাজের খুঁটিনাটি অসঙ্গতি দেখানোর চেষ্টা করেন। রম্যরচনায় অনেক সময় নাট্যচিত্রের মাধ্যমে সেগুলোকে রূপদান করেছেন। অবিমিশ্র হাসি তাঁর রম্যরচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও শেষ পর্যন্ত জাগ্রত হয় গভীর বেদনাবোধ।

হানিফ সংকেতের রম্যরচনা কেবল অবিমিশ্র হাসিতেই শেষ হয়ে যায়নি, বরং তাঁর অনুসন্ধান আরও গভীরে। জীবনে যে বহুবিচিত্র অসংগতি রয়েছে, তা হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আপাত অসংগতির লঘু আবরণ সরিয়ে তিনি পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন এক সত্যের মুখোমুখি। ফলে আনন্দের পাশাপাশি জাগ্রত হয়

বেদনাবোধ। রাজনীতি, সমাজনীতি, আদর্শবাদের নামে প্রতিনিয়ত মানুষকে হাসানোর যে আয়োজন চলছে তাকে ব্যঙ্গ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায় তাঁর রম্যরচনায়। তবে ব্যঙ্গের আড়ালে তাঁর গভীর বেদনাবোধও অনুধাবন করা যায়।

বাংলাদেশের রম্যরচনার তরুণতম কারবারি আনিসুল হক। সমকালীন দেশ-কাল-সমাজকে রম্যরচনার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি। সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার ওপর নজর রেখেছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। লিখেছেন ক্ষমতাধর-প্রতিক্রিয়াশীলদের চরিত্রহীনতা ও কপটতা নিয়ে। দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশের কারণে তাঁর রম্যরচনায় সমকালীন বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন সূক্ষ্মভাবে। রাজনীতির পাশাপাশি তাঁর রম্যরচনায় এসেছে সমাজবাস্তবতার প্রত্যক্ষ চিত্র। চারপাশে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রম্যরচনার প্লট সাজিয়েছেন। সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৌতুকের উৎসার ঘটেছে তাঁর গদ্যে। পরিবেশনের ভিন্নতা আনিসুল হকের রম্যরচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পরিবেশনের ভঙ্গিকে তিনি নামকরণ করেছেন কথাকার্টুন বা গদ্যকার্টুন।[৩৩]

আনিসুল হকের রম্যরচনায় মূল বিষয় সমসাময়িক রাজনীতি– এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর রম্যরচনার প্রবণতা সম্পর্কে জানা যায় তাঁর লেখাতেই– 'দালান উঠছে সেও রাজনীতি, দালান ভাঙছে সেও রাজনীতি। বিদ্রুপ যদি করতে হয় শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্র আর ক্ষমতা আর ক্ষমতাবানদের করাই শ্রেয়।'[৩৪] তিনি জানেন ক্ষমতার চক্র থেকে বেরিয়ে মানুষ কোনোদিনই মুক্তি পাবে না। তাই রম্যরচনায় ক্ষমতার বৈধতাকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করেছেন প্রকৃত প্রগতিশীলদের মতো। সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার ওপর রয়েছে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতেই তিনি লিখেছেন বাংলাদেশের শক্তিমানদের, প্রতিক্রিয়াশীলদের চরিত্রহীনতা আর কপটতার বিদ্রুপ ব্যাকরণ।[৩৫] হাস্যরস ও ব্যঙ্গবিদ্রুপের আড়ালে তিনি যে বেদনা প্রকাশ করেছেন, তা দেশ ও সময়ের জন্য। অন্যান্য রম্যলেখক যেখানে কারও নামোল্লেখ না করে ব্যঙ্গ করেছেন, আনিসুল হক সেখানে সরাসরি রাজনীতিবিদদের নামোল্লেখ করে ব্যঙ্গ করেছেন–তুলে ধরেছেন তাঁদের চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য। তাঁর রম্যরচনা একই সাথে হাসায়, ভাবায় আবার তীব্র বিষণ্নতাবোধে আচ্ছন্ন করে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশের রম্যরচনা বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ একটি ধারায় উত্তীর্ণ হয়েছে। হাস্যরস ও রম্যের ছত্রছায়ায় কত নাজুক ও স্পর্শকাতর বিষয়েও যে মুক্ত চিন্তা করা যায়, বাংলাদেশের রম্যরচনার বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে তাকালেই তা সহজে অনুধাবন করা যায়। হাস্যরসের প্রলেপ

দিয়ে রচনাকে রম্য করে সাহিত্যে যাবতীয় দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করা যায়।[৩৬] বাংলাদেশের রম্যলেখকদের অনেকেই রম্যরচনায় এই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের রম্যরচনার প্রবণতা লেখকভেদে স্বতন্ত্র হলেও হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজ সংশোধন বা সমাজের মানুষের চৈতন্যের জাগরণ করাই ছিল তাঁদের মৌল প্রবণতা। সেই সঙ্গে পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মের নানা অসংগতির আলোচনায় কখনো কখনো লেখকদের নেতিবাচক মানসিকতা বলে মনে হলেও, তাঁরা তা করেছেন সমাজ সংশোধনের উদ্দেশ্যে।

৫. উপসংহার

বিষয়ের বৈচিত্র্য, তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা, অনেক ক্ষেত্রে কাব্যময় ভাষা, অভিব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা এবং প্রবণতার স্বাতন্ত্র্যে বাংলাদেশের রম্যরচনা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে। বাংলাদেশের রম্যলেখকগণ তাঁদের মনের খেয়াল-লঘুচিন্তা হালকা ভাষায় উপস্থাপন করে পাঠকের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করেছেন। সেই সাথে গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপস্থাপনও লক্ষ করা যায়–যদিও তা উপস্থাপনের গুণে হয়ে উঠেছে রমণীয়। হালকা লঘুভঙ্গিতে কোনো না কোনো বার্তা দেওয়ার প্রবণতা বাংলাদেশের প্রায় সব রম্যরচনায় লক্ষ করা যায়। রম্যরচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য আঙ্গিক হিসেবে ধারণ করেছে শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য, ভ্রমণ, ভোজন থেকে শুরু করে জীবন ও অভিজ্ঞতাসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়। মননশীল প্রবন্ধের মেধা ও বুদ্ধির ছাপ ছাড়িয়ে রম্যরচনায় প্রাধান্য পেয়েছে হৃদয়। লেখকগণ হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করেছেন তা-ই প্রকাশ করেছেন আপন খেয়ালে। সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে রম্যরচনায় বিষয়ে পরিবর্তন আসাটাই স্বাভাবিক– ঘটেছেও তাই। বাংলাদেশের রম্যরচনার বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রবণতার দিকে তাকালেই বিষয়টি সহজে অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশ পর্বের রম্যলেখকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে রম্যরচনায় বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। রম্যরচনার যেহেতু বাঁধাধরা কোনো নিয়ম নেই তাই বিষয়ের ক্ষেত্রেও কোনো সুনির্দিষ্ট গণ্ডিও নেই। লেখক তাঁর স্বাধীনতার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেন রম্যরচনায়। তত্ত্ব ও তথ্যের ভারে পাঠককে পীড়ন না করেও যে গভীর জীবনবোধ উপস্থাপন করা যায়, বাংলাদেশের রম্যরচনা তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

১. সাগরময় ঘোষ (সম্পা.), 'ভূমিকা', *পরম রমণীয়* (কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড কোং লি., ১৯৫৫)

২. সৈয়দ শামসুল হক, 'সবিনয় নিবেদন', *কথা সামান্যই* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৬)

৩. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'প্রবন্ধ: সংজ্ঞা ও স্বরূপ', *চতুরঙ্গ*, ৪৯ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা (আগস্ট ১৯৮৮) পৃ. ৩০৭

৪. বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের সময় থেকে গড়ে ওঠা ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যকে বোঝায়। কালের দিক থেকে বাংলাদেশের সাহিত্য চল্লিশের দশকের শেষার্ধ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও এই সাহিত্যের পটভূমিকায় রয়েছে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য। দ্রষ্টব্য: রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮) পৃ. ৫৪

৫. শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য-সন্দর্শন* (ঢাকা: সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০১০) পৃ. ১২১

৬. কবীর চৌধুরী, 'বেললেট্রে', *সাহিত্যকোষ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১) পৃ. ২৬

৭. পল্লব সেনগুপ্ত, 'প্রবন্ধ', *ভারতকোষ*, পৃ. ৪৪০

৮. *সংসদ বাংলা অভিধান*, 'রম্যরচনা' ভুক্তি

৯. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ, রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০৪) পৃ. ৩৬৫

১০. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'রম্যরচনা', *প্রবন্ধ-সংকলন* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২) পৃ. ১৮১।

১১. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৪

১২. স্বরোচিষ সরকার, 'সৈয়দ শামসুল হকের সামান্য কথা: অসামান্য প্রকাশ', *ভাবনা নিয়ে ভাবনা* (ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০১০) পৃ. ৬৯।

১৩. বিদিশা সিন্‌হা, *বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা পাঠ* (কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, ২০১২) পৃ. ২৬

১৪. পবিত্র সরকার, *গদ্যরীতি পদ্যরীতি* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১) পৃ. ১৩৫

১৫. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬) পৃ. ৪৭

১৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'যেখানে আবুল মনসুর আহমদ স্বতন্ত্র', *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫) পৃ. ১৩

১৭. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, 'সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ', *তদেব*, পৃ. ৩৬

১৮. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে', *তদেব*, পৃ. ২০

১৯. রাজীব হুমায়ূন, *আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ রচনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫) পৃ. ৬৭

২০. নুরুল আমিন, *আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য* (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০১১) পৃ. ৮৭

২১. গজেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ (সম্পা.),'সম্পাদকের নিবেদন', *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী একাদশ খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৫৯)

২২. নূরুর রহমান খান, *মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৯) পৃ. ২৭৫

২৩. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'ভূমিকা', গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ (সম্পা.), *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী প্রথম খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৫৬)।
২৪. আসহাবউদ্দীন আহমদ, 'আমার সাহিত্য জীবন', *আসহাবউদ্দীন আহমদ রচনাসমগ্র ৩* (ঢাকা: মীরা প্রকাশন, ২০০৪) পৃ. ৪২
২৫. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'আসহাবউদ্দীন আহমদের ক্রোধ ও কৌতুক', *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৬) পৃ. ১১১।
২৬. উদ্ধৃত, আবদুল করিম, *বাঁশখালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩) পৃ. ১২৯
২৭. স্বকৃত নোমান, *আবদুশ শাকুর* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪) পৃ. ৪২
২৮. সনৎকুমার সাহা, 'আবদুশ শাকুরকে নিয়ে', *দেখা-অদেখা* (ঢাকা: ইত্যাদি, ২০১৪) পৃ. ২১৯
২৯. বরেন্দু মণ্ডল, 'শাকুরের কড়চার শিল্পবাস্তবতা: মধ্যবিত্তের চোখে', চন্দন আনোয়ার (সম্পা.), *গল্পকথা আবদুশ শাকুর সংখ্যা*, (বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪) পৃ. ২২১
৩০. বজলুল করিম বাহার, 'আবদুশ শাকুরের গদ্যের তাতানো লঘুরস', *তদেব*, পৃ. ২০৩
৩১. তারিক মনজুর, 'ফরহাদ খান যে কারও সঙ্গে নিজের হৃদয়কে মেলাতে পারতেন', *দৈনিক প্রথম আলো* (২ অক্টোবর, ২০২১)
৩২. ফরহাদ খান, 'ভূমিকা', *চিত্র ও বিচিত্র* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৯)
৩৩. রণজিৎ বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গকথন', *পুরো সিরিয়াস আধা রম্য* (ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, ২০১৬), আহমাদ মাযহার, 'ভূমিকা', *বাংলাদেশের নির্বাচিত রম্যরচনা ও গল্প* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৯০)
৩৪. আনিসুল হক, 'গদ্যকার্টুন বিষয়ে আমার ভাবনা বা একটি আদর্শ রম্যরচনা', *গদ্যকার্টুন সমগ্র ১* (ঢাকা: পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০০০) পৃ. ১৪।
৩৫. হুমায়ুন আজাদ, 'গদ্যকার্টুন: ভূমিকা', *অগ্রন্থিত হুমায়ুন আজাদ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০২০) পৃ. ৮৯
৩৬. আবদুশ শাকুর, 'ভূমিকা', *বাংলা সাহিত্যের নির্বাচিত রম্যরচনা ও গল্প ১ম খণ্ড* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৯৫)

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

স্মৃতিকথায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অগ্নিসংযোগ প্রসঙ্গ

ড. আরমান হোসাইন আজম*

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগ প্রসঙ্গটি ছিল তাদের যুদ্ধের একটা কৌশল। 'পোড়ামাটি নীতি' গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধকে স্তব্ধ করে দেওয়া এবং যেকোনো প্রকারে এ দেশকে তাদের অধিকারে রাখা ছিল উদ্দেশ্য। দেশি-বিদেশি সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক, রাজনীতিক, মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধকালীন বিভিন্ন জনের স্মৃতিকথায় এসব বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। স্মৃতিকথায় প্রকাশিত হয় হত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি সংঘটিত করে ভারী বোমা, মেশিনগান, মর্টার, ট্যাংক চালিয়ে, আকাশে ট্রেসার হাউই দিয়ে রংবাজি করে, বিভিন্ন বস্তিতে, বাজারে, দোকানপাটে, গ্রামে-গঞ্জে, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে এ দেশকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা ছিল হানাদার বাহিনীর উদ্দেশ্য। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ত্রাস সৃষ্টি এবং তাদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার অন্যতম উপায় ছিল অগ্নিসংযোগ। মৃতের সংখ্যা বাড়ানো যেমন লক্ষ্য ছিল তেমনি সমগ্র বাংলাদেশকে ধ্বংস করা তাদের নেশায় পরিণত হয়েছিল। স্মৃতিকথায় প্রকাশিত হয়, অনেক জায়গায় সেনারা মানুষসহ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, অনেক জায়গায় জীবন্ত মানুষকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেছে, অনেক জায়গায় গণহত্যা সংঘটিত করে তাদেরকে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। হিন্দুপ্রধান এলাকা ও তাঁদের বাড়িঘরে লুটপাট করে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। সামরিক বাহিনী তাদের সন্দেহপ্রবণ এলাকাগুলোর অভিযানে হিন্দু-মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের বাছবিচার করেনি। নির্বিচারে হত্যা, গণহত্যা সংঘটিত করে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে পুরো এলাকাকে শ্মশানে পরিণত করেছে। স্মৃতিকথায় প্রকাশিত হয়, পিস কমিটি ও জামায়াত-রাজাকার সদস্যরা সামরিক বাহিনীকে এসব বিভিন্ন এলাকার সন্ধান দিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

১. ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের চিত্র মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতিকথায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রকাশিত হয় হানাদার বাহিনী হত্যা, লুণ্ঠন, গণহত্যা ইত্যাদি সংঘটিত করার পর অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করে, ভারী বোমা, মেশিনগান, ট্যাংক চালিয়ে, আকাশে ট্রেসার হাউই দিয়ে রংবাজি করে, বিভিন্ন বস্তিতে, বাজারে, দোকানপাট, গ্রামে-গঞ্জে, গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়িঘরে

***সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল।**

অগ্নিসংযোগ করে মৃত্যুপুরীর পরিবেশ তৈরি করে। বহু স্মৃতিকথায় প্রকাশিত হয়, সামরিক বাহিনীর অগ্নিসংযোগের ধোঁয়া এবং আগুনের শিখা দেখে, ঘরের টিন ও বাঁশ-কাঠ পোড়ার শব্দে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে। বিশেষত, হিন্দুপ্রধান এলাকা ও তাঁদের বাড়িঘরে লুটপাট করে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। স্মৃতিকথায় প্রকাশিত হয়েছে, সামরিক বাহিনী তাদের সন্দেহপ্রবণ এলাকাগুলোর অভিযানে হিন্দু-মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের বিচার করেনি। নির্বিচারে হত্যা, গণহত্যা সংঘটিত করে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে পুরো এলাকাকে শ্মশানে পরিণত করেছে। সামরিক বাহিনীর সহযোগী পিস কমিটি ও জামায়াত-রাজাকারের সদস্যরা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। তারা সামরিক বাহিনীকে সন্দেহপ্রবণ এলাকার সন্ধান দিয়েছে, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে অংশ নিয়েছে। যাঁদের স্মৃতিচারণে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের চিত্র রয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– জাহানারা ইমাম, আমীর-উল ইসলাম, সুফিয়া কামাল, রাবেয়া খাতুন, বাসন্তী গুহঠাকুরতা, আহমেদ রেজা, সেলিনা হোসেন, নির্মলেন্দু গুণ, ফকির আলমগীর, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, জহুরুল হক, আঁদ্রে মালরো ও অন্যান্য, আহমদ রফিক, অ্যান্থনি মাসকারেনহাস, সিডনি শনবার্গ, রবার্ট পেইন, সিদ্দিক সালিক, আবু জাফর শামসুদ্দীন, হাসান আজিজুল হক, মো. জহুরুল ইসলাম বিশু, কাজী ফজলুর রহমান, নওশের আলী, কাদের সিদ্দিকী প্রমুখ। এছাড়া কিছু সম্পাদিত গ্রন্থ রয়েছে যেমন– বেগম নূরজাহান সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া*, রশীদ হায়দার সম্পাদিত *১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা* এবং *স্মৃতি: ১৯৭১*, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র* ইত্যাদি।

২. স্মৃতিকথায় ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অগ্নিসংযোগের চিত্র

জাহানারা ইমাম তাঁর *একাত্তরের দিনগুলি* গ্রন্থে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। এখানে জাহানারা ইমাম একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ২৫ মার্চ রাতে হঠাৎ ভীষণ শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙে। তিনি দেখেন ঢাকার বিভিন্ন দিকে গোলাগুলি, মেশিনগানের শব্দ, আকাশে ট্রেসার হাউইয়ের রংবাজি। সবদিক থেকে আগুনের স্তম্ভ ক্রমেই স্পষ্ট ও আকাশচুম্বী হচ্ছে। ২৭ মার্চের ডায়েরিতে তিনি লিখেন, 'গতকালও সারারাত জাগা। গোলাগুলির শব্দ, আগুনের স্তম্ভ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সকালের দিকে গোলাগুলির শব্দটা খানিকক্ষণের জন্য বন্ধ হলো।' তাঁর বিবরণে প্রকাশিত হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, *দি পিপল* পত্রিকা অফিস এবং *ইত্তেফাক* অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঢাকার যত বাজার আছে, বস্তি আছে, সব জায়গা আগুনে পুড়ে ছাই–ছাই হয়েছে রায়েরবাজার, ঠাঁটারী বাজার,

নয়াবাজার, শাঁখারী পট্টি। সকাল নয়টায় কারফিউ উঠে গেলে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে দেখেন নিউমার্কেটের সামনে পুরো কাঁচাবাজার পুড়ে ছাই হয়েছে। পোড়া চালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখেন সেখানে মানুষও পুড়েছে।[১]

রশীদ হায়দার সম্পাদিত *১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা* গ্রন্থে মোসলেমা খাতুন 'মৃত্যুর মুখোমুখি' শিরোনামে ২৭ মার্চ ঢাকায় হোম ইকোনোমিক্স কলেজের টিচার্স বিল্ডিং থেকে গ্রিনরোডে যাওয়ার পথে নিউমার্কেটে দেখা পাকিস্তানি আর্মির অগ্নিসংযোগ ও হত্যার স্মৃতিচারণ করেছেন। মোসলেমা খাতুন লিখেছেন–

> দুটো রাত আর একটা দিন চারদিকে গোলাগুলি আর হত্যাযজ্ঞের মাঝখানে কাটিয়েছি। উষ্কখুষ্ক বিধ্বস্ত চেহারা সবার। পায়ে জোর নেই, তবু রাস্তায় নেমে ছেলেমেয়ের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। ডান দিকে চেয়ে দেখি, নীলক্ষেতে রাস্তার পাশের সব দোকানপাট গোলাগুলিতে লণ্ডভণ্ড। একবার মনে হলো, পঁচিশের রাতে যারা ঘুমের মধ্যে দোকানে আটকা পড়েছিলো তারা কি কেউ বেঁচে আছে? একটু হেঁটে গিয়ে রাস্তায় লোকজন কিছু দেখতে পেলাম। বাচ্চাকাচ্চাসহ বাক্সপোটলা কাঁধে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে চলেছে অনেকে। কোনো রিকশা নেই। প্রাইভেট গাড়ি দু'একট শাঁ করে চলে যাচ্ছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে নিউমার্কেটের কাঁচাবাজারের সামনে এসে দেখি – বাজারটা পুড়ে কালো ছাই হয়ে গেছে। হায় আল্লাহ, ছাইয়ের মধ্যে মরা মানুষও দেখা যাচ্ছে! ফুটপাতেও মরে পড়ে আছে মানুষ! কারা যেনো গামছা দিয়ে ওদের মুখ ঢেকে দিয়েছে।[২]

আমীর-উল ইসলাম *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি* গ্রন্থে ঢাকা শহরে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেছেন। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে ফিরে তিনি আর তাজউদ্দীন আহমদ সাতমসজিদ রোডে মোহাম্মদ মুসার বাড়ি যাচ্ছিলেন আশ্রয়ের জন্য। ধানমন্ডিতে বিদ্যুৎ চলে গেলে তাঁরা কালবিলম্ব না করে লালমাটিয়ায় প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার গফুর সাহেবের বাড়ির কাছে নেমে যান। তিনি লিখেছেন, গফুরের বাড়িতে ঢোকার ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই প্রচণ্ড শব্দে ঢাকা শহর কেঁপে ওঠে। এটা ছিল ঢাকায় সামরিক বাহিনীর আঘাত শুরু করার সংকেত। শুরু হয় চারদিক থেকে ব্রাশ ফায়ার। অবস্থা দেখার জন্য তাঁরা দুজন বাসার ছাদে যান। আমীর-উল ইসলাম লিখেছেন–

> গফুর সাহেবের বাড়ির অসম্পূর্ণ ছাদের ইট-শুরকীর ওপর বসে আমরা দু'জন পাকসৈন্যদের হামলার মুখে ভয়ার্ত মানুষের আর্তচিৎকার শুনছি। এক সময় তীব্র নীলাভ এক উজ্জ্বল আলোতে ঢাকা শহর আলোকিত হয়ে উঠলো। বিভিন্ন স্থানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের কালো ধোঁয়ায় ঢাকার আকাশ ক্রমশই কালো হয়ে উঠেছে। মধ্যরাতের দিকে ব্রাশ ফায়ার ও বিকট শব্দ শুনে তাজউদ্দীন আহমদ বলে ওঠেন, এবার দস্যুরা ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলা করছে।[৩]

সুফিয়া কামাল *একাত্তরের ডায়েরী* গ্রন্থে একাত্তরের বিভিন্ন তারিখে ঢাকায় অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি তাঁর ডায়েরির স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

হানাদার বাহিনী ৩০ মার্চ শান্তিনগরের বাজারটা পোড়ায়, ১৩ এপ্রিল ১৪০ জনের শান্তি মিছিল পথে পথে শান্তির বাণী শুনিয়ে রাতে চকবাজার পোড়ায়, ১৫ এপ্রিল মাগরিবের আজানের সময়ে নিউমার্কেট বস্তি পোড়ায়, ১৮ এপ্রিল মীরপুরে আগুন দেয়, ২৬ এপ্রিল বরিশালে গানবোট থেকে পাশের গ্রামগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়, ২৫ মে আদমজি নগরের বাজার পুড়িয়ে দেয়।[৪]

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর *জার্নাল '৭১* গ্রন্থে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঢাকা থেকে তাঁদের প্রকাশিত *প্রতিরোধ* পত্রিকার জন্য তখন তাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। এ স্মৃতিচারণ তাঁদের সে পত্রিকার ওয়ারেস সাহেবের রিপোর্টের অংশ। তিনি লিখেছেন, ১৭ নভেম্বর ঢাকার দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার অপর পারের চৌদ্দটি গ্রাম পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজাকার, অবাঙালি, মুসলিম লীগ ও ইসলামপন্থি দলগুলোর সাহায্যে পুড়িয়ে দেয়। গ্রামগুলো হলো– নান্দাইল, রুইতপুর, শিকরামপুর, সৈয়দপুর, কামার খাঁ, গোয়ালখালি, গাঠা গাঁও, আটি, গাছ গাঁও, মোরাজী গাঁও, রূহিলা, খলমা, কামরাঙ্গীর চর ও খোলমারা। গ্রামগুলো বুড়িগঙ্গা থেকে ধলেশ্বরী পর্যন্ত বিস্তৃত। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর লিখেছেন, ১৬ নভেম্বর রাত থেকে সামরিক সরকারের আদেশে এই হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। ১৭, ১৮ ও ১৯ এই তিনদিন এবং তিন রাত এই গ্রামগুলোর নারী, শিশু, বৃদ্ধদের হত্যা করা হয়, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সশস্ত্র পাকফৌজ এবং তাদের সহযোগী রাজাকাররা পরিকল্পিতভাবে এই গ্রামগুলোতে হামলা করে এবং অবাঙালি, মুসলিম লীগ, ইসলামপন্থি দলগুলোর লোকেরা ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী যখন পালাতে চেষ্টা করে তখন তাদের ওপর গুলি চালায়। যারা ঘরের ভিতর লুকিয়ে ছিল তাদেরকে বাইরে টেনে বের করে মারে। মেয়েদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তিনি লিখেছেন, সেখানে আনুমানিক এক হাজারেরও বেশি লোক নিহত হয় এবং ছয়শত বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। আহতের সংখ্যা হাজারখানেক। সবচেয়ে বড়ো ব্যবসাকেন্দ্র রুইতপুর ও শিকারপুরের সমস্ত দোকানপাট সম্পূর্ণ ভস্মীভূত ও সারা বাজার ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আটি এবং কামরাঙ্গীর চর। আটিতে তিনশত জন হতাহত হয় এবং দুইশত ঘর ভস্মীভূত হয়। বোরহানউদ্দিন খান লিখেছেন, গোয়ালখালি গ্রামের একজন বৃদ্ধা জানান, সে গ্রামের পঞ্চাশজন মানুষ জীবন্ত দগ্ধ হয় আর গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।[৫]

জহুরুল হক *নিষিদ্ধ নিশ্বাস* গ্রন্থে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি ১৮ অক্টোবরের দিনপঞ্জিতে লিখেছেন, ঢাকার যাত্রাবাড়ি অঞ্চলে আগুন লাগিয়ে বহু বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, সঙ্গে বহু

মানুষজন পুড়িয়ে মারা হয়। ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যার কাছাকাছি তিনি দেখেন, ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। উঁচু ছাদ থেকে নদীর ওপারে বেশ বড়ো অঞ্চলজুড়ে আগুন দেখতে পান। হানাদাররা সেখানে কয়েকটি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। জানতে পারেন, একটি গ্রামের কয়েক হাজার লোককে মারা হয়েছে।[৬]

৩. বিদেশি সাংবাদিক, লেখকদের স্মৃতিচারণে অগ্নিসংযোগের চিত্র

জন হেস্টিংস 'অগ্নিদগ্ধ গ্রাম' শিরোনামে *বাংলাদেশে পাকিস্তানের মানবাধিকার লঙ্ঘন: কয়েকটি জবানবন্দি* গ্রন্থে গণহত্যার পর মৃত এবং অর্ধমৃত মানুষের ওপর হানাদার বাহিনীর পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়ার স্মৃতিচারণ করেছেন। ফাদার জন হেস্টিংসের বাড়ি ব্রিটেনের নরউইকে। তিনি ভারতে ইউনাইটেড রিলিফ সার্ভিসের দায়িত্বে ছিলেন এবং বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য ছিলেন। তিনি বহরমপুর হাসপাতালে একজন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৃদ্ধ লোকটি হানাদার বাহিনীর ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে বেঁচে যাওয়াদের একজন। তাঁর বয়স ৬৫। তিনি জন হেস্টিংসের কাছে তাঁদের ওপর আক্রমণের পুরো ঘটনার বিবরণ দেন। ঘটনাটি ঘটে এপ্রিল মাসের ১২ তারিখের দিকে। জন হেস্টিংস লিখেছেন, রাজশাহী অঞ্চল থেকে শত শত মানুষ গঙ্গার তীরে আসে। যখন তারা নদীর তীরে আসে পাকিস্তানি সেনারা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং নৌকায় উঠতে বাধা দেয় যাতে গঙ্গানদী পার হতে না পারে। সেনারা নারী ও কিশোরীদের একদিকে রাখে। তাদেরকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। পুরুষ ও কিশোরদের তীরে বসতে বলে। এরপর তাদের সবাইকে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে। অনেকে তাৎক্ষণিক-ভাবে মারা যায়। অনেকে মরার ভান করে পড়ে থাকে। জীবিত-মৃত সবাইকে একজায়গায় স্তূপ করে। এরপর তাদের ওপর পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। লোকটি জন হেস্টিংসকে বলেন–

> তিনি বুঝতে পারছিলেন কি ঘটছে না ঘটছে। কিন্তু যখন আগুন ধরে গেলো তখন তো আর মৃত্যুর ভান করে পড়ে থাকতে পারলেন না। লাশের স্তূপ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে এলেন। তাঁর ছেলেও একই কাজ করলো। তাঁদের সঙ্গে আরো অনেকেই ছিলো। তাদের কাপড়চোপড় আগুনে পুড়ছিলো। তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ মারাত্মকভাবে পুড়ে যায়। তারা যতদ্রুত সম্ভব গঙ্গা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। গোধূলি নেমে আসছিলো। পাকিস্তানি সেনারা গুলি করার চেষ্টা করলেও অন্ধকারের মধ্যে কাজ সহজ ছিলো না। অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হলেও শরীরের লেগে থাকা আগুনে কিছু সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়।[৭]

জন হেস্টিংস লিখেছেন, বৃদ্ধ লোকটি অন্ধকারে অনেকের সঙ্গে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে তাঁদেরকে বহরমপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়। মারাত্মকভাবে আগুনে পোড়া পা নিয়ে পরবর্তী একমাস তিনি হাসপাতালে ছিলেন। তখনো তার পা

ব্যান্ডেজ দিয়ে মোড়ানো। তখনো তিনি ঐ সময়ের রক্তমাখা ধুতিটা পরে ছিলেন। জন হেস্টিং একই হাসাপাতালের অন্য একটি বিভাগে যান। সেখানে ঐ ঘটনার দলভুক্ত আরেকজনকে পান। তিনি ঘটনার সত্যতার স্বীকার করেন।

সিডনি শনবার্গ ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১-এ তাঁর রিপোর্টের জন্য পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে পালিয়ে আসা কয়েক ডজন শরণার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সিডনি শনবার্গ যাদের সাক্ষাৎকার নেন তারা অধিকাংশ ফরিদপুরের বাসিন্দা। তিনি লিখেছেন, সাধারণভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হলেও প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা না দিলে তাঁরা থেকে যেতেন। সেখানে শরণার্থীদের প্রায় সবাই হিন্দু। প্রধানত হিন্দুরাই সামরিক কর্তৃপক্ষের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু। শরণার্থীরা শনবার্গকে জানান, তাঁদের এলাকায় গেরিলারা তৎপর এবং প্রতিটা গেরিলা হামলার পর হানাদার বাহিনী বেসামরিক নাগরিকদের ওপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালায়। সিডনি শনবার্গ লিখেছেন, ফরিদপুর জেলার এক চাল ব্যবসায়ী গেরিলাদের আহার ও আশ্রয় প্রদানকারী নিত্যপদ সাহা তাঁর বাড়ির নিকটবর্তী গ্রামের দুর্ভাগ্য বর্ণনা করেন। তাঁরা দেশত্যাগের পাঁচদিন আগে পাকিস্তানি আর্মি তাঁদের গ্রাম আক্রমণ করে– প্রথমে গোলাবর্ষণ করে এবং পরে ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রামবাসীদের কেউ কেউ চটজলদি পালাতে পারেনি। সৈন্যরা তাদের হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে। শ্রী সাহা জানান, গ্রামে ৫০০০ লোকের বাস, এদের বেশিরভাগই হিন্দু। গ্রামে একটি বাড়িও অক্ষত নেই। সিডনি শনবার্গ লিখেছেন–

> শরণার্থীদের মতে, সেনাবাহিনীর যাবতীয় 'নোংরা কাজ' সম্পাদনের দায়ভার ছেড়ে দিয়েছে বেসামরিক সহযোগীদের ওপর। সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের সমর্থক দক্ষিণপন্থি ধর্মীয় দল জামায়াতে ইসলামী এবং মুসলিম লীগের সমর্থকদের তারা অস্ত্র দিয়েছে। গেরিলাদের সাহায্যকারীদের পরিচয়, তাঁদের বাড়ি ও গ্রাম চিনিয়ে দিতে দালালরা পাকিস্তানি আর্মির গোয়েন্দা এজেন্ট ও ডানহাত হিসেবে কাজ করছে। প্রায়শ দালালরা কোনো কারণ ছাড়াই লোকজনকে যথেচ্ছ গ্রেফতার করছে।[৮]

৪. পাকিস্তানি আর্মির স্মৃতিচারণে অগ্নিসংযোগের চিত্র

সিদ্দিক সালিক *উইটনেস টু সারেন্ডার: নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল* গ্রন্থে বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অভিযানের সময়ে তাঁদের অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রধান প্রধান শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের অন্য শহরগুলোতে শক্তিশালী সেনাদল পাঠায়। ১ এপ্রিল ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল পাঠায় একটি দল। সে দলে সিদ্দিক সালিকও ছিলেন। তিনি সে অভিযানের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, প্রধান সেনাদলটি মেশিনগান সজ্জিত ট্রাকে করে যাচ্ছিল। অন্য দুটি কোম্পানি রাস্তা ছেড়ে পাঁচশ মিটার দূর দিয়ে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাঁটছিল। কোম্পানি দুটি সম্ভাব্য সব রকমের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এবং অনুপ্রেরণা ও নিস্তেজকরণের রণসজ্জায় সজ্জিত ছিল। তারা সবকিছুকে বিচূর্ণ করে দিয়ে যাবে। পদাতিক সেনাদলের পিছনে ফিল্ডগানধারী গোলন্দাজের একটি অংশ ছিল। তারা বেশ সময় নিয়ে থেমে সামনের দিকে লক্ষ করে গোলাবর্ষণ করে। ফিল্ডগানের প্রচণ্ড শব্দ এলাকার বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করবে– এটা হলো উদ্দেশ্য।

সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, পদাতিক দল সামান্যতম অজুহাতে কিংবা সন্দেহে গুলিবর্ষণ করে চলে। গাছের পাতা নড়ার শব্দে কিংবা কোনো বাড়ির ভিতর হতে আসা শব্দে মেশিনগানের ব্রাশফায়ার হতে থাকে। যেখানে ব্রাশফায়ার হয় না সেখানে রাইফেলের গুলিবর্ষণ হয়। টাঙ্গাইল রোডের ওপর করটিয়ার কাছাকাছি ছোটো একটি জনপদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার সময়ে সেনারা সেখানকার কুঁড়েঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। কাছাকাছি বাঁশঝাড়গুলোও আগুন থেকে রেহাই পায় না। তিনি লিখেছেন, আগুন লাগিয়ে কিছুদূর এগিয়েছেমাত্র– এই সময়ে আগুনের তাপে প্রচণ্ড শব্দ করে একটি বাঁশ ফাটে। সবাই এই শব্দকে লুকিয়ে থাকা দুষ্কৃতিকারীর রাইফেলের গুলি মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সেনাদলটি তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে জনপদটিকে বিদীর্ণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঁশঝাড়টিতে তারা যাবতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করে। বিপদের উৎসটিকে নিশ্চিত করার পর তারা সতর্ক অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়। অনুসন্ধানীরা জীবিত কিংবা মৃত কোনো মানুষ পায় না। বাঁশ ফাটার শব্দ তাঁদেরকে পনেরো মিনিট দেরি করিয়ে দেয়।

সিদ্দিক সালিক টাঙ্গাইলের করটিয়া বাজার পুড়িয়ে দেওয়ার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন–

> করটিয়া একটি ছোটো শহর। নাম না জানা বুনো গাছের ঝোপঝাড়ে ঢাকা। একসারি দোকান ঘরের বাজার নিয়ে এই শহর। লোকজন আগেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কোথায় গেলো তারা? খুঁজে বের করা সমস্যার ব্যাপার। সেনাদলটি সেখানে থামলো। শহরটি ভালো করে খুঁজে দেখলো। তারপর বাজারটি জ্বালিয়ে দিলো। কয়েকটি কেরোসিনের টিনে আগুন লাগানো হলো। দ্রুত বাজারটি এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। ধূম্রকুণ্ডলীসহ আগুন লকলকিয়ে সবুজ গাছগাছালি ছাড়িয়ে ওপরে উঠলো। সৈনিকেরা তাদের কাজের ফলাফল দেখার জন্য দেরি করলো না। সামনে এগোতে শুরু করলো।[৯]

৫. স্মৃতিকথায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অগ্নিসংযোগের চিত্র

মানদাবালা গুহ 'আমার বাবা' শিরোনামে রশীদ হায়দার সম্পাদিত *স্মৃতি: '৭১* গ্রন্থে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও পটিয়া থানায় শ্বশুরবাড়ি এবং বাবার বাড়িতে

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মানদাবালা গুহের বাবা রজনী সেন, ভাশুরের ছেলে ব্রজলাল গুহসহ গ্রামের অনেক লোককে গুলি করে হত্যা করে এবং তাঁদের বাড়িঘর, আশ্রম এবং অন্য জিনিসপত্র অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়। মানদাবালা গুহ লিখেছেন–

> আমার মনে আছে, ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী দক্ষিণ চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। এর এক পর্যায়ে তারা আমার শ্বশুরবাড়ি সাতকানিয়া থানার বাজালিয়া গ্রাম আক্রমণ করে এবং আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, এবং অনেকের সঙ্গে আমার ভাশুরের একমাত্র ছেলে ব্রজগোপাল গুহকে গুলি করে হত্যা করে। আমরা কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হই। ঠিক পরের সপ্তায় অর্থাৎ এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে সেই শত্রুবাহিনী আক্রমণ করে আমার বাবার বাড়ি পটিয়া থানার মুজাফফরাবাদ গ্রাম। সেদিন পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্বিচারে গ্রামের সব বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং যুবক পুরুষদের গুলি করে হত্যা করে। এক পর্যায়ে আমার অশীতিপর বৃদ্ধ বাবা সৈন্যদের এই কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকার কথা বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সেখানেই গুলি করে হত্যা করে এবং তাঁর 'তমালতলা আশ্রম' জ্বালিয়ে দেয়। আশ্রমে রক্ষিত বাদ্যযন্ত্রপাতি, গানের বইখাতা সব পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। সৈন্যরা স্থান ত্যাগ করার পর গ্রামের লোকজন এসে তাঁর আশ্রমের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করে।[১০]

আবু জাফর শামসুদ্দীন *আত্মস্মৃতি* গ্রন্থে একাত্তরের বিভিন্ন তারিখে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। ৯ মে শনিবারের স্মৃতিতে লিখেছেন, সেদিন কাপাসিয়া বাজার এবং নিকটবর্তী কয়েকটি মৌজার বাড়িঘর দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। দেশীয় লোকদের দ্বারা বাজারের মালামাল লুট করায়। ১৮ সেপ্টেম্বরের আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন, আবু জাফর শামসুদ্দীন সকাল সাড়ে সাতটার ট্রেনে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে তিনি ছয়সাত মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ এলাকা হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে পুড়িয়ে দেওয়ার চিত্র দেখেন। তিনি লিখেছেন–

> পথে যে দৃশ্য দেখলাম তা কখনো ভোলার নয়। পোড়াবার কথা বহু শুনেছি, ঢাকা পোড়ানো তো স্বচক্ষেই দেখেছি; কিন্তু নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসী চাষীদের বাড়িঘর এমনভাবে পোড়াতে আর কখনো দেখিনি। টঙ্গী স্টেশন হতে মাইল দুয়েক পূর্ব হতে শুরু করে আড়িখলা স্টেশনের মাইল দেড় দুই পশ্চিম পর্যন্ত ৬/৭ মাইল দীর্ঘ রেলপথের দু'ধারে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। মাঝে মধ্যে দু'চারটে গরু চড়তে দেখা যায়। মানুষ নেই, সমস্ত অঞ্চল খাঁ খাঁ করছে।[১১]

আবু জাফর শামসুদ্দীন লিখেছেন, তিনি দগ্ধ বাড়িঘরের মধ্যে একটি রোমান ক্যাথলিক উপাসনা গৃহও দেখেন। পুবাইল স্টেশনের মাইল খানেক পশ্চিমে একটি রেল ইঞ্জিন বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন, পিছনে একটি বিধ্বস্তপ্রায় বগি। ধারণা করেন সেটা মাইন বিস্ফোরণের ফল। আড়িখলা থেকে রেললাইন ধরে

পূর্বদিকে হাঁটতে থাকেন। সেটা তাঁর বাড়ির পথ। মাইলখানেক রেলপথ ধরে যাওয়ার পর সিগনাল পার হয়ে দেখেন ১০/১২ বছরের একটি বালক রেললাইনের নিচে গরু চড়াচ্ছে এবং সুর করে গান গাইছে "আমার সোনার বাংলা"। আবু জাফর শামসুদ্দীন বললেন, 'ভয় করছে না তোর? সবতো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে ওরা।' বালকটি বুক ফুলিয়ে জবাব দেয়, 'মাটিতো জ্বালাইতে পারবো না সাব।'[১২]

হাসান আজিজুল হক *একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা* গ্রন্থে খুলনা শহরে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

> সন্ধের পরে খুলনা শহরের চারপাশের আকাশ লাল হয়ে ওঠে– ছাদে উঠলে দেখা যায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে শহরতলীতে, যশোর-খুলনার রাস্তার দু'পাশের বস্তিগুলোতে, আশেপাশের গ্রামগুলোতে। সারারাত সাঁই সাঁই শব্দে বাতাস কেটে বুলেট প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়ে।'

এমনই একদিন এপ্রিলের শেষের দিকে খালেদ রশীদকে নিয়ে হাসান আজিজুল হক দুপুরের খাবার খেতে বসেছেন। ঠিক সে সময়ে হাসান আজিজুল হকের বাসার দক্ষিণ পাশে একজন আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে পাকিস্তানি আর্মি আগুন লাগিয়ে দেয়। হাসান আজিজুল হক লিখেছেন–

> টিনের বাড়ি। ভদ্রলোকের ছিলো কেরোসিনের ডিলারশিপ। ঘরভর্তি কেরোসিনে ভরা টিন। সমস্ত পাড়াটা আর্মিতে ঘিরে ফেলেছে – আগুন দেওয়া হয়েছে বাড়িটায়। জতুগৃহের মতো এই অতি দাহ্য বাড়ি মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো। টিনের চালের নাটবল্টু বিকট আওয়াজে চারদিকে বুলেটের মতো ছুটতে লাগলো। কেরোসিনের টিনগুলো ফাটতে লাগলো বোমার শব্দে। বাড়া খাবার রইলো পড়ে। আমার স্ত্রী আর আমার বড়ো বোন আমাদের দু'জনকে ঠেলে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিলেন এই বলে যে, আর্মির লোকেরা এক্ষুণি এই বাড়ি ঢুকবে আর আমাদের পেলে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখবে না। কথাটা যে সত্যি তাতে একটুও সন্দেহ করা যায় না। আমি লুঙ্গির ওপর শার্ট পরে আর খালেদ রশীদ সবুজ লুঙ্গির ওপর কষে গামছা বেঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। আসার সময়ে সকলের দিকে চেয়ে খালেদ রশীদ তাঁর তীক্ষ্ণ প্রসন্ন গলায় বলেছিলেন, আবার দেখা হবে। না, সেটা আর হয়নি।[১৩]

মো. জহুরুল ইসলাম বিশু *পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা* গ্রন্থে পাবনা শহরে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, পাবনা শহরে হানাদার বাহিনীর দ্বিতীয় বার আগমন ঘটে ১১ এপ্রিল বিকাল চারটায়। ১০ এপ্রিল সকালে নগরবাড়ি ঘাট দখল করে। এরপর দিনরাত ঢাকা থেকে বিভিন্ন সমরাস্ত্র, কামান, ট্যাংকসহ প্রচুর সৈন্য এনে নগরবাড়ি ঘাটে জমা করে। পরদিন সকালে পাবনা শহর দখলের জন্য বিশাল সামরিক বহর নিয়ে যাত্রা করে। তারা পথের দু'পাশের বাড়িঘরে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে এগিয়ে যায়। যাকে সামনে পায় তাকেই গুলি করে হত্যা করে। পথের দু'পাশে আগুন দেওয়ার পর বাঁশের তৈরি

বাড়িঘরে আগুন লেগে বাঁশের গিড়া ঠুসঠাস শব্দে ফাটতে থাকে আর আর্মিরা মনে করে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মধ্যেই তুমুল ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। জহুরুল ইসলাম বিশু লিখেছেন, নগরবাড়ি থেকে পাবনা পর্যন্ত পথের দু'পাশের কিছু বাড়ি ছাড়া প্রায় সব বাড়িঘর আর্মিরা পুড়িয়ে দেয়। বহু নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করে।[১৪]

কাজী ফজলুর রহমান *দিনলিপি একাত্তর* গ্রন্থে চট্টগ্রাম অঞ্চলে একাত্তরের বিভিন্ন তারিখে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ২৯ মার্চ বিকালে পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারী মর্টার আর কামান নিয়ে চট্টগ্রামে ইপিআর ঘাঁটি আক্রমণ করে। পাঁচ, ছয় ও সাত নাম্বারের নিচের রাস্তার ধারে আগুন ধরে যায়। বিকাল পাঁচটার দিকে বাঙালি বাহিনী ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কাজী ফজলুর রহমান লিখেছেন–

> নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ শব্দ শুনে দরোজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি পঁচিশ ত্রিশ জন এক লাইনে দুই নম্বর থেকে সিঁড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠে মাঠের কোনাকুনি হয়ে আমাদের পাহাড় থেকে নেমে গেলো। ভয় করেছিলাম তাদের পিছু পিছু আসবে পাকিস্তানি সৈন্যরা। কিন্তু এলো না। এপথ দিয়েই যে গেছে সেটা টের পাইনি। একটু পরেই শুনলাম পাকিস্তানি সৈন্যরা ইস্পাহানিতে ঘাঁটি গেড়েছে। সন্ধ্যা থেকে চারদিকে আগুন আর আগুন। একটা বাতি নেই। চারদিকে দাউ দাউ আগুন থেকে বিচ্ছুরিত আলোতে সারা আকাশ আর ঘরবাড়ি একটা অস্বাভাবিক রং নিয়েছে।[১৫]

কাজী ফজলুর রহমান ৪ এপ্রিল চট্টগ্রামের স্মৃতিচারণে লিখেছেন, তিনি দেখেছেন সারাদিন শহরের এদিক-ওদিক আগুন জ্বলেছে। শুনেছেন, যেটা হিন্দুবাড়ি বলে সন্দেহ হয়েছে সেটাতেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই গুলি করে মেরেছে। ৮ এপ্রিলের খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে 'দূরে রাঙ্গামাটির রাস্তার আশেপাশে আগুন জ্বলতে' দেখেন । সেখানে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

মো. নওশের আলী *বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের আর্টিলারী বাহিনী ও আমার মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বগুড়ার সান্তাহার, রানীনগর, সাতানীপাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, বন্ধু মকসুদের ভগ্নিপতি আসাদকে সান্তাহার পার করে দিয়ে বিহারি-বাঙালি সংঘর্ষের পরিস্থিতি দেখার জন্য তাঁরা সান্তাহার স্টেশনে যান। সেখানে বগুড়া লাইনের প্লাটফরমে উঠে শত শত মানুষের মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পশ্চিম দিকে ব্রডগেজ প্লাটফরমে দেখেন আরও বীভৎস মানুষের স্তূপ। সান্তাহার স্টেশন থেকে তাঁরা রানীনগরের দিকে রওনা হন। রানীনগরের দিকে তখন গোলাগুলির আওয়াজ বাড়তে থাকে এবং কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উঠতে দেখেন। মো. নওশের আলী লিখেছেন–

> মনে হলো রানীনগরেই আগুন লেগেছে। আমরা রেল লাইন ধরে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছি, তখন সাইলো ফুড গোডাউনের কাছে। দেখি চতুর্দিক থেকে মানুষ ছুটে পালাচ্ছে। এবার মনে হলো পাকিস্তান মিলিটারিরা রেল লাইন হয়ে আসছে। আমরা রেল লাইন থেকে নেমে পশ্চিম দিকে ধান ক্ষেতের মাঠে নেমে পড়লাম। সামনে হালালিয়া হাটেও আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো। আর্মিরা ট্রেনযোগে আসছে আর রেল লাইনের দু'ধারে থাকা গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে।[১৬]

মো. নওশের আলী লিখেছেন, তাঁরা রাস্তা ধরে রানীনগরের দিকে হাঁটতে থাকেন, দেখেন আগুনের ধোঁয়ার লাইন নওগাঁর দিকে আসছে। সংবাদ পেলেন রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানি আর্মি আসছে। তাঁরা রাস্তা ছেড়ে পশ্চিম দিকে হেঁটে তুলসীগঙ্গা নদীর পাড়ে আসেন। দেখেন হাজার হাজার নারীপুরুষ, শিশুবৃদ্ধ সকলেই হাতে-মাথায়-ঘাড়ে কিছু না কিছু জিনিসপত্র নিয়ে নদী পার হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে রানীনগর থানার পাশে মকসুদের বাড়ি এসে দেখেন সেখানে লোকজন কেউ নেই। ওর বৃদ্ধ বাবাকেও পেলেন না। আশেপাশের অবস্থাও একই। দু'একজন লোক আছে তারাও বলতে পারে না কে কোথায় গেছে। নওশের আলী বন্ধু মকসুদকে বাড়িতে রেখে তিনি নিজের বাড়ির দিকে রওনা হন। রানীনগর বাজারে পৌঁছে দেখেন বাজার জনমানবহীন, চারদিকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। পাকিস্তান আর্মিরা রানীনগর বাজার স্টেশনের দুই পাশের বাড়িঘর, দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করেছে। রানীনগরের দক্ষিণ দিকের গ্রাম, চক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মো. নওশের আলী লিখেছেন–

> সাতানীপাড়া (চকবলরাম) গ্রামেও জ্বলছে বাড়িঘর। কিছু মানুষ ততোক্ষণে গ্রামে ফিরে এসে আগুন নিভানোর চেষ্টা করছে। এখানে পাঁচটি গ্রাম পাশাপাশি। সাতানীপাড়া (চকবলরাম), খাজুরিয়াপাড়া, গোবিন্দপুর, বিজয়কান্দি ও বরবড়িয়া। এরমধ্যে খাজুরিয়াপাড়াকে বিচ্ছিন্ন করে নদীর মতো একটি খাল বয়ে গেছে। রেল লাইনের কাছাকাছি থেকে এই গ্রামগুলো শুরু। পাকিস্তানি আর্মিরা এখানে ট্রেন থামিয়ে রেখে ব্যাপক গোলাগুলি করে দুই পাশের সকল গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে চলে যায়। এসব বীভৎস দৃশ্য দেখতে দেখতে খাল পার হয়ে খাজুরিয়াপাড়া গ্রামে বাড়িতে পৌঁছলাম। আমাদের গ্রামে আগুন লাগেনি, হয়তো নদীর মতো খাল পার হতে পারেনি বলে। আমার বাড়িতে গিয়ে দেখি কেউ নেই। বাবা-মা, ভাইবোন কাউকে দেখতে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম।[১৭]

কাদের সিদ্দিকী *স্বাধীনতা '৭১* গ্রন্থে টাঙ্গাইলে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ৩ এপ্রিল সামরিক বাহিনী টাঙ্গাইলে পৌঁছে যে কয়টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে তার মধ্যে তাঁদের বাড়ি একটি। খন্দকার আসাদুজ্জামান ও বদিউজ্জামানের বাড়ি হানাদার বাহিনী ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। কাদের সিদ্দিকীদের বাড়ি পাকা ছিল না,

তাঁদের ঘরগুলো ছিল টিনের, সেজন্য সেগুলো পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। বাড়ির আঙিনায় বড়ো বড়ো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সবকিছু ওলটপালট করে দেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি দেখার জন্য কাদের সিদ্দিকী রাতের বেলা সেখানে যান। শহরের খবর নিয়ে রাত নয়টায় টাঙ্গাইল পার্কের পশ্চিম পাশ দিয়ে লৌহজং নদীর পাড় ঘেঁষে বিবেকানন্দ হাই স্কুল ও খালেক অ্যাডভোকেটের বাড়ির পাশের আকুরটাকুর পাড়ার ভিতর দিয়ে তাঁদের বাড়ি দেখতে পান। দেখেন, বাড়ির নানা জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলা হয়েছে। দূর থেকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে বাড়ি যেন পানিতে ভাসছে। সন্তর্পণে বাড়ির কাছে গিয়ে দেখেন পোড়া টিনে চাঁদের আলো পড়ে দূর থেকে অমনটা মনে হয়েছে। কাদের সিদ্দিকী লিখেছেন–

> সারা বাড়ি ঘুরে তন্ময় হয়ে গেলাম। অঝোরে চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগলো। সাথীরা বারবার তাড়া দিচ্ছিলো। কিন্তু সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। শুধু টিনের ফাঁকে ফাঁকে পা বাঁচিয়ে এদিক ওদিক ঘুরছি। ... অনেকক্ষণ উদাসীন ঘুরাফিরা করে সবুরকে বললাম, "একটা বাঁশ আনো।" কোনো প্রশ্ন না করে সে সাত আট হাত লম্বা একটা বাঁশ নিয়ে এলো। পকেট থেকে বাংলাদেশের একটা পতাকা বের করে বাঁশের ডগায় লাগিয়ে মুক্তিপাগল সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে একেবারে বাড়ির মাঝখানে পুঁতে দিলাম। আসন্ন বিজয়ের প্রতীক পতাকাটি পত্‌পত্‌ করে উড়তে লাগলো। দুই ফারুক, সবুর, জাহাঙ্গীর ও আমি এক সারিতে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় সালাম জানালাম। তারপর চোখের পানি ফেলতে ফেলতে আস্তে আস্তে সরে এলাম।[১৮]

আসমা বেগম 'একাত্তর: আতংকের অপর নাম' শিরোনামে বেগম নূরজাহান সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া* গ্রন্থে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ২৫ মার্চের পর কুষ্টিয়ায় জরুরি অবস্থা শুরু হলে তাঁরা ঘরে কিছু চাল, ডাল এবং কেরোসিন সংগ্রহ করে রাখেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী তাদের অভিযানের সময়ে সেই কেরোসিন দিয়েই তাঁদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। কুষ্টিয়ার অবস্থা চরমে পৌঁছলে তাঁরা গ্রামের বাড়ি সাহাপুরে চলে যান। যাওয়ার পথে পিছন ফিরে দেখেন দাউদাউ করে জ্বলছে কুষ্টিয়া আর একটু পরপর প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ। সাহাপুরে পৌঁছেও তাঁরা স্থিত হতে পারেননি। প্রতিদিনই হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের সংবাদ পান। যেকোনো সময়ে সে গ্রামে হানা দিতে পারে পাকিস্তানি আর্মি। একদিন খুব ভোরে দূর থেকে হঠাৎ চিৎকার আর গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। তাঁরা তৎক্ষণাৎ বাড়ির সবাইকে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেন। ঘুমন্ত মেয়েকে টেনে তুলে, ছেলে, দুটি ননদ এবং ভাইয়ের মেয়ে উলকাকে নিয়ে যেদিকে পারেন ছুটতে থাকেন। স্বামী, শাশুড়ি পিছনে আসতে থাকেন। একটা পোটলায় কিছু চাল, একটা হাঁড়ি এবং টুকিটাকি কিছু জিনিস তাঁদের সঙ্গে। আসমা বেগম লিখেছেন–

> পিছনে তখন শুধু আগুন আর আগুন, চিৎকার কান্নাকাটি আর গোলাগুলির কান ফাটানো শব্দ। পাশের বাড়ির ছেলে লালু ছুটতে ছুটতে এসে পোটলাটি নিজের মাথায় তুলে নিলো। ওর দেখানো পথেই ছুটে চলেছি আমরা। কতোদূর গিয়ে থেমেছিলাম, কিভাবে গিয়েছিলাম কিছুই মনে নেই। পরনের কাপড়খানি ছিড়ে ফালি ফালি, হাঁটু পর্যন্ত জমাট কাদা, হাতমুখ ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত ঝরছে। ছেলেমেয়ে দুটো কাঁদছে। লালু আমাদেরকে এক বাড়িতে রেখে ছুটলো সংবাদ আনতে। ফিরে এসে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলো। আমাদের গ্রামখানি শ্মশানে পরিণত হয়েছে– ঘরবাড়ি ভস্মীভূত। কতো লোক যে নিহত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নিহতদের অনেকেই আমার নিকটাত্মীয়। লালুর বাবাও নিহত হয়েছেন।[১৯]

দারাজ উদ্দিন আহমেদ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র* গ্রন্থে জয়পুরহাটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ২৬ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্য জয়পুরহাটে পৌঁছে এবং ২৭ এপ্রিল ট্রেনযোগে তারা পাঁচবিবি যাবার পথে পুরানোপৈল রেলস্টেশনের উত্তরে গুদাম ঘরের কাছে ট্রেন থামিয়ে গ্রামের লোকদের নির্দেশ দেয়, 'মালাউনকা ঘর জ্বালাদো।' তারা নিজেরাও একটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রামের লোকেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গ্রামের সমস্ত হিন্দুবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। দারাজ উদ্দিন লিখেছেন, ২৮ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা মুসলিম লীগারদের খবরে জয়পুরহাট থেকে তিন মাইল পূর্ব-উত্তর কোণের হিন্দুপ্রধান গ্রাম করোই কাদিরপুর ঘেরাও করে অপারেশন করে। সে গ্রামের অধিকাংশ জনগণ হিন্দু এবং পেশায় কুমার। অপারেশনে ১৮৫ জন পুরুষ-মহিলা এবং বাচ্চাকে হত্যা করে। গ্রাম ঘেরাও করার পর সাধারণ লোক যখন প্রাণভয়ে পালাতে থাকে তখন তাদের ওপর সৈন্যরা বেপরোয়া গুলি চালায়। কিছুসংখ্যক লোককে তারা ধরে নেয় এবং ৩/৪ জন মুন্সিকে দিয়ে তাদেরকে জবাই করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুন্সিদেরকে বাধ্য করে জবাই করাতে। ৬/৭ জন লোক প্রাণভয়ে কচুরিপানার ভিতর লুকিয়ে ছিল, সৈন্যরা তাদেরকে দেখে সেখানেই গুলি করে হত্যা করে। হত্যাযজ্ঞ শেষ করার পর সৈন্যরা সমস্ত গ্রামটিকে অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়।[২০]

আলতাফ হোসেন *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র* গ্রন্থে রংপুরের নাগেশ্বরীতে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, হানাদার বাহিনী নাগেশ্বরীতে এসেই জনগণকে নির্যাতন, হত্যা এবং নানারকম ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে। নাগেশ্বরী দখলের তিন দিন পর সকাল ১০টায় তারা নাগেশ্বরী বাজারের উত্তর-পূর্ব দিকের গ্রামে প্রবেশ করে। জনৈক আছমত মিয়ার গৃহে প্রবেশ করে সৈন্যরা আছমত মিয়া এবং অন্য পুরুষদের বের করে দিয়ে তার পুত্রবধূর (২০) ওপর পাশবিক নির্যাতন করে। ২৭ মে হানাদাররা নাগেশ্বরী থানায় প্রবেশের পর

তারা প্রথমে নাগেশ্বরী বাজারের হিন্দুপট্টিতে, তাদের দোকান ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়। এরপর ঢাকাইয়া-পট্টিতে অগ্নিসংযোগ করে তা নিশ্চিহ্ন করে। আলতাফ হোসেন লিখেছেন, ঐ দিনই হানাদাররা বাজার সংলগ্ন সাঞ্জুয়ার ভিটার মুক্তিযোদ্ধা মোসলেমের বাড়ি এবং প্রতিবেশী রমযানের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। সেদিন হানাদার সৈন্যরা নাগেশ্বরী বাজার জামে মসজিদের নিকট পপাটুয়া (টমেটু) নামে এক পাগলকে গুলি করে হত্যা করে। একটি পাগলীকে সেনারা হিন্দুপট্টি সংলগ্ন আজিজার মিয়ার বাড়িতে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে। নাগেশ্বরী বাজারে হিন্দুপট্টি এবং ঢাকাইয়াপট্টিতে অগ্নিসংযোগের ফলে পার্শ্ববর্তী বহু ব্যবসায়ী ও গৃহস্থের বাড়ি আগুনের থাবায় ভস্মীভূত হয়।[২১]

রফিকুল ইসলাম *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* গ্রন্থে রামগড়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অগ্নিসংযোগের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ২ মে পর্যন্ত করেরহাট, রামগড়, মহলছড়ি, খিয়াখু অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করতে তাঁরা তুমুল যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রতিরোধ যুদ্ধে তাঁদের বাহিনীতে ছিল ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং এক সপ্তাহের ট্রেনিংপ্রাপ্ত নতুন মুক্তিযোদ্ধা। যেকোনো উপায়ে মুক্তিযোদ্ধারা রামগড়ের ঘাঁটি রক্ষা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রতুলতা এবং সৈন্যসংখ্যা কম হওয়ার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমে ক্রমে পিছু হটতে বাধ্য হন। মুক্তিযোদ্ধারা রামগড় ছেড়ে ভারতের সাবরুম ঘাঁটিতে আশ্রয় নিলে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পুরো রামগড় এলাকা দখলে নেয় এবং রামগড় বাজার, দোকানপাট, বাঙালিদের বাড়িঘর সবকিছু অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়। রফিকুল ইসলাম লিখেছেন–

> সূর্যাস্তের একটু আগেই রামগড়ে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। রামগড়ের যুদ্ধে জড়িত আমাদের গেরিলাযোদ্ধা, সৈনিক এবং আমরা ক'জন আর্মি অফিসার ফেনী নদী পার হয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে সরে এলাম। সাবরুমে এসে আমাদের সৈন্য এবং গেরিলা যোদ্ধারা প্রায় সবাই পায়ে হেঁটে রওনা হলো হরিণার দিকে। কয়েকজন ক্লান্ত-অবসন্ন অফিসার সাবরুমে এসে বসে পড়লো একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। তারপর তারাও হাঁটতে শুরু করবে হরিণার পথে। সাবরুমে, ফেনী নদীর পাড়ে আরো ক'জন মুক্তিযোদ্ধাসহ দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। নদী এখানটায় প্রায় ৫০ গজ চওড়া। দেখছিলাম সাবরুমের আশেপাশের পাহাড় এবং সাবরুম শহর, সামনের নদী, রামগড় এবং তারও পরে জনমানবহীন মাঠঘাট, পথপ্রান্তর, দূরের পাহাড় – সবকিছু ঢেকে গেলো অন্ধকারে একে একে। মনে হলো এক অপার্থিব আঁধার যেনো ভর করেছে সমস্ত বিশ্বচরাচর, এ যেনো আমার পৃথিবীর চেনা অন্ধকার নয়। অসহায় নিষ্ফল আক্রোশে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম পাকিস্তানি সৈন্যরা রামগড়ের বাজার, দোকানপাট, বাঙালিদের বাড়িঘর সবকিছুই আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে একের পর এক। আগুনের লেলিহান শিখায় আলোকিত হয়ে ওঠে রামগড়, সাবরুম ও আশেপাশের সমস্ত এলাকা – বহুদূর পর্যন্ত।[২২]

রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, রামগড়ের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। সন্ধ্যার পর থেকে পাকিস্তানিরা রামগড় এবং তার আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে ডিফেন্স তৈরি শুরু করে আর রামগড়ের পুরো বাজারটি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা কালো ধোঁয়া আর অগ্নিবলয়ের ভিতর দিয়ে তাঁরা মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়াগুলো দেখতে থাকেন।

৬. উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের অধিকাংশ স্মৃতিকথায় হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের প্রসঙ্গ থাকলেও তাদের অনেকগুলোতে বিস্তারিত বিবরণ নেই। স্মৃতিকথার তথ্যমতে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ত্রাস সৃষ্টি এবং তাদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার অন্যতম উপায় ছিল অগ্নিসংযোগ। মৃতের সংখ্যা বাড়ানো তাদের যেমন লক্ষ্য ছিল তেমনি সমগ্র বাংলায় পাড়ামহল্লা, ঘরবাড়ি, বাজার, দোকানপাট জ্বালানো এবং লুটপাট, ধ্বংস ইত্যাদি তাদের নেশায় পরিণত হয়েছিল। স্মৃতিকথায় প্রকাশিত হয়েছে, অনেক জায়গায় সেনারা মানুষসহ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, অনেক জায়গায় জীবন্ত মানুষকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেছে, অনেক জায়গায় গণহত্যা সংঘটিত করে তাদেরকে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে।[২৩] রবার্ট পেইন লিখেছেন, 'অত্যন্ত পরিকল্পিত ছিলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এ হত্যাযজ্ঞ। ... প্রতিরোধহীন সমস্ত মানুষকে হত্যা করা তাদের সিগারেট মদ খাবার অভ্যেসের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।'[২৪]

স্মৃতিকথার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বত্র পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। তারা সামরিক কনভয় পরিচালনার সময়ে রাস্তার দু'পাশের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে এবং যে এলাকায় তারা মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধকে পরাজিত করে এগিয়ে যেতে পেরেছে সেখানে অগ্নিসংযোগ করেছে এবং তারা তাদের সন্দেহপ্রবণ এলাকাগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। স্মৃতিকথায় প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষত তারা হিন্দুপ্রধান এলাকা এবং আওয়ামী লীগের সদস্যদের বাড়িঘর ও তাদের সমর্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অগ্নিসংযোগের ঘটনা বেশি ঘটিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘর এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যারা নানাভাবে আশ্রয়প্রশ্রয় ও সহযোগিতা প্রদান করেছে তাদের বাড়িঘর ও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহে অগ্নিসংযোগ করেছে।

তথ্যসূত্র

১. জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, দ্বাবিংশতম মুদ্রণ (ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৯৯) পৃ. ৪৩

২. মোসলেমা খাতুন, 'মৃত্যুর মুখোমুখি' রশীদ হায়দার (সম্পা.) *১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা*, ষষ্ঠ মুদ্রণ (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬) পৃ. ৪৭

৩. আমীর-উল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি* (ঢাকা: কাগজ প্রকাশন, ১৯৯১) পৃ. ১৯

৪. সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, পরিমার্জিত অষ্টম সংস্করণ (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৮) পৃ. ৬৯

৫. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জার্নাল '৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০২) পৃ. ৯৪

৬. জহুরুল হক, *নিষিদ্ধ নিশ্বাস* (ঢাকা:বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪) পৃ. ৭২

৭. জন হেস্টিংস, 'অগ্নিদগ্ধ গ্রাম' রায়হান রাজু অনূদিত, আঁদ্রে মালরো ও অন্যান্য, *বাংলাদেশে পাকিস্তানের মানবাধিকার লঙ্ঘন: কয়েকটি জবান বন্দি*, প্রথম বাংলা সংস্করণ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৬) পৃ. ৭৬

৮. সিডনি শনবার্গ, *ডেটলাইন বাংলাদেশ: নাইনটিন সেভেন্টিওয়ান*, মফিদুল হক অনূদিত, চতুর্থ প্রকাশ (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭) পৃ. ৯৮

৯. সিদ্দিক সালিক, *উইটনেস টু সারেন্ডার: নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল*, আজিজুল হক অনূদিত (ঢাকা: সবুজ পাতা প্রকাশনী, ২০১৮) পৃ. ১০৬

১০. 'মানদাবালা গুহের স্মৃতিকথা', অনুলিখন: অমল গুহ, রশীদ হায়দার (সম্পা.) *স্মৃতি: ১৯৭১*, চতুর্থ খণ্ড,পুনর্বিন্যাসকৃত প্রথম সংস্করণ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৯) পৃ. ৮০

১১. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬) পৃ. ৫৮১

১২. *ঐ*, পৃ. ৫৮২

১৩. হাসান আজিজুল হক, *একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা*, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪) পৃ. ২৮

১৪. মো. জহুরুল ইসলাম বিশু, *পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা*, তৃতীয় মুদ্রণ (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৯) পৃ. ৬০

১৫. কাজী ফজলুর রহমান, *দিনলিপি: একাত্তর*, তৃতীয় মুদ্রণ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০) পৃ. ২৬

১৬. মো. নওশের আলী, *বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের আর্টিলারি বাহিনী ও আমার মুক্তিযুদ্ধ* (রাজশাহী: বিকল্প অফসেট প্রেস, ২০১৯) পৃ. ৪০

১৭. *ঐ*, পৃ. ৪২

১৮. কাদের সিদ্দিকী, *স্বাধীনতা '৭১*, ষষ্ঠ সংস্করণ (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৭) পৃ. ৫২

১৯. আসমা বেগম, 'একাত্তর: আতংকের অপর নাম', বেগম নূরজাহান (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১৩) পৃ. ২৭

২০. 'দারাজ উদ্দিন আহমেদের স্মৃতিকথা', হাসান হাফিজুর রহমান, (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, অষ্টম খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৮) পৃ. ৩৮৭

২১. 'আলতাফ হোসেনের স্মৃতিকথা', *ঐ*, পৃ. ১৫৪

২২. রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, দশম মুদ্রণ (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ২০১৬) পৃ. ২৬৪

২৩. নাসির উদ্দিন, *যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা*, পঞ্চম মুদ্রণ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৮) পৃ. ১৫০

২৪. রবার্ট পেইন, *ম্যাসাকার*, গোলাম হিলালী অনূদিত (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৬) পৃ. ২১

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রণদাপ্রসাদ সাহা

ড. ওয়াসীম পারভেজ সিদ্দিকী*

সারসংক্ষেপ: রণদাপ্রসাদ সাহা (আর পি সাহা) ছিলেন একজন মহান জনহিতৈষী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। ১৮৯৬ সালে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার মির্জাপুর গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন এবং ১৬ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু (১৯১৪) হলে অন্য অনেক ভারতীয় তরুণের মতো তিনিও ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন এবং বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের সদস্য হিসেবে ১৯১৫ সালের ১১ মে মেসোপটেমিয়ার (ইরাক) উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন। ১৯১৬ সালের ২৭ জুন বাগদাদে ব্রিটিশ বাহিনী পরিচালিত হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকজন ব্রিটিশ কর্মকর্তাসহ অনেককে উদ্ধার করেন। যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি ব্রিটিশরাজ পঞ্চম জর্জের নিকট থেকে একটি পদক ও প্রশংসাপত্র লাভ করেন। যুদ্ধ শেষে ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি আরও প্রায় ৫ বছর সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন।

রণদাপ্রসাদ সাহা ভারতীয় উপমহাদেশের এক অনন্য কৃতিসন্তান। দানবীর হিসেবেই তিনি সুপরিচিত। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আরপি সাহা নামে অধিক পরিচিত। রণদাপ্রসাদের পদবি সাহা। সাহা সাহু এবং সাধুর অপভ্রংশ। সাধু শব্দের অর্থ বণিক।[১] সংসদ বাংলা অভিধানে সাহা শব্দের অর্থ করা হয়েছে বিবিধ বণিক জাতির (বিশেষত, শৌন্ডিক জাতির) উপাধি বিশেষ।[২] আরপি সাহার পিতার নাম ছিল দেবেন্দ্র পোদ্দার। পোদ্দার পদবির অর্থ হচ্ছে মুদ্রার বিশুদ্ধতা পরীক্ষক বা বিনিময়কারী এবং যে ব্যক্তি বন্ধকি কারবার করে অর্থাৎ মহাজন।[৩] সুতরাং বলা যায়, আরপি সাহা পৈত্রিকভাবেই বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। রণদাপ্রসাদ সাহা ১৮৯৬ সালের ১৫ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর গ্রাম ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের পৈত্রিক নিবাস।[৪] শৈশবকাল তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। তাঁর বাবা দেবেন্দ্র পোদ্দার নির্দিষ্ট কোনো ব্যবসা না করলেও তৎকালীন করটিয়ার জমিদার খান পন্নীদের হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন।[৫] শৈশবেই রণদা দুরারোগ্য

***সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, কাগমারী, টাঙ্গাইল।**

ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত মা কুমুদিনী দেবীকে হারান। মায়ের এই অপমৃত্যু তাঁর মনে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা তিনি কোনো দিনই ভুলতে পারেননি। ৭ বছর বয়সে মায়ের মৃত্যুর পর পিতা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করলে ১৬ বছর বয়সে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতা চলে যান। এর পূর্বে তিনি মির্জাপুর বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছিলেন।[৬] রণদাপ্রসাদ জীবন ধারণের জন্য সব রকম কাজই করেন। নিজের ক্ষুদ্র ব্যবসায় সময়মতো ঝুঁকি গ্রহণ, কষ্ট স্বীকার এবং সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা কালক্রমে এক বিশাল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন, যাতে সহস্র মানুষের কর্মসংস্থান হয়।[৭] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ও শিল্প একই সাথে সংগঠন ও পরিচালনা করে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি মূলত একজন ব্যবসায়ী হলেও জীবনের প্রথমভাগে সক্রিয়ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলো, বিশেষ করে মেডিকেল ইউনিট পরিচালনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু তিনি কীভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অনন্য অবদান রেখেছিলেন এ সম্পর্কে কোনো গবেষণা লক্ষ করা যায় না। এ বিবেচনা থেকেই এ প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের জন্য আর্কাইভস্-এ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কিত দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পুস্তক, প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রকাশনার সহায়তা নেয়া হয়েছে।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল রেজিমেন্টে অস্থায়ী সুবেদার মেজর হিসেবে রণদাপ্রসাদ সাহা যোগদান করেন।[৮] এখানে নতুন করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে নওশেরায় ট্রেনিং শেষে করাচি অবস্থান করেন।[৯] এখানে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তিনি পরিচিত হন।[১০] করাচি সেনানিবাসে নজরুলের সাহিত্যচর্চার সাথে সংগীতচর্চাও অব্যাহত ছিল।[১১]

রণদাপ্রসাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন যুদ্ধরত একজন সৈনিক, সে সময় সামরিক হাসপাতালে হঠাৎ করে একদিন আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সবাই যখন আগুনের ভয়ে ভীত তখন রণদাপ্রসাদ সাধারণ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিপন্ন রোগীদের উদ্ধার করতে সক্ষম হন।[১২] তাঁর এই বীরত্বের ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ সংক্রান্ত বেশ কিছু খবরও প্রকাশিত হয়।[১৩] পরবর্তীকালে রণদাপ্রসাদ যখন দেশে ফিরে আসেন তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এছাড়াও সম্রাট পঞ্চম-জর্জ রণদাপ্রসাদ সাহাকে সম্মানিত 'সোর্ড অব অনার' পদকে ভূষিত করে একটি তলোয়ার পুরস্কার হিসেবে উপহার দিয়েছিলেন, তলোয়ারটি রণদাপ্রসাদ সাহা জাদুঘরে বর্তমানে সুরক্ষিত আছে।[১৪]

রণদাপ্রসাদ সাহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন বাঙালি সৈনিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাঙালিদের প্রথম সামরিক সংগঠন বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। সেই সময়কার সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত রণদাপ্রসাদ বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরে যোগদানের মাধ্যমে সাধারণ বাঙালি থেকে একজন সৈনিক বাঙালিতে পরিণত হন।[১৫] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রণদাপ্রসাদ সাহার অংশগ্রহণের বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিচে বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হলো।

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিকে বাঙালিদের ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তৎকালীন বাঙালি নেতারা ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করেন যে, অন্য ভারতীয়দের মতো বাঙালিরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায় এবং ইংরেজ সরকারেরও উচিত বাঙালিদেরকে তাদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া।[১৬] এক্ষেত্রে বাঙালি নেতাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মহারাজ মাহতাব চাঁদ, বাবু মতিলাল ঘোষ, নবাব এ. এফ. এম. আব্দুর রহমান, এ. কে. ফজলুল হক, ডাক্তার (লে. কর্নেল) এস.পি. সর্বাধিকারী, ডাক্তার এস. কে. মল্লিক, নবাব সুজাত আলী বেগ প্রমুখ।[১৭]

১৯১৪ সালের ৪ আগস্ট ইংল্যান্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে একটি চিকিৎসক দল প্রেরণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়।[১৮] এ কারণে ৬ আগস্ট ডাক্তার এস. পি. সর্বাধিকারী বেঙ্গল মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে ভাইসরয়কে বাংলা থেকে একটি চিকিৎসা স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের প্রস্তাব প্রদান করেন। বেঙ্গল মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ৮ আগস্ট পত্রিকার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবীদের নাম নিবন্ধনের আহ্বান জানান এবং ১২ আগস্ট কলকাতা ওভারটন হলে একটি সভার আয়োজন করে পরবর্তীকালে ডাক্তার সর্বাধিকারী ৮০ জন ডাক্তার ও ৪০ জন নার্স, ড্রেসার, ডিস্পেনসারকে যুদ্ধের জন্য তালিকাভুক্ত করেন।[১৯] ১৯১৪ সালের ১৪ আগস্ট সরকারকে সহযোগিতা করার বিষয়ে কলকাতা টাউন হলে একটি ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পত্রিকায় সভার সিদ্ধান্তটি এভাবে প্রকাশ পায়:

> এই সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তারা সরকারকে সহযোগিতা করবে এবং মত পোষণ করে যে ভারতীয়দের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ভর্তি করা হোক ; যাতে তারা যানবাহনের দায়িত্ব ও চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থাপনা এবং সরকার যা উপযুক্ত মনে করে এমন দায়িত্বে সম্পৃক্ত হতে পারে।[২০]

১৪ আগস্টের সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৪ সালের ২০ আগস্ট ভাইসরয় তারবার্তার মাধ্যমে জানান যে, বাঙালিদের নিয়ে একটি চিকিৎসা দল বা ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স গঠন করা হবে।[২১] এদের কাজ হবে যুদ্ধাহত সৈনিকদের স্ট্রেচারে বহন করা। এ তারবার্তাকে সরকারের সম্মতি হিসেবে বিবেচনা করে "বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর" তথা এর অঙ্গসংগঠন অর্থাৎ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স গঠনের জন্য বর্ধমানের মহারাজকে সভাপতি এবং ডাক্তার সর্বাধিকারীকে সচিব করে "বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর" কমিটি নামে একটি বেসরকারি কমিটি গঠন করা হয়।[২২]

১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে ফোর্ট উইলিয়ামে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা হয়।[২৩] এ সভায় বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর কমিটি ক্ষুদ্র আকারে একটি ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স গঠন করে যুদ্ধে নিয়োগের প্রস্তাব দেয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিলে পরবর্তীকালে আরও চিকিৎসা ইউনিট গঠন করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে বলে প্রস্তাব দেয়।[২৪] ১৯১৪ সালের ৮ নভেম্বর ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের মহাপরিচালক স্যার পার্ডে লিউকিস ডাক্তার সর্বাধিকারীকে দেশে বা দেশের বাইরে সামরিক বাহিনীতে কাজ করতে ইচ্ছুক স্বেচ্চাসেবী ও ডাক্তারদের নাম পাঠাতে অনুরোধ করেন।[২৫] এ সংবাদে বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠনে নতুনভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ১৯১৪ সালে ১৮ নভেম্বর পত্রিকায় নিয়োগের শর্ত, চাকরির সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।[২৬] সরকার থেকে কোনো চূড়ান্ত আদেশ না পেলেও ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯১৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠনের কাজ চলতে থাকে।[২৭] ১৯১৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরকে মেসোপটেমিয়ায় রিভার অ্যাম্বুলেন্স বা নদী পথে চিকিৎসা সেবা প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[২৮] ৬ মার্চ ভাইসরয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন বক্তব্যে রিভার অ্যাম্বুলেন্স গঠনের সরকারি ঘোষণা প্রদান করেন। ১৮ মার্চ লে. কর্ণেল এএইচ নট-কে সরকারের পক্ষ থেকে রিভার অ্যাম্বুলেন্স-এর অধিনায়ক নির্বাচন করা হয় এবং ৪ জন বাঙালি ডাক্তারকে কিং কমিশন দেওয়া হয়।[২৯]

১৯১৫ সালের ২৪ মার্চ ডাক্তার সর্বাধিকারী আবেদনকারীদের মধ্যে ইচ্ছুকদের প্রশিক্ষণে যোগ দিতে তার বাসার ঠিকানায় উপস্থিত থাকার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেন।[৩০] ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবী ১ এপ্রিলের মধ্যে প্রশিক্ষণের জন্য অ্যাম্বুলেন্স কোরে যোগ দেন। অ্যাম্বুলেন্স কোরের জন্য ১০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি ভাসমান হাসপাতাল তৈরি করা হয়। ১৯১৫ সালের ৮ মে লর্ড কারমাইকেল আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভাসমান হাসপাতালের নামকরণ করেন বেঙ্গলী (Bengalee)।[৩১] ১৯১৫ সালের ১১ মে "বেঙ্গলী" কলকাতা থেকে সমুদ্র পথে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে রওনা

হয়।[৩২] বেঙ্গলী ছিল একটি অভ্যন্তরীণ নদীপথে চলাচলের ফ্ল্যাট, তাই করাচী পৌঁছার আগেই ১৭ মে রাত ১১টার দিকে মাদ্রাজের কাছাকাছি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও ঝড়ের মধ্যে পড়ে ভারত মহাসাগরে এটি ডুবে যায়।[৩৩] বেঙ্গলী ডুবে যাওয়ার পর বাঙলার নেতারা রক্ষা পাওয়া সদস্য ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে মেসোপটেমিয়ায় ২০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠায়।[৩৪]

১৯১৭ সালে ভারত সরকার একটি 'বেঙ্গলি ডবল কোম্পানি' গঠন করতে রাজি হয়।[৩৫] এ সময়েই রণদাপ্রসাদ বেঙ্গল রেজিমেন্টে অস্থায়ী সুবেদার মেজর পদে যোগ দেন।[৩৬] এই রেজিমেন্টে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিতে আরও যারা ছিলেন তারা হলেন, চট্টগ্রামের মাহবুবুল আলম, কুষ্টিয়ার সম্ভু রায় এবং শ্রীমান মনিভূষণ। মার্চ মাসে আর্মডহার্স্ট স্ট্রিটে ডা. সর্বাধিকারীর বাসভবনে ভর্তির জন্য রণদাপ্রসাদ সাহা উপস্থিত হন।[৩৭] ১ এপ্রিল বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের সদস্যরা আলিপুর সেনানিবাসের ১৬ রাজপুত রেজিমেন্টের সাথে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার পর বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের সদস্যদের পুলিশ ভেরিফিকেশন করা হয়। এ সময় রণদাপ্রসাদ পুলিশের ছাড়পত্র পাননি। কারণ, তিনি কিছুদিন রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসেবে জেলহাজতে ছিলেন। কিন্তু ডা. সর্বাধিকারী পুলিশ কমিশনারের সাথে রণদার বিষয়ে যোগাযোগ করলে তিনি রণদার ছাড়পত্র আদায়ে সমর্থ হন।[৩৮]

১৯১৫ সালের ২৬ জুন প্রশিক্ষণ শেষে বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর মেসোপটেমিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে প্রথমে বোম্বে, পরে বসরা হয়ে ১৫ জুলাই আমারা শহরে পৌঁছে। বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের যে সদস্যরা ৬ ডিভিশনের ২ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের সাথে সংযুক্ত হয়ে বাগদাদ আক্রমণের জন্য রওনা হয়েছিল রণদাপ্রসাদ তাদের মধ্যে ছিলেন।[৩৯] বাগদাদের পথে অগ্রযাত্রার সময় আহত সৈনিকদের সেবা করা-সহ অন্য কাজগুলো বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের সদস্যরা করতেন। ব্রিটিশবাহিনীর বাগদাদে পৌঁছানোর পূর্বেই টেসিফোনে তুর্কিবাহিনী ব্রিটিশবাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে।[৪০] টেসিফোনে তুর্কিবাহিনীর সাথে কয়েকদিনের প্রচণ্ড লড়াই হয়। রণদাপ্রসাদ যুদ্ধরত বাহিনীকে নিরলসভাবে চিকিৎসাসেবা দিতে থাকেন। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন,

> At the battle of Ctesiphone Phanihbusan Ghose, Sissir Prosad Sarbadhicari brother of Dr. S.P. Sarbadhicari and myself under Havildar Champati were with the rear guard.[৪১]

কঠোর পরিশ্রম ও অসাধ্য সাধন দ্বারা রণদাপ্রসাদ টেসিফোন যুদ্ধে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। রণদাপ্রসাদ সাহার সহযোদ্ধা হাবিলদার পিসি সেন এ সম্পর্কে বলেন,

> The Subedar Major of the 76th Punjabis was a jolly old man. He had a bullet in his pelvis and could not walk. When RP Saha went to lift him on his back he shouted for six more like him saying he was 2 mounds and a half.[৪২]

ব্রিটিশবাহিনী এ সময়ে কুটে ফেরত আসে এবং তুর্কিবাহিনী দ্বারা সেখানে অবরুদ্ধ হয়। বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের সদস্যদের বিভিন্ন হাসপাতাল যেমন ব্রিটিশ জেনারেল হসপিটাল, ইন্ডিয়ান জেনারেল হসপিটাল ইত্যাদি স্থাপনায় ভাগ করে দেয়া হয়। রণদা ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ইন্ডিয়ান হসপিটালে যোগ দেন।

অনেকদিন কুটে অবরুদ্ধ থাকার ফলে সেখানে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এ বিষয়ে রণদাপ্রসাদ বলেন,

> টেসিফোনের যুদ্ধে ফনিভূষণ ঘোষ, শিশির প্রসাদ সর্বাধিকারী এবং আমি হাবিলদার চম্পাটির নেতৃত্বাধীনে সেনাদলের পশ্চাদ দিকে ছিলাম। আমাদের কুটে গমন ও অবরোধের কাহিনী সকলেই জানেন। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র রসদ না ফুরাইয়া যায়, সেইজন্য আমাদের দৈনিক আহার্যের পরিমাণ অর্ধেকে পরিণত করা হইয়াছিল।[৪৩]

সৈনিকদের মধ্যে টাটকা সবজির অভাবে এ সময় পাইওরিয়া, স্কার্ভি ও অন্যান্য অসুখ দেখা দেয়। এই রোগগুলো নিরাময়ের জন্য প্রথম দিকে সামান্য কিছু ঔষধ ছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাও শেষ হয়ে যায়।[৪৪] এই দুঃসময়ে রণদা একটি কাজ করলেন যাতে অনেকের উপকার হলো। তিনি সকল বিপদ উপেক্ষা করে বিভিন্ন স্থান থেকে ঘাস, আগাছা, সবুজ পাতা ইত্যাদি নিয়ে আসতেন। সৈনিকরা এগুলো সেদ্ধ করে খেতেন। মাঝে মাঝে ভারতীয় জেনারেল হাসপাতালেও এগুলো সরবরাহ করা হতো। এ সময় অনেক সৈনিকের মধ্যেই স্কার্ভি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কিন্তু রণদাপ্রসাদের আনা এ ধরনের খাবার খেয়ে অনেক সৈনিক স্কার্ভি রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।[৪৫]

এই বিষয়ে রণদার এক সহযোদ্ধা বলেন,

> Everyday and several times a boy-brave Ranada Prasad would slip out into cultivated area in enemy territory, into kitchen gardens and fruits garden belonging to the enemy and though exposed to well directed enemy fire would come back triumphantly with his booty in the shape of heavy loads of fresh vegetables and fruits much to the delight of the sick as well as healthy. He had many hairbreadth escapes from being caught of shot.[৪৬]

রণদার এ ধরনের সাহসিকতার উদাহরণ হাবিলদার প্রফুল চন্দ্র সেনের লেখায়ও পাওয়া যায়। রণদাপ্রসাদ সাহা যখন কুটে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁর বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে জানা যায়। হাবিলদার সেন তার ব্যক্তিগত লেখায় উল্লেখ করেন,

> One morning at about 3 a.m. a picked body of troops was ordered to be in readiness under general Delamain [Brigade Commander] to receive a steamer that would try to force its way upto Kut with provisions. From the Bengal Ambulance Sergeant Champati, myself and Private Ranada Saha were selected. There was a sharp fussillade over Magasia side at about 3 a.m. and next morning we heard that steamer Julner was taken by the Turks with all the provisions meant for us.[৪৭]

১৯১৬ সালের ২৯ এপ্রিল ব্রিটিশবাহিনী কুটে আত্মসমর্পণ করে।[৪৮] ১৭ মে বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের সদস্যরা বাগদাদ পৌঁছায়। ২৪ মে বন্দিদের দ্বারা বাগদাদে ২টি হাসপাতাল চালু হয়। এর মধ্যে ১টি হচ্ছে কর্নেল হেয়ারের নেতৃত্বে এবং অপরটি লে. কর্ণেল হেনসির নেতৃত্বে। রণদাপ্রসাদ কর্নেল হেয়ারের হাসপাতালে যোগদান করেন।[৪৯] কর্নেল হেয়ারের হাসপাতালের সাথে আর্টিলারির গোলাসহ একটি ম্যাগাজিন ছিল। ২৭ জুন অসাবধানতার ফলে ম্যাগাজিনে কাজ করার সময় একটি গোলাবারুদ বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের কারণে হাসপাতাল ভবনে আগুন ধরে যায়। রণদাপ্রসাদ আগুনের ধোঁয়া দেখে হাসপাতালে ছুটে আসেন এবং দেখতে পান যে, হাসপাতালটি আগুনে পুড়ছে। তুর্কি দমকল বাহিনী আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং ফেরত চলে যায়। রণদাপ্রসাদ তখন তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন কিং-এর কাছে আটকেপড়া রোগীদের উদ্ধারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্যাপ্টেন কিং এই ঝুঁকি নিতে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত রণদাপ্রসাদের পীড়াপীড়িতে ক্যাপ্টেন কিং ঝুঁকি নিতে রাজি হন। রণদা একাই উদ্ধারের কাজ শুরু করেন। রণদাপ্রসাদের সাহস এবং মানবিকতার কারণেই আটকেপড়া রোগীরা জীবন ফিরে পায়।[৫০]

এর কিছুদিন পর রণদা ও বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের আরও ৬ সদস্য ১৬ সেপ্টেম্বর বসরা থেকে রওনা দিয়ে বোম্বে হয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতা পৌঁছেন।[৫১] হাওড়া রেলস্টেশনে আনুষ্ঠানিকতার পর ফেরত সৈনিকদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাদের সনাতন হিন্দু পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা দেয়া হয়। রণদার দৈবক্রমে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে শিশিরপ্রসাদ সর্বাধিকারী বলেছিলেন, 'হাসিম বে রণদার ভালো করার জন্যই এ রকম করলেন

(রণদা প্রসাদকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাগদাদে রেখে দেয়া)। কেননা বাগদাদ থেকে যাওয়ার কারণে রণদাপ্রসাদ দেড় মাস পরে ভারতে চলে যেতে পেরেছিলেন।'[৫২]

রণদার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন কিং ১৯১৬ সালের ১৭ জুলাই বাগদাদ ছেড়ে সামারা চলে যান।[৫৩] যাওয়ার আগে ২৭ জুনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাসহ রণদাপ্রসাদ সম্পর্কে সার্ভিস বইয়ে নিচের মন্তব্যটি লিখে যান,

> R.P. Saha has worked under me now about for 6 months first in Kut No 57 Indian stationary Hospital and later in Baghdad when he was prisoner looking after our sick and wounded. He was not only work-hard and willingly but has shown ability in learning general medical work such as surgical dressing, looking after the medical cases etc. This work was conscientiously done so that he was one of the very few men (BAC men accepted) I could trust to do dressing, when my back was tired. He has shown courage and initiative in procuring green vegetables for our men from areas exposed to the enemy's fire. On the occasion of a magazine explosion near the hospital he remained cool and worked hard being one of the last to leave the hospital. He has given me the every satisfaction and I have pleasure in giving him this certificate.[৫৪]

রণদাপ্রসাদ সাহার বীরত্ব, সাহস ও মূল্যবান সেবায় মুগ্ধ হয়ে মেসোপটেমিয়ার উচ্চ সামরিক কর্মচারীরা বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ডা. সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে জানায় যে, বাংলায় যদি রণদাপ্রসাদের ন্যায় আরও বীরযুবক থাকেন, তবে আমরা নিঃসংকোচে এবং সাদরে তাদেরকে গ্রহণ করব। রণদা বন্দি থাকা অবস্থাতেও অন্যদের উপকার বা সাহায্যেও সবসময়ই সবার থেকে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর সহযোদ্ধা ফকির চন্দ্র চক্রবর্তী এ সম্পর্কে বলেন,

> If it was to be a case of burying the dead under fire or removing the wounded from the line of fire or putting a convoy of wounded to bed in hospital and giving them first aid Ranada was second to none and was often the leading spirit.[৫৫]

টেসিফোনের যুদ্ধে রণদাপ্রসাদ সাহার অনেক অবদান ছিল। ১৯৫৬ সালের ২ অক্টোবর কলকাতায় রণদাকে ৪৯তম বেঙ্গলি রেজিমেন্ট এবং অ্যাম্বুলেন্স কোরের প্রাক্তন সৈনিকরা সংবর্ধনা দেন। সেখানে তারা তাদের সহযোদ্ধা রণদার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন,

> For natural instinct to serve humanity urged you to join the First World War and attached to General Thousands Brigade in the seige of Kut-el-Amara, you displayed superb tact in acts of great heroism when other fumbled.[৫৬]

রণদা ১৯১৬ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কলকতা ফেরত আসেন। এদিন রাতেই তিনি নবগঠিত বাঙালি পল্টনে যোগ দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।[৫৭] ২৬ সেপ্টেম্বর রাতেই বাঙালি পল্টনের চতুর্থ ব্যাচের ৪০ জন রিক্রুট নওশেরায় রওনা দেয়, রণদা তাদের রেলষ্টেশনে বিদায় জানান।[৫৮] রণদার পরবর্তী সৈনিকজীবন বোঝার জন্য নিচে বাঙালি পল্টন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হলো।

বাঙালি পল্টন

১৯১৫ সালে স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে আধাসামরিক বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন ও যুদ্ধে তাদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য বাঙালি নেতৃবৃন্দ ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে যোদ্ধা হিসেবে বাঙালিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে নতুন করে আবেদন করেন।[৫৯] তারা মনে করতেন যে, বাঙালি তরুণরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে এবং তারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে। পাশাপাশি সেনাবাহিনীতে যোগদানের ফলে বাঙালিদের জন্য জীবিকার নতুন পথ খুলবে এবং বাংলায় বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে।

১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ মাহতাব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনে বক্তব্যদানকালে বাঙালি পল্টন তথা বেঙ্গলি রেজিমেন্ট গঠনের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন,

> আমাদের সামনে থাকা বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের চমৎকার উদাহরণকে পুঁজি করে আমি মনে করি ভাইসরয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর লর্ড চেম্‌সফোর্ডের সাথে দেখা করে বাঙালি পল্টন গঠনের আবেদন করা অথবা ব্রিটিশ অফিসারদের অধীন বাঙালিদের ভলান্টিয়ার কোর চালু করার জন্য আমাদের সমিতির একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা যথেষ্ট যৌক্তিক হবে। আমি দেখতে চাই যে, বাংলা ভারতের অন্যান্য অংশের মত সাম্রাজ্য রক্ষায় অংশগ্রহণ করছে, যে সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে আমরা গঠিত।[৬০]

বাঙালি পল্টন গঠনের আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বেসরকারি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির নাম দেওয়া হয় 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমিটি'।[৬১] মিত্রবাহিনীর সৈনিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৬ সালের ৭ আগস্ট বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সমাপনী বক্তব্যে বাঙালি পল্টন গঠন সম্পর্কে নিচের ঘোষণাটি দেন:

> ভাইসরয় প্রধান সেনাপতি এবং সরকারের অন্য সদস্যদের নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ভারতীয় বাহিনীতে সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তানুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে বাঙালিদের নিয়ে একটি ডবল কোম্পানি গঠন করা হবে। ডবল কোম্পানি গঠন হয়ে গেলে তারা ফ্রন্টিয়ারে প্রশিক্ষণের জন্য যাবে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ শেষে তাদের লড়াই-এর ময়দানে পাঠানো হবে।[৬২]

বাঙালি পল্টন গঠন ছিল একটি নতুন প্রক্রিয়া। যেহেতু বাঙালিদের নিয়ে ইতোপূর্বে কোনো পল্টন গঠন করা হয়নি।[৬৩] এ সময় সৈনিকজীবনের প্রতি বাঙালির প্রবলভীতি ছিল এবং অভিভাবকেরা মনে করতেন যে, তার সন্তান যুদ্ধে গেলে জীবন নিয়ে আর ফিরে আসতে পারবে না। রণদাপ্রসাদ ছিলেন মাতৃহীন, ঘরছাড়া এক যুবক। একই সাথে তিনি ছিলেন ভীষণ সাহসী। তাই বাঙালি পল্টনে যোগদানের ক্ষেত্রে রণদাপ্রসাদের তীব্র আগ্রহ লক্ষ করা যায়।[৬৪]

১৯১৬ সালের ৭ আগস্ট বাঙালি পল্টন গঠনের সরকারি ঘোষণা হয় এবং ২২৮ জনের বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি গঠন করা হয়।[৬৫] ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে ডাবল কোম্পানিকে ব্যাটালিয়নে উন্নীত করা হয়। পল্টনের নামকরণ করা হয় ৪৯তম বেঙ্গলি রেজিমেন্ট।[৬৬] জুলাই মাসের শেষ দিকে ৪৯তম বেঙ্গলি রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হয়। ব্যাটালিয়ন বসরা হয়ে ১৯১৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বাগদাদ পৌঁছে। বাঙালি পল্টন বাগদাদে বিভিন্ন স্থাপনার প্রতিরক্ষাসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে।[৬৭] প্রায় ৬ হাজার বাঙালি সৈনিক ৪৯তম বেঙ্গলি রেজিমেন্টে যোগদান করে।[৬৮] বাঙালি পল্টনে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ, শৈলেন্দ্র নাথ বসু, দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহা, মাহাবুব উল আলম প্রমুখ। বাঙালি পল্টন গঠনের জন্য বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ মাহতাব এবং ডা. এসকে মল্লিক মূল ভূমিকা পালন করেন।[৬৯] ১৯২০ সালের ৩০ আগস্ট বাঙালি পল্টন ভেঙে যায়।[৭০]

১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের যুদ্ধফেরত সাতজনের মধ্যে তিনজন সৈনিক বাঙালি পল্টনে যোগ দেয়। ধারণা করা যায় যে, রণদাপ্রসাদ সাহা তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।[৭১] রণদাপ্রসাদা সাহা এ সময়ে ল্যান্সনায়েক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। রণদা ১৯১৭ সালের ২৫ আগস্ট জমাদার হিসেবে পদোন্নতি পান।[৭২] ১৯১৭ সালের ২৫ আগস্টের *দি হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, হাবিলদার রণদা এবং অপর দু'জন বাঙালি সৈনিক পুনেতে অবস্থিত সেন্ট্রাল ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও বেয়োনেট ফাইটিং স্কুল থেকে সম্মানের সাথে প্রশিক্ষণ শেষ করেন। ১৯১৭ সালের ২ জুলাই বাঙালি পল্টনে যোগ দেয়া সৈনিক মাহবুব উল আলম উল্লেখ করেন যে, তিনি করাচিতে কিছুসংখ্যক অবাঙালি প্রশিক্ষকের সাথে

হাবিলদার রণদাকে প্রশিক্ষক হিসেবে পান।[৭৩]

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে বেঙ্গলী ডাবল কোম্পানিকে ব্যাটালিয়নে রূপান্তরিত করা হয়।[৭৪] প্রথম দিকে এদের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আর ডি ই ডায়েল এবং জমাদার শরৎ কুমার রায়। পরবর্তীকালে শরৎ কুমার রায় কলকাতা ডিপোতে বদলি হয়ে চলে গেলে রণদাপ্রসাদ সাহা তার স্থলাভিষিক্ত হন।[৭৫]

বাঙালি পল্টনে করাচি ডিপো থেকে ১৯১৮ সালের ২৩ জানুয়ারি লে. ডি জে উইল্‌কস ও হাবিলদার মেজর রণদাপ্রসাদ সাহার নেতৃত্বে দুজন এনসিও এবং ৩৬ জন সৈনিকের একটি প্রশিক্ষিত দল বাংলায় আসে।[৭৬] এ সময় রণদার পদবি হাবিলদার মেজর উল্লেখ করা হলেও তিনি ১৯১৭ সালের ২৫ আগস্ট জমাদার পদে পদোন্নতি পান। দাফতরিক প্রক্রিয়া শেষ করে ১৯১৮ সালে তাঁর পদোন্নতির ঘোষণা দেয়া হয়।[৭৭] ২৩ জানুয়ারি কলকাতা আসার পর রণদা প্রসাদের দল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে অবস্থান করেন। ২৬ জানুয়ারি রণদার নেতৃত্বে বাঙালি সৈনিকরা কলকাতার বিভিন্ন সড়কে রাইফেল নিয়ে কুচকাওয়াজ করেন।[৭৮] ৮ ফেব্রুয়ারি পূর্বঘোষণা অনুযায়ী বাঙালি পল্টন দল সকাল থেকেই কলকাতা শহরের দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রা শুরু করে। এরপর তারা খিদিরপুর ব্রিজ, ডেন্ট মিশন রোড, মোমিনপুর রোড, আলীপুর, চাতলাপুর হাট, কালীঘাট হয়ে কালীঘাট স্কয়ারে পৌঁছে। রণদার দল কালীঘাট স্কয়ারে একটি বিশাল জনসভায় অংশ নেয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি রণদা তাঁর দল নিয়ে কৃষ্ণনগরে সামরিক নৈপুণ্য দেখান এবং জনসভা করেন।[৭৯] রণদা ১৩ মার্চ পাইক পাড়া রাজবাড়িতে রিক্রুটিং জনসভায় বক্তব্য রাখেন।[৮০] এভাবে রণদার নেতৃত্বে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় সামরিক কসরত ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রণদাপ্রসাদের দল তাদের রিক্রুটমেন্ট দায়িত্ব শেষে এপ্রিল মাসে করাচি ফেরত যায়।

১৯১৯ সালের জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের আমন্ত্রণে 'পিস সেলিব্রেশন'-এ অংশ নেয়ার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মিত্রপক্ষের সব ইউনিটের প্রতিনিধিরা লন্ডনে সম্মিলিত হন।[৮১] সম্রাট ৪৯তম বেঙ্গলি রেজিমেন্ট থেকে তিনজন প্রতিনিধিকে পিস সেলিব্রেশনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ২৫ জুন বাঙালি পল্টনের করাচি ডিপোতে পিস সেলিব্রেশনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এদিন ডিপোর সব সৈনিককে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করানো হয় এবং ডিপোর অফিসার কমান্ডিং এবং করাচি ব্রিগেডের স্টাফ অফিসাররা সবাইকে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তারা অফিসার হিসেবে জমাদার আরপি সাহা, এনসিও হিসেবে হাবিলদার মোহিত কুমার মুন্সী এবং সিপাই (রণদার অর্ডারলি) হিসেবে নিত্যগোপাল ভট্টাচার্যকে নির্বাচিত করেন।[৮২] রণদার নির্বাচন বিষয়ে তাঁর সৈনিক বন্ধুরা উল্লেখ করেন–

> On the conclusion of the First World War, you (Ranoda) were rightly selected to represent the 49th Bangalis along with a N.C.O and a soldier in the peace Celebration.[৮৩]

১৯১৯ সালের ২৯ জুন বাঙালি পল্টন দলসহ ভারতবর্ষে অবস্থিত ব্রিটিশ, ভারতীয় এবং নেটিভ স্টেটের বিভিন্ন রেজিমেন্ট থেকে ৬০০ জন প্রতিনিধি পিস সেলিব্রেশনে অংশগ্রহণের জন্য ইংল্যান্ড অভিমুখে রওনা হয়। ভারতীয় দল ২৭ জুলাই লন্ডন পৌঁছে এবং ২ আগস্ট একটি পৃথক মার্চপাস্টে অংশগ্রহণ করেন। লন্ডন হেমিংটন কোর্ট-এ রণদাপ্রসাদ সাহা ভারতীয় অফিসার ক্যাম্পে থাকতেন।

রণদা লন্ডন থেকে ডা. এস. কে মল্লিককে একটি চিঠি লেখেন।[৮৪] এই চিঠিতে রণদাপ্রসাদ সাহা তাদের দেরিতে লন্ডন পৌঁছানো, বিজয় অনুষ্ঠান এবং আরও কিছু তথ্য বর্ণনা করেন। তিনি ১৮ আগস্ট গ্লাসগো যান এবং ২২ আগস্ট লন্ডন ফেরত আসেন।[৮৫] লন্ডনে রণদার অর্থ সংকট দেখা দেয়। তিনি এ সময় ফেরত দেয়ার শর্তে কন্টিনজেন্ট থেকে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করেন।[৮৬] এরপর হাবিলদার মুন্সী করাচি অভিমুখে যাত্রা করেন এবং জমাদার রণদা অর্ডারলি সিপাই নিত্যগোপাল আরও কিছুদিন পর ভারতে ফিরে আসেন।

১৯২০ সালের ৩০ আগস্ট বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। রণদাপ্রসাদ সাহা পল্টন থেকে কলকাতা ফেরত আসেন। সৈনিকজীবন শেষ হলেও সেনাবাহিনীর সাথে তাঁর সম্পর্ক সবসময় থেকে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক প্রাক্তন সৈনিক নতুন করে সেনাবাহিনীতে সংরক্ষিত জনবল হিসেবে যোগ দেন। রণদাপ্রসাদও সেনাবাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত হন এবং সরকারকে বিভিন্নভাবে দুর্যোগকালে সহায়তা করেন।[৮৭] যুদ্ধকালীন সময়ে অসুস্থ ও আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য তিনি রেডক্রস ফান্ডে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করেন। ১৯৫২ সালে বাঙালি পল্টনের প্রাক্তন সৈনিকরা করাচি সেনানিবাসে একটি পুনর্মিলনী সভার আয়োজন করেন, রণদা সেই সভায় অংশ গ্রহণ করেন।[৮৮] ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত সামরিক হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৯] এভাবেই তিনি আমৃত্যু সেনাবাহিনীর সাথে সংযোগ বজায় রেখেছিলেন। রণদাপ্রসাদ আধুনিক সেনাবাহিনীতে বাঙালি জাতির প্রথম প্রজন্ম। এ সময় বাঙালি জাতির কোনো সামরিক ঐতিহ্য ছিল না। বলা যায়, রণদাপ্রসাদ সাহা ও তাঁর দলই এই ঐতিহ্যের সূচনা করেন।

তথ্যসূত্র

১. শ্রী খগেন্দ্র নাথ ভৌমিক, *পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস*, (মিত্রলোক, কলিকাতা ১৩৮৯) পৃ.৩৮
২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত) *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, (সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৮৪) পৃ. ৬৮৬
৩. *ঐ*, পৃ. ৪৩৮।
৪. শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন (সম্পা.), *চরিতাভিধান*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫) পৃ. ২২৫
৫. সৈকত আসগর, 'রণদা প্রসাদ সাহা: জীবন ও কীর্তি', মুহাম্মদ সায়ীদুল হক (সম্পা.), *সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের ইতিহাস*, (ইতিহাস প্রকল্প, সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ ১৯৮৯) পৃ.৩১৬
৬. *ঐ*
৭. ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও রেজাউল করিম (সম্পা.), *বাংলাদেশের কয়েকজন শিল্পোদ্যোগীর জীবন কাহিনী*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৪) পৃ. ১
৮. *সাক্ষাৎকার*, জয়াপতি, রণদাপ্রসাদ সাহার কণিষ্ঠ কন্যা ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং পরিচালক, ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর ও কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট লি.; সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। তারিখ: ৩ নভেম্বর, ২০১৫।
৯. *ঐ*
১০. হেনা সুলতানা, *রণদাপ্রসাদ সাহার জীবন কথা*, (বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা ২০১২) পৃ. ১৮।
১১. *ঐ*, পৃ. ১৯।
১২. *সাক্ষাৎকার*, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, একুশে পদকপ্রাপ্ত ভাষা সৈনিক ও পরিচালক, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট লি.; সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। তারিখ: ১২ মার্চ, ২০১৯।
১৩. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
১৪. মোঃ লুৎফর রহমান (সম্পা.), *টাংগাইল জেলার কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের জীবন ও কর্ম*, (ছায়ানীড়, ঢাকা, ২০০৭) পৃ. ২৩
১৫. প্রতিভা মুৎসুদ্দি, *পূর্বোক্ত*
১৬. *ঐ*
১৭. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
১৮. *ঐ।*
১৯. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *বাঙালি পল্টন, ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি রেজিমেন্ট*, (প্রথমা, ঢাকা, ২০১২) পৃ. ২৭
২০. *ঐ*
২১. *ঐ*, পৃ. ২৮
২২. *ঐ*
২৩. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
২৪. *ঐ*
২৫. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০
২৬. *ঐ*
২৭. *ঐ*
২৮. প্রতিভা মুৎসুদ্দি, *পূর্বোক্ত*

২৯. *ঐ*
৩০. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩১
৩১. *ঐ*
৩২. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
৩৩. *ঐ*
৩৪. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২
৩৫. প্রতিভা মুৎসুদ্দি, *পূর্বোক্ত*
৩৬. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
৩৭. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, 'সৈনিক রণদাপ্রসাদ সাহা', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.), *রণদাপ্রসাদ সাহা স্মারক গ্রন্থ*, (সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০১৩) পৃ. ১৯৫
৩৮. *ঐ*
৩৯. *ঐ*, পৃ. ১৯৬
৪০. প্রতিভা মুৎসুদ্দি, *পূর্বোক্ত*
৪১. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, 'সৈনিক রণদা প্রসাদ সাহা', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৭
৪২. *ঐ*
৪৩. *ঐ*
৪৪. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
৪৫. *ঐ*
৪৬. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, 'সৈনিক রণদা প্রসাদ সাহা', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৮
৪৭. *ঐ*
৪৮. প্রতিভা মুৎসুদ্দি, *পূর্বোক্ত*
৪৯. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
৫০. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, 'সৈনিক রণদা প্রসাদ সাহা', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৯
৫১. *ঐ*
৫২. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, 'সৈনিক রণদা প্রসাদ সাহা', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৯
৫৩. *সাক্ষাৎকার*, ডা. বিষ্ণুপতি, (জামাতা, রণদাপ্রসাদ সাহা)। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: মির্জাপুর কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল; তারিখ: ৩ নভেম্বর, ২০১৫
৫৪. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, 'সৈনিক রণদাপ্রসাদ সাহা', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০০
৫৫. *ঐ*
৫৬. *ঐ*
৫৭. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
৫৮. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০১
৫৯. প্রতিভা মুৎসুদ্দি, *পূর্বোক্ত*
৬০. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২
৬১. *ঐ*, পৃ. ৪৪
৬২. *ঐ*, পৃ. ৪৫
৬৩. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
৬৪. *ঐ*

৬৫. প্রতিভা মুৎসুদ্দি, *পূর্বোক্ত*
৬৬. হেনা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*
৬৭. *ঐ*
৬৮. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০১
৬৯. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
৭০. *ঐ*
৭১. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০১
৭২. *ঐ*, পৃ. ২০২
৭৩. *ঐ*
৭৪. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
৭৫. *ঐ*
৭৬. *ঐ*
৭৭. *ঐ*
৭৮. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৩
৭৯. *ঐ*
৮০. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*। *সাক্ষাৎকার*, হেনা সাহা, সাবেক পরিচালক, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও অধ্যক্ষ, ভারতেশ্বরী হোমস্, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল; সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: মির্জাপুর কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। তারিখ: ২৯ মার্চ, ২০১৭।
৮১. *ঐ*
৮২. *ঐ*
৮৩. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৪
৮৪. জয়াপতি, *পূর্বোক্ত*
৮৫. *ঐ*
৮৬. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৪
৮৭. প্রতিভা মুৎসুদ্দি, *পূর্বোক্ত*
৮৮. *ঐ*
৮৯. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৫

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

পূর্ববাংলার সাংগঠনিক রাজনীতি ও যুবসমাজ: ১৯৪৭-৫৭

ড. তাহমিনা খান

সারসংক্ষেপ: ঐতিহাসিক, রাজনৈতি ভৌগোলিক আশীর্বাদে সুলতানী আমল থেকেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি-নির্ভর বাঙালি জাতির সমৃদ্ধি যে স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টি করেছিল, বিদেশি শাসন-শোষণের প্রভাবে তার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয় এবং ১৯৪৭ সালে জন্মলাভ করা পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলার পূর্বাংশ পরিণত হয় একটি নব্য উপনিবেশে। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশবলে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও সার্বিক স্বার্থ ক্রমবর্ধমানভাবে উপেক্ষিত হয়। কাজেই পূর্ববাংলা পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানায় এবং বিশেষত যুবসমাজের সক্রিয় তৎপরতায় তা রাজনৈতিকভাবে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন জনবিক্ষোভকে যৌক্তিক রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয় জনগণ। সেক্ষেত্রে সাংগঠনিক রাজনীতির দিক থেকে অবাঙালি নেতৃত্বের অগণতান্ত্রিক ও অনুদারনীতির শিকার হয়ে স্বতন্ত্র পথে সরকারবিরোধী ক্ষোভ প্রকাশে অগ্রসর হয় তারা। সুসংহত বিরোধী দল ও রাজনৈতিক মেরুকরণের ফলস্বরূপ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন যে উদাহরণ সৃষ্টি করে, তা হলো– শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে রাজনীতিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও তার সফলতা। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো মৌলিক ভূমিকা পালন করলেও প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যুবসমাজ। তবে রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে ১৯৪৭-৫৭ পর্বের মূল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে 'একটি পরিবর্তন ও অনিশ্চয়তার কাল' হিসেবে। পরবর্তী দশকে এই বিবর্তন পরিণতি লাভ করে বিপ্লবে।

রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বাংলাদেশের চিরায়ত ঐতিহ্য। এ অঞ্চলের জনপদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় ঐতিহাসিক অভিমত এই যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি-নির্ভর একটি অসাম্প্রদায়িক ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পন্ন জাতিসত্তা গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ এ অঞ্চলে সবসময়ই ছিল, যার সদ্ব্যবহার দ্বারা সুলতানী আমলে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক আশীর্বাদে বাঙালি হয়ে ওঠে একটি সমৃদ্ধ জাতি। সেই ধারাবাহিকতায় আধুনিককালে এই জাতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন লাভ করতে পারত এবং এই ভূখণ্ডে জন্ম নিতে পারত একটি সম্ভাবনাময় বৃহৎ রাষ্ট্র। কিন্তু বিদেশি শাসন-শোষণের প্রভাবে সেই ধারাটি স্বাভাবিক পথ হারিয়ে ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়।

***অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল।**

ব্রিটিশ শাসনামলে এই ভিন্নতা যেমন ব্যাপক, তেমনি মারাত্মক আকার ধারণ করে। ব্রিটিশশাসকদের 'ভাগকর এবং শাসন কর' নীতির প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি হয় ব্যাপকভাবে, যার চরমরূপ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯১১ সালে তা রদের ঘটনা। অতঃপর হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালি নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেও বাঙালি জাতির মধ্যে সংহতি ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি; ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অসহযোগ খিলাফত আন্দোলনের ঢেউ, ১৯২৩ সালের বাংলা চুক্তি এবং ১৯৩৭ ও ১৯৪১ সালে এ.কে ফজলুল হক কর্তৃক দুবার মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্যদিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বাঙালি জাতিসত্তার প্রতি সংহতি ঘোষণা করেন। চূড়ান্ত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় ১৯৪৭ সালে প্রস্তাবিত সোহরাওয়ার্দী-শরৎবসুর 'অখণ্ড স্বাধীনবাংলা রাষ্ট্র' গঠনের উদ্যোগের মধ্যে। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ারে সে প্রচেষ্টাও ভেসে যায়। ১৯৪৭ সালে জন্ম লাভ করে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান।

ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ববাংলার জনগণ ক্ষমতার নানামুখী অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহারের ফলে যে পরাধীনতাপাশে আবদ্ধ ছিল, পাকিস্তানে তার সমাপ্তি ঘটেনি, বরং তা অব্যাহত ছিল, অধিকতর সক্রিয়ভাবে। বস্তুত, ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাকিস্তানের যে শাখার জনগণের মুক্তি এনেছিল, তারা ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসক শ্রেণি।[১] পূর্ববাংলার জনগণ বরং স্বাধীনতার ফল থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিনিয়ত অনুভব করেছে যে, এই অর্জন তাদের জন্য এক বিদেশি প্রভুর আসনে অন্যজন মাত্র। পাকিস্তান গণপরিষদ বিতর্কে ১৯৪৮ সালেই এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহর বক্তব্যে– 'A feeling is growing among the Eastern Pakistanis that Eastern Pakistan is being neglected and treated merely as a 'colony' of west Pakistan.'[২] গবেষক ও বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে পূর্ববাংলার ওপর আরোপিত হয়েছিল "Internal neocolonialism"।[৩]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশের শাসন বিভাগ ও আইনসভা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকলেও পাকিস্তানের শুরুতেই কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হয় এবং প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। পাকিস্তানের বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমে খাজা নাজিমুদ্দীন ও পরে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও তাদের নেতৃত্ব পূর্ববাংলার পক্ষে সুখকর হয়নি। তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ কেবল মুসলিম লীগ থেকে নিয়োগ লাভ করায় পূর্ববাংলার রাজনীতিকে কেন্দ্রীয় রাজনীতি থেকে পৃথক করা যেত না।[৪]

এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলার যাবতীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য বহুবিধ প্রবেশপথ তৈরি করেছিল, বিশেষত প্রাদেশিক গভর্নরগণ সব সময় কেন্দ্রের মুখপাত্র

হিসেবে কাজ করেছে, কেন্দ্রের কাছে প্রদেশের মুখপাত্র হিসেবে নয়।[৫] এমনকি প্রাদেশিক-পরিষদের গঠন, দায়িত্ব বণ্টন ও কার্যকাল বিষয়েও গভর্নরের ওপর গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ ছিল। কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ উচ্চমাত্রায় পৌঁছায় The Pakistan Provisional Constitution (Third Amendment) Order, 1948-এর মাধ্যমে, যা Pakistan (Provisional Constitution) Order, 1947-এ গৃহীত ১৯৩৫ সালের আইনের ৯২ ধারা সংশোধন করে তৃতীয় অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সন্নিবেশ করে ৯২ক ধারা। এতে বলা হয়–

> If at any time the Governor General is satisfied that a grave emergency exists whereby the place or security of Pakistan or any part there of is threatened, or that a situation has arisen in which the Government of a Province cannot be carried on in accordance with the provisions of this Act, he may by proclamation direct the Governor of a province to assume on behalf of the Governor General all or any of the powers vested in or exercisable by any provincial body or authority, ...[৬]

এই আদেশ বলে কেন্দ্রীয় সরকার অবাধে পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক প্রশাসনকে বাধাগ্রস্ত করেছে, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থকে ক্রমবর্ধমানভাবে উপেক্ষা করেছে এবং নানা অজুহাতে গভর্নরের শাসন জারি করেছে। ১৯৪৯ সালে PRODA (Public and Representative Offices (Disqualification) Act) জারি করে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের পরোক্ষভাবে পরাধীন করে কেন্দ্রের অনুগত থাকতে বাধ্য করা হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করা হয়, যে আমলাদের অধিকাংশই ছিল অবাঙালি। ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার সচিবালয়ে একজনও বাঙালি সচিব ছিলেন না।[৭] কাজেই পূর্ববাংলার স্বার্থ বিবেচনার অনুকূলে ছিল না প্রাদেশিক প্রশাসন।

সামরিক বাহিনীতেও বিভিন্ন পদে পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল হতাশাব্যঞ্জক[৮]

পদ	পশ্চিম-পাকিস্তান	পূর্ব-পাকিস্তান
জেনারেল	১	০
লে. জেনারেল	৩	০
মেজর জেনারেল	২০	১
ব্রিগেডিয়ার	৩৫	০
কর্নেল	৫০	০
লে. কর্নেল	১৯৮	২
মেজর	৫৯০	১০

ঔপনিবেশিকতা প্রবর্তনের সাক্ষ্য সরকারের রাজস্ব, বাণিজ্য ও উন্নয়ন নীতিমালায়ও ছিল, যা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, যার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৭-১৯৫৩ সময়ে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য চিত্র থেকে। দেশ বিভাগের পরপরই (১৯৪৭) পশ্চিম-পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল ২৫ টাকা বেশি এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে তা ৭১ টাকায় পৌঁছে:

১৯৪৯-৫৫ সময়ে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে মাথা পিছু আয়ের বৈষম্য[৯]

সাল	পূর্ববাংলা	পশ্চিম-পাকিস্তান	বৈষম্য
১৯৪৯-৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩
১৯৫৪-৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১

১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলায় যেখানে ব্যয় করেছে ৪২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, সেখানে পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। এসময় বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা পূর্ববাংলায় যার অংশ ছিল মাত্র ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।[১০] তাছাড়া সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি যে স্বল্পসংখ্যক পরিবারের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করেছিল, তাদের কেউই পূর্ববাংলার ছিল না।[১১] কাজেই পূর্ববাংলার জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের ঔপনিবেশিক কায়দার সার্বিক অবহেলা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই শাসনতন্ত্রে অধিকার সংরক্ষণের জন্য পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য অব্যাহত দাবি জানায়। ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে বাঙালিদের মনে যে সরকারবিরোধী ক্ষোভের সঞ্চার হয়, তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বক্তৃতা বিবৃতির মধ্য দিয়েও প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত সফল ভাষা-আন্দোলন পূর্ববাংলার দাবি ও জনবিক্ষোভকে যৌক্তিক রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রতি পদক্ষেপে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয় পূর্ববাংলার জনগণ।

উল্লেখ্য যে, স্বাধীন রাষ্ট্রের সূচনাকালে পাকিস্তান অর্জনে মুসলিম লীগের একক রাজনৈতিক প্রাধান্যের স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্রের ক্ষমতায়নে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে পরোক্ষ নির্বাচনের বন্দোবস্ত গৃহীত হয়। 'Provincial Legislative Assembly Order, 1947' অনুসারে ১৯৪৬ সালের অবিভক্ত বাংলার আইন-পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ থেকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যে পরিণত হন। কাজেই পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯৫২ সালে।[১২] অথচ তা ১৯৫৩ সালে নির্ধারণ করা হয় এই যুক্তিতে যে, উক্ত পরিষদের

প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৮ সালের মার্চে। এজন্য কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬১(২)নং ধারা সংশোধন করে নেয়।[১৩]

নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্বের জন্য এই অজুহাত সৃষ্টি ছিল মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতার পরিচায়ক। লীগের অবাঙালি নেতৃত্বের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য পূর্ববাংলার জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে সুপরিকল্পিতভাবেই এই দুর্বলতা সৃষ্টি করা হয়। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম লীগের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কৌশলে কার্যত নিষ্ক্রিয় খাজা নাজিমুদ্দীনকে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। আর লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হককে সংগঠন থেকে পূর্বেই বহিষ্কার করা হয়েছিল।[১৪] কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের ষড়যন্ত্রে আরও উপেক্ষিত হয়েছিলেন সংগঠনের সর্বাধিক উদ্যমী এবং প্রগতিশীল অংশের নেতারূপে খ্যাত আবুল হাশিম, শামসুল হক (টাঙ্গাইল) প্রমুখ।

উপরন্তু, বাংলার লীগ নেতাদের মধ্যে চূড়ান্ত বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাকিস্তান-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও সংগ্রামী অংশ বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিল ভেঙে দেয়া হয় এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অন্য প্রদেশে পরিবর্তন না ঘটালেও কেবল পূর্ববাংলায়ই গঠন করা হয় 'পকেট লীগ', সেই সাথে সাধারণ জনগণের জন্য এই দলের সদস্যপদ লাভের পথ সুকৌশলে বন্ধ করা হয়।[১৫] ফলে জনমতের প্রতি দায়বদ্ধতার নীতি উপেক্ষা করে চলা মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষে শাসন-শোষণ এবং অগণতান্ত্রিক ও অনুদার নীতি অবলম্বনপূর্বক পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে রাখা সহজ হয়।

এমতাবস্থায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই মুসলিম লীগের প্রগতিশীল বাঙালি নেতা-কর্মীদের আত্মোপলব্ধি ঘটে এবং প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ কার্যত এদের সমর্থন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অচিরেই ক্ষমতাসীন চক্রের বাঙালিভীতি কার্যে পরিণত হয় উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত পাঁচটি মুসলিম আসনের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীগণ অনায়াসে নির্বাচিত হলেও[১৬] ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে লীগের সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার যে উপনির্বাচনে মওলানা ভাসানী জয়লাভ করেন, তা বাতিল ঘোষণা করা হয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নীর আনীত কারচুপির অভিযোগের প্রেক্ষিতে। সেই সাথে ভাসানী ও পন্নীকে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ঐ আসনে ১৯৪৯ সালে

পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পন্নীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে তাকেই মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়।[১৭] ইতোমধ্যে মওলানা ভাসানী সরকারবিরোধী রাজনীতির প্রবক্তা হয়ে ওঠায় এবং পূর্ববাংলায় তার জনপ্রিয়তার দৃঢ় অবস্থান দৃষ্টে বিজয় সুনিশ্চিত বুঝতে পেরেই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেয়া হয়নি। ভাসানী তখন জমিদারের বিপরীতে কৃষকসন্তান প্রগতিপন্থি তরুণ নেতা শামসুল হককে প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দেন। এসময় প্রগতিপন্থিদের কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছিল না। কেবল সমমনা কর্মীদের সমর্থন, সহযোগিতা ও ব্যাপক প্রচার জনমনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এক জোয়ার সৃষ্টি করেছিল, যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের বিপরীতে স্বল্পসময়ের ব্যবধানে দলটির গণবিচ্ছিন্ন ও একক আধিপত্যবাদী নীতির চিত্রটি সফলভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফল স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ মুসলিম লীগের ছয় মন্ত্রীর ঘনঘন নির্বাচনী এলাকা সফর, দশ হাজার মন চাউল বিতরণ, অজস্র অর্থ ব্যয় সব নিরর্থক করে দিয়ে শামসুল হকই জয়লাভ করেন।[১৮] এরপর উপনির্বাচনের তারিখ পূর্ব-ঘোষিত থাকায় একটি সংখ্যালঘু আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও গণতান্ত্রিক রীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে[১৯] পূর্ববাংলা প্রাদেশিক সরকার আইন পরিষদের শূন্য আসনগুলোতে উপনির্বাচন বন্ধ রাখে। কারণ, ক্ষমতাসীনদের উপলব্ধি ঘটেছিল যে, জনসমর্থন তাদের বিপক্ষে, কাজেই যেকোনো নির্বাচনের পরিণতি টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের অনুরূপ হবে।

পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে সরকারবিরোধী ক্ষোভ উত্তরোত্তর যেভাবে বেড়েই চলছিল, সেক্ষেত্রে উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়[২০] তার বহিঃপ্রকাশ ছিল অবশ্যম্ভাবী। অতএব আগস্ট, ১৯৫৩ পর্যন্ত পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদের ১৭১টি আসনের মধ্যে ৩৪টি শূন্য থাকলেও[২১] আর কোনো উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। উপরন্তু পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে তা স্থগিত রেখে নূরুল আমীন সরকারের অনুরোধক্রমে পাকিস্তান গণপরিষদ পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের মেয়াদ আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করে The East Bengal Legislative Assembly (Continuation) Act, 1953 পাশ করার মাধ্যমে।[২২] অতঃপর পূর্ববাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের মার্চে। বস্তুত, পূর্ববাংলার রাজনীতির দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ায় মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও অভিযোগের মাত্রা ক্রমশ উচ্চহারে জনসমর্থন লাভ করে এমন স্তরে পৌঁছায় যে, ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত শাসন পরিচালনার সর্বস্তরে ক্ষমতাসীন থেকেও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ শঙ্কিত হয়ে পড়ে নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারস্থ হতে।

প্রসঙ্গত, পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেন্দ্র-প্রদেশ শৃংখলে পূর্ববাংলা ছিল সর্বাপেক্ষা ভঙ্গুর অবস্থানে; এই প্রদেশের রাজনীতি চিহ্নিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বশ্যতাহীন বিরুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে, করাচীর প্রতি এর অধিবাসীদের অসন্তোষের তালিকা ছিল সুদীর্ঘ, যা শুরু হয় জিন্নাহ্ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার সাথে সাথে।[২৩] রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন পূর্ববাংলায় ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। অতঃপর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টবিরোধী-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি, অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তির প্রয়াস, সর্বস্তরে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অবলম্বিত সার্বিক বৈষম্যচিত্র পূর্ববাংলার রাজনৈতিক উন্নয়নে সমন্বিত শক্তি সঞ্চার করে। ফলে ভাষার দাবিতে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক-আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ নিয়ে বিস্ফোরিত হয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে। আর পূর্ববাংলার এই দৃঢ় প্রত্যয়ী রাজনৈতিক আঘাত কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে অবিশ্বাস ও তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি করলেও ভিত্তি রচনা করে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির সাফল্য-সোপানের। পরবর্তীকালে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে এই ঘটনার ফল স্বরূপ বাঙালি অর্জন করে ভাষাগত জাতীয়তাবাদ। কাজেই বলা যায় যে, পাকিস্তানের শুরু থেকেই মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববাংলার জনগণের আস্থা লাভে ব্যর্থ হয়েই ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার জন্য নির্বাচন বিলম্বিত করার নীতি গ্রহণ করে।

বলা বাহুল্য যে, এই ব্যর্থতার বিপরীতে খাজা নাজিমুদ্দীনের অধীনে গঠিত পূর্ববাংলার মন্ত্রিসভা জনপ্রিয় ছিল বলা যায়। কারণ তারা ছিল কেন্দ্রের আশীর্বাদপুষ্ট এবং প্রাদেশিক প্রশাসনে পাঞ্জাবি ও অবাঙালি অফিসারদের আধিক্য তাদের সমর্থন বৃদ্ধি করেছিল। তদুপরি প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধীপক্ষ ছিল পূর্ববাংলা কংগ্রেস দল; এই হিন্দু সংগঠনটি আবার বিভক্ত ছিল তিনটি উপদলে– গণসমিতি, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ও পাকিস্তান শিডিউল্ড কাষ্ট ফেডারেশন।[২৪] কাজেই বিকল্প সরকার গঠনে সক্ষম বিরোধী দলের হুমকি প্রায় ছিল না বলা যায়। অথচ এই নিশ্চিত অবস্থানের ভিত কাঁপিয়েই হুমকির লক্ষণ প্রকাশ করে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচন (১৯৪৯)। একই সাথে রাজনীতির এই দিকপরিবর্তন সাংগঠনিক রূপলাভ করে বিরোধী দল তথা 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' (জুন, ১৯৪৯) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

১৯৫২ সালের মধ্যেই আওয়ামী মুসলিম লীগ সুসংহত বিরোধী দল হিসেবে শক্তি ও সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়। এমনকি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বিনা উস্কানিতে রক্তপাত ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের বৈকালিক

অধিবেশনে মুসলিম লীগের ভাঙন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়, যখন কিছুসংখ্যক সদস্য (আওয়ামী মুসলিম লীগের সমর্থক) স্পিকারের কাছে পৃথক ব্লকে বসার দাবি উত্থাপন করেন এবং তা গৃহীত হয়।[২৫] এর ফলে পরিষদে আওয়ামী মুসলিম লীগের বিরোধী দলীয় মর্যাদা স্বীকৃত হয়।[২৬] ১৯৫৩ সালে কৃষক শ্রমিক পার্টি নামে ফজলুল হকের দলটি পুনরায় সংগঠিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে।[২৭] অবশেষে অন্যান্য ছোট দলের সমন্বয়ে পূর্ববাংলার রাজনীতির মেরুকরণে বিকল্প সরকার গঠনের হুমকি সরাসরি কার্যে পরিণত হয় ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে। সুতরাং উপনির্বাচন বন্ধ রেখে এবং সাধারণ নির্বাচন বিলম্বিত করে নব্য ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের আসন সুরক্ষিত ও নিরাপদ মনে করলেও মুসলিম লীগ সরকারের ভিত দুর্বল করে দেয় বিবর্তনের ধারায় বিরোধী দলীয় রাজনীতির উত্থান।

প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ববাংলায়ও মুসলিম লীগ, জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম চালু হয়। তবে এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ছিল নামমাত্র অস্তিত্ব সংবলিত। আর স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে অখণ্ড বাংলায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের নেতৃত্বেই অর্জিত হয় পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দলের নেতৃত্ব ও আচরণে যে মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটে তার ফলে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী অনেক সদস্য ক্ষুব্ধ হন। ক্ষুব্ধগোষ্ঠী বিরোধী প্লাটফরম গঠনের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যদিও দেশের পশ্চিম অংশে তা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। পূর্ববাংলায়ই সাংগঠনিক পর্যায়ে বিরোধী দলীয় রাজনীতির প্রকৃত উত্থান ঘটে,[২৮] আত্মপ্রকাশ করে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'।

রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগের সাথে নবপ্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের স্বাতন্ত্র্য ও উন্নত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৫৩ সালের ৮ মে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন–

> সর্বপ্রথম আমরা দল ও রাষ্ট্রকে একীভূত করণে বিশ্বাস করি না; ফ্যাসিবাদের পরিবর্তে বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে। অতঃপর আমরা বিশ্বাস করি যে, গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য বিরোধী দলের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। এটিই একমাত্র উপায় যা শাসককে নিয়ন্ত্রণে রাখে, কার্যকর রাখে এবং জনমতের প্রাধান্য সৃষ্টি করে। অন্যদিকে মুসলিম লীগের কাছে বিরোধী দলের পরিচিতি ধ্বংসাত্মক হিসেবে, তারা চায় অন্য কোন দল যেন না থাকে এবং অন্যসব দলের অস্তিত্বকে অবশ্যই নিঃশেষ করতে হবে।[২৯]

বস্তুত, প্রতিষ্ঠালগ্নে পাকিস্তানে দলভিত্তিক সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি স্থাপনের উপযোগী সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল ছিল না। শাসক দল মুসলিম লীগ ব্যতীত গণপরিষদে প্রতিনিধিত্ব ছিল দেশভাগের পর দুর্বল হয়ে যাওয়া দল কংগ্রেস-এর। কাজেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিগুলো সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না; সংগঠন ও প্রণোদনের সাহায্যে এসব উপাদান একত্রিত করে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।[৩০] এক্ষেত্রে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়েই ক্রম-বিকাশমান রাজনীতি সচেতন জনগোষ্ঠী ও ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনুসারী হয়েছে এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির গণবিপ্লব সংঘটনে অবদান রেখেছে।

একথা সত্য যে, প্রতিটি বিপ্লবই জন্মগ্রহণ করে দীর্ঘ কালের গর্ভে। তাই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরাও পাকিস্তানের প্রথম দশকসহ সমগ্র পাকিস্তানি শাসনামলে অনমনীয় রাজনৈতিক যুদ্ধোদ্যমের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারী পাকিস্তানি শাসক চক্রের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় জনমনে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার করেছে। এই উদ্যমে সবচেয়ে প্রভাবশালী দল ছিল আওয়ামী লীগ।[৩১] সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক নীতি ও পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সমর্থনপূর্বক একটি বিকল্প রাজনৈতিক আন্দোলন রূপে আওয়ামী মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিবর্তনে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।[৩২]

সেই সাথে পাকিস্তান আমলে প্রায় সম্পূর্ণ সময়েই কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করেছে নিষিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে। এই দলের কর্মীগণ প্রকাশ্যে পার্টির নামে রাজনীতি করার সুযোগ প্রায় পায়নি বলা যায়। তথাপি এই বৈরী পরিবেশে বিকল্প কর্মকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বামপন্থিগণ সচেষ্ট ছিলেন পাকিস্তানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণের প্রতিজ্ঞাকে সফল করার কাজে। কাজেই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ পর্বে, অতঃপর ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ববাংলার বিভিন্ন পর্বের রাজনৈতিক আন্দোলনে ও ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পার্টির ওপর প্রচণ্ড সরকারি আক্রমণ সত্ত্বেও ক্রমেই মুসলিম ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায় দলটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। উপরন্তু, মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক চরিত্র উপলব্ধি ও উদ্ঘাটন এবং সেই সাথে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত বহুদলীয় রাজনীতির অস্তিত্ব সংঘটনে পাকিস্তানের প্রথম দশকে বামপন্থি, প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক কর্মীদের প্রচেষ্টা ও সফলতা পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

ঐতিহাসিক পরিস্থিতিগত মতবাদ (Historical Situation Theory) অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের এই বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল তিনটি প্রধান অভ্যন্তরীণ সংকট–

১। ভৌগোলিক অখণ্ডতাগত সংকট,
২। শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সংকট এবং
৩। শাসকশ্রেণির বৈধতার সংকট।[৩৩]

পশ্চিম-পাকিস্তান কর্তৃক সৃষ্ট রাজনৈতিক বৈষম্য ছিল এক্ষেত্রে সহায়ক উপাদান।

১৯৪৭-৫৭ পর্বে পাকিস্তানের ৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের। একই সময়ে ৭ জন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ৩ জন ছিলেন বাঙালি। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা (১৯৫৬-৫৭) ছাড়া সকল মন্ত্রিসভায় অধিকাংশ ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন পশ্চিম-পাকিস্তানি। তাছাড়া প্রতিরক্ষা, অর্থ, পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, শিল্প, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো কদাচিৎ বাঙালিদের হাতে দেয়া হতো। কারণ, শাসকদলের নেতৃত্বই ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানিদের হাতে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের সভাপতি ও গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং মন্ত্রিসভা ছিল কার্যত তার অধীনস্থ একটি উপদেষ্টা সংস্থা। তার মৃত্যুর পর একজন পূর্ব-পাকিস্তানি (খাজা নাজিমুদ্দীন) গভর্নর জেনারেল হন। তখন প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর হাতে চলে যায়। ১৯৫১ সালে নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হলেও তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির লোক। ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবি গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ অনায়াসে তাকে পদচ্যুত করেন। অপর একজন বাঙালি মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু মোহাম্মদ আলীও ছিলেন পশ্চিম-পাকিস্তানি চক্রের হাতে বন্দী। ১৯৫৪ সালে যখন তিনি গণপরিষদে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য কতিপয় বিল পাস করেন, তখন গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ ভেঙে দেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু তাকেও পদচ্যুত করা হয়।

প্রাদেশিক পর্যায়েও অবস্থা ভিন্নতর ছিল না। ১৯৪৭-৫৫ সালে পূর্ববাংলার ৪ জন গভর্নরের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। গভর্নরগণ ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত ব্যক্তি এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও প্রশাসনের ওপর তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার আমলাতন্ত্রের মাধ্যমেও পূর্ব-পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করত। এইভাবে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বাঙালিদের দুর্বলতা এবং পশ্চিম-পাকিস্তানিদের ম্যাকিয়াভেলীয় ষড়যন্ত্রের কারণে পাকিস্তানের রাজনীতিতে পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষে কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়নি।[৩৪]

উপরন্তু, পাকিস্তান-আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বাঙালিদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব ছিল সব সময়ই উপেক্ষিত। স্বাধীনতা

লাভের পূর্বে অখণ্ড বাংলায় ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর সরকার গঠন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু নবগঠিত পূর্ববাংলা প্রদেশে সরকার গঠন প্রশ্নে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিতে ভোটাভুটি হলে (৫ আগস্ট, ১৯৪৭) খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ববাংলা প্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ন্যায্যত, মুখ্যমন্ত্রিত্ব লাভের দাবিদার ছিলেন সোহরাওয়ার্দী। কাজেই আদর্শগত মতভেদ সহকারে বিরোধীগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। নাজিমুদ্দীনগোষ্ঠী শক্তিশালী কেন্দ্র গঠনপূর্বক মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনায় তৎপর হয়। বিপরীতে বিরোধী অংশ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অনুসারে পূর্ববাংলার জন্য অধিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন ও পাকিস্তানকে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার আদর্শে অগ্রসর হয়।

উল্লেখ্য যে, এই বিরোধীপক্ষকে দুর্বল করার স্বার্থেই একদিকে পূর্ববাংলায় নেতৃত্ব সংকট সৃষ্টি করা হয়,[৩৫] অন্যদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ভেঙে দিয়ে সরকার সমর্থকদের নিয়ে এডহক কমিটি গঠন করা হয়। সেই সাথে মুসলিম লীগকে 'পকেট লীগে' পরিণত করা হয় প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথ জনগণের জন্য বন্ধ করে দিয়ে।[৩৬] মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অগণতান্ত্রিক আচরণের কারণেই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রথমে পাকিস্তানে না এসে ভারতে থেকে যান। সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থকগণ সরকার ও দল উভয় পক্ষ থেকে উপেক্ষিত ও নির্যাতিত হন। ফলে এই গোষ্ঠী সরকার ও তার দল বিরোধী প্লাটফরম গঠনের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করায় পূর্ববাংলায় বিরোধী দলীয় রাজনীতির উত্থান ঘটে এবং গড়ে ওঠে নতুন রাজনৈতিক দল, যা সাংগঠনিকভাবে রাজনৈতিক বিকাশের পথ রচনা করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হিসেবে নতুন রাজনৈতিক দল ও যুব সংগঠনের আত্মপ্রকাশ স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীগণ শুরু থেকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈষম্য বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিনিয়ত তাদের সন্দেহ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে মাত্র।[৩৭]

এমতাবস্থায়, ১৯৪৭-১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন ও তার প্রভাবে প্রাপ্ত ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী রায় শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধেই রাজনীতিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণও সফলতার উদাহরণ সৃষ্টি করে। আর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন-কুশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত সেই প্রকাশকেই সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে রাজনৈতিক দলগুলো। কারণ, এসময় কোনো একক রাজনৈতিক দলের প্রকৃত নেতৃত্ব জনগণের ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকায় জনগণকে রাজনীতিগতভাবে শিক্ষিত করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট

সক্ষম ছিল না কোনো দল।[৩৮] কাজেই সেই ব্যাপক সাফল্য জনগণের তথা গণতান্ত্রিক বিজয়ে রূপান্তরিত না হয়ে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের পথটিই সুগম করে। রাজনৈতিক শিক্ষার ভিত্তিতে জনসচেতনতাকে যথার্থভাবে সংগঠিত করার মতো কর্মসূচি, আদর্শ বা সাংগঠনিক নীতিমালা গ্রহণ না করে বিক্ষোভ প্রবণতাকে মূলধন বিবেচনা করার এই প্রবণতা অব্যাহত থাকায় 'কৌশলের রাজনীতি' হয়ে ওঠে পাকিস্তানি শাসনামলে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য।

বস্তুত, রাজনীতি কোনো নির্দিষ্ট নীতি নয় বরং শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থ রক্ষামূলক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, যার প্রধান বাহন হচ্ছে সংগঠিত দল।[৩৯] তাই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্র ও ভূমিকাকেও প্রভাবিত করেছে সমাজের শ্রেণিকাঠামো–

প্রথমত, পূর্ববাংলার রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির হাতে থাকায় পশ্চিম-পাকিস্তানের উচ্চবিত্ত শ্রেণির থেকে পৃথক ধরনের সামাজিক ও দার্শনিক অনুপ্রেরণা রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যেও সৃষ্টি করে পৃথক ধরনের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং তাদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে পরস্পরবিরোধী ও বিবদমান আশা আকাঙ্ক্ষা।[৪০]

দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলায় ছিল কৃষক শ্রেণি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি; জমিদার শ্রেণি ছিল প্রায় নিশ্চিহ্ন; বড় কৃষক বা জোতদার শ্রেণিও ছিল সীমিত; সমাজকাঠামো ছিল কমবেশি সমতাবাদী।[৪১]

এক্ষেত্রে ব্যক্তি ও দলের স্বার্থের রাজনৈতিক প্রকাশ ও সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হিসেবেই রাজনৈতিক দলগুলো মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। দলগুলো এসময় 'গড়ে উঠেছে, ক্রমশ দুর্বল হয়েছে, ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছে' এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ 'বিতর্কে জড়িয়েছে, ষড়যন্ত্র করেছে এবং একে অন্যকে ক্লীবে পরিণত করেছে'[৪২]। এজন্যই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ পর্ব পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক দলগুলোর বিকাশের ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন ও অনিশ্চয়তার কাল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সময়ে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলো হলো– পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী মুসলিম লীগ (আওয়ামী লীগ), কমিউনিস্ট পার্টি, নেজাম-ই-ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ইত্যাদি। এছাড়া ছাত্র ও যুব সংগঠন ছিল– গণআজাদী লীগ, যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ইউনিয়ন ইত্যাদি। তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিষ্ঠা, পরিচিতি, সাংগঠনিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ভূমিকা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটরূপে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পাকিস্তানের প্রথম দশকে মুসলিম লীগের অবনয়নের বিপরীতে

প্রগতিপন্থি দলগুলোর জন্ম ও রাজনৈতিক তৎপরতাই ছিল পূর্ববাংলার সাংগঠনিক বিকাশের অন্যতম উপাদান। এক্ষেত্রে ছাত্র ও যুব সমাজের রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সাথে সাথে বাংলা বিভক্তির পর পূর্ববাংলায় যেসব ছাত্র সংগঠনের শাখা গঠিত হয়, তা হলো– ১. কমিউনিস্টপন্থি All Bengal Student Federation; ২. কংগ্রেসপন্থি All Bengal Student Congress; ৩. মুসলিম লীগপন্থি All Bengal Muslim Student League। সারা বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যে হাশিম-সোহরাওয়ার্দীর অনুসারীরা ছিল উদারনৈতিক, আর নাজিমুদ্দীন-আকরম খাঁ-এর অনুসারীরা ছিল রক্ষণশীল। দেশভাগের পর হাশিম-সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় থেকে গেলেও তাদের অনুসারীরা অনেকেই পূর্ববাংলায় চলে আসে। আর নাজিমুদ্দীন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর পূর্ববাংলায় রক্ষণশীল অনুসারীরা সরকার পক্ষ অবলম্বন করে। কাজেই অন্যপক্ষের ছাত্রবৃন্দ সরকারের বিরোধী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছাত্র ও যুব সংগঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. গণআজাদী লীগ

স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ একটি বিরাট গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেও, কৃষক মজুর বা নিম্ন মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে সাংগঠনিকভাবে সচেষ্ট ছিল না। কাজেই অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল মহলে এক্ষেত্রে হতাশা সঞ্চারিত হয় এবং প্রগতিশীল অংশ ক্রমশই বিরোধীপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এদের মধ্যে মুসলিম লীগের ভিতরে পূর্ববাংলায় নাজিমুদ্দীনবিরোধী অংশটি ছিল মূলত তরুণ কর্মীদল। বাম রাজনীতির দিকে তাদের কিছুটা ঝোঁকও ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দেশভাগের পূর্বেই তারা একটি আলাদা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত উক্ত সংগঠনের নাম গণআজাদী লীগ (People's Freedom League), যার আহ্বায়ক নিযুক্ত হন কামরুদ্দীন আহমদ। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও ক্ষোভের অভিব্যক্তি থেকেই এই সংগঠনের জন্ম।[৪৩]

আশুদাবি কর্মসূচী আদর্শ নামে দলটি একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে এবং তাতে দলের মধ্যে এক নতুন চেতনার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। এতে বলা হয়–

> বিদেশী শাসন হতে একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই দেশবাসীরা স্বাধীনতা পেল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্যই নেই, যদি স্বাধীনতা জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন না করে।[৪৪]

গণআজাদী লীগের ম্যানিফেস্টোর বক্তব্য মূলত মুসলিম লীগ কর্মীদেরই একটি প্রগতিশীল অংশের আত্মসমালোচনা ও আত্মোপলব্ধির ঘোষণা। ঘোষণাটির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এতে যে-সকল দাবি-দাওয়ার কথা আছে সেগুলো প্রায় সবই পূর্ব-পাকিস্তান সম্পর্কে। সারা পাকিস্তানে কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো বক্তব্যই নেই বলা যায়। ভাষার বিষয়টি পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য ব্যতিক্রম হিসেবে স্বীকার্য। কিন্তু শুধু ভাষার প্রশ্নেই নয়, অন্য সকল প্রশ্ন সম্পর্কেও তাঁদের একই মনোভাব। ম্যানিফেস্টোটি এমনভাবে লিখিত হয় যেন পূর্ব-পাকিস্তান একটি সম্পূর্ণ পৃথক রাষ্ট্র, তার সাথে পশ্চিম-পাকিস্তানের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ বিষয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই যে, সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ বাঙালিদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। সেক্ষেত্রে গণআজাদী লীগের মুখপাত্রদের হয়তো ধারণা ছিল যে পাকিস্তানের দুই অংশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্রীয় একক হিসেবে মোটামুটিভাবে গণ্য করা যাবে।[৪৫]

পূর্ববাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে সময়োপযোগী হওয়া সত্ত্বেও এই সংগঠন শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তবে পাকিস্তানের নাগরিক অধিকার অব্যাহত রাখা এবং সুদৃঢ় করার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির চেষ্টা বিরোধী দলীয় আদর্শের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যন্ত নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়েই কাজ কর্ম সীমাবদ্ধ রেখে সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করা হয়। নতুন নাম 'সিভিল লিবার্টিস লীগ' রাখা হয় ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

২. গণতান্ত্রিক যুবলীগ

স্বাধীনতা-উত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন– এই উপলব্ধি থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর কলিকাতার মুসলমান উদারনৈতিক রাজনীতিক ও ছাত্রনেতাগণ[৪৬] ঢাকায় এসে এখানকার ছাত্রনেতাদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনায় রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি সম্মেলন আহ্বানের প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতৃস্থানীয় কর্মীগণ পূর্ববাংলাকে কতগুলো এলাকায় ভাগ করে প্রদেশব্যাপী কর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সফর শুরু করেন এবং আশাতীত সাড়া লাভ করেন। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ২৪ আগস্ট কর্মীসম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণাঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর।[৪৭]

৩১ জুলাই সম্মেলনের জন্য অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয় এবং ৫ আগস্ট খসড়া ম্যানিফেস্টো গৃহীত হয়। মুসলিম লীগ সরকার সম্মেলনটিকে সরকারবিরোধী সমাবেশ বলে ধরে নেয়ার কারণে স্থান নির্ধারণে সমস্যা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত আবুল হাসনাত আহমদের বাসায় সম্মেলনের স্থান নির্ধারিত হয়।[৪৮]

এসময় ঢাকার প্রগতিশীল ও উদার মনোভাবাপন্ন ছাত্রকর্মীরাও একটি ছাত্র সংগঠন গড়ার সম্ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং ৩১ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ঢাকা শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের একটি সভা আহ্বান করেন। এরা সংগঠনটির নামের পূর্বে 'মুসলিম' শব্দটি রাখা না রাখা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ৩০ আগস্ট এক ঘরোয়া বৈঠকে শব্দটি পরিত্যাগের বিষয়েই একমত হন সবাই। তবে সাম্প্রদায়িক আদর্শে নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে শব্দটি রাখার পক্ষে জোর অভিমত ছিল এই কারণে যে, তা না হলে জনগণ সংগঠনটিকে কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত মনে করে বিভ্রান্ত হবে।[৪৯]

সম্মেলন পণ্ড করার জন্য সরকারপক্ষ নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করলেও ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ দুপুরে তসদ্দুক আহমদের সভাপতিত্বে নির্ধারিত স্থানে সম্মেলন শুরু হয়। ৭ সেপ্টেম্বর সকালে বিষয় নির্বাচনী কমিটির প্রস্তাবাবলি শান্তিপূর্ণভাবে গৃহীত হয়, যা ছিল প্রধানত গণদাবির সনদ। তাছাড়া খাদ্য সমস্যা এবং 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। যুবসম্মেলনে সকল দলের সেই সব রাজনৈতিক কর্মীদেরকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়, যারা ছিলেন পার্লামেন্টারি রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন। কিন্তু এই সম্মেলনে প্রায় পাঁচশত কর্মী সমবেত হলেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যান্য বামপন্থি কর্মীরা ছাড়া অন্য কেউ এতে যোগদান করেননি।[৫০]

সম্মেলনে 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' গঠনের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধরূপে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করা হয়। দাবি ছিল– এক্ষেত্রে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা-সহ পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ও আর্থিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণের সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ।[৫১] অতঃপর প্রায় ২৫ জন সদস্যের পূর্ব-পাকিস্তান সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত কমিটি জেলা এবং অন্যান্য ইউনিটের প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ করে ছয় মাসের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক যুবকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করবে।[৫২] এই সম্মেলনে স্বতন্ত্র যুব সংগঠন 'গণতান্ত্রিক যুব লীগ' প্রতিষ্ঠা ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলায় গুণগত রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচনার প্রথম ইঙ্গিত।[৫৩] কারণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই প্রগতিশীল সংগঠনটির জন্ম হয়। অজয় রায়ের মতে, এটি কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না, বরং

অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রগতিশীল ধারায় একটি গণসংগঠনরূপে গড়ে তোলার জন্যই বামপন্থিগণ এই উদ্যোগ গ্রহণ করে।[৫৪]

কর্মী সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত গণদাবির সনদে শামসুল হক বলেন:

> পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক যুব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী তৈরী করা এবং সারা দেশব্যাপী এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা। ... তাই যুব সংগঠনের ইস্তেহার যুবকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন ও পূর্ণবিকাশের জন্য সাধারণ গণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।[৫৫]

পূর্ব-পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে ভাষাবিষয়ক নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হোক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছেড়ে দেয়া হোক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হোক।[৫৬]

এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে যুবলীগ কর্মীদের অবস্থান ছিল পুরোভাগে।

ঢাকার পর রাজশাহী বিভাগের সম্মেলনে পরবর্তী বৎসর সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা-সহ নতুনভাবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়। সরকারি দমন-পীড়ন এবং সাংগঠনিক দিক-নির্দেশনার অভাবে ঝিমিয়ে পড়া যুবলীগের জন্য সক্রিয় কর্মপন্থার প্রয়োজন স্বীকার করে প্রকাশিত ইস্তেহারে এক বৎসরের সরকারি নীতি ও কার্যকলাপের নেতিবাচক দিক তুলে ধরে ঘোষণা করা হয়– 'বর্তমান স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, মেকি স্বাধীনতা মাত্র।'[৫৭]

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক যুবলীগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় পাকিস্তানকে জনগণের জন্য 'বিভীষিকাময় নূতন দাসত্ব শৃঙ্খলের রাষ্ট্র' বলা হয়, যেখানে জনগণের সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষার অর্থ 'পাকিস্তানের দুশমনী'। কাজেই সম্মেলনে গৃহীত ইস্তেহার ও প্রস্তাবাবলি কার্যে পরিণত করার জন্য পুনরায় যুবসমাজকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।[৫৮]

এতদ্বসত্ত্বেও স্বীকার্য যে, এই সংগঠনের উদ্যোগ ও প্রস্তাবাবলি ছিল জনকল্যাণকামী ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ, যা তৎকালে সাংগঠনিক বিকাশের লক্ষণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করে। পূর্ববাংলার উপ-আঞ্চলিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে বিকশিত হওয়ার সুযোগ গ্রহণের সম্ভাবনাও সূচিত হয় গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মসূচি ও প্রতিজ্ঞায়। তবে গণবিরোধী সরকারের পরিবর্তনের

সম্ভাবনার বিষয়েও যুবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[৫৯] কাজেই কমিউনিস্ট পার্টির সমকালীন নীতির সাথে মিল খুঁজে পেয়ে সরকারি দমননীতি এই সংগঠনের ওপর তীব্র আকার ধারণ করে।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' নামে একটি বুলেটিন আখলাকুর রহমান এবং আতাউর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু মাত্র কয়েকটি সংখ্যা বের হওয়ার পরই তা বন্ধ হয়ে যায়।[৬০] অর্থাৎ যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গঠিত হলেও 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি। প্রতিষ্ঠার পরপরই ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ-সহ বিভিন্ন জেলায় এর শাখা স্থাপিত হয়। কিন্তু পুলিশী নির্যাতন ও মুসলিম লীগ দলীয় অত্যাচার এই সংগঠনকে অচিরেই বিলুপ্তির দিকে ধাবিত করে।

৩. যুবলীগ

ভারত বিভক্তির পর বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পাকিস্তান অংশের শাখা হিসেবে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি কার্যত স্বাধীনভাবেই সাংগঠনিক কাজ করেছে। এই পার্টি কর্তৃক পরিচালিত কৃষক-আন্দোলনগুলো দমনের জন্য পূর্ববাংলা সরকার চরম নির্যাতন ও হিংসাত্মক কর্মপন্থা গ্রহণ করায় পার্টির প্রকাশ্য তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায় এবং কর্মীরা অন্য দলের মধ্যে ঢুকে নিজেদের আদর্শ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় অনেক মুসলমান নেতাকর্মী পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই দলের নামে 'মুসলিম' শব্দটি থাকায় সেখানে অমুসলিম কর্মীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কাজেই একটি অসাম্প্রদায়িক যুবসংগঠন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হন বামপন্থি নেতৃবৃন্দ। এই উদ্দেশ্যে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। সম্মেলনের তারিখ ২৭ মার্চ ১৯৫১ ও স্থান বার লাইব্রেরি হল নির্ধারিত হলেও সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারি করার কারণে বুড়িগঙ্গার অন্য পাড়ে জিঞ্জিরা বাজারে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।[৬১]

সম্মেলন উদ্বোধন করেন *পাকিস্তান অবজারভার*-এর সম্পাদক আব্দুস সালাম, সভাপতিত্ব করেন মাহমুদ আলী। সভাপতি তার ভাষণে জাতীয় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোকে স্বাধীন মানুষের মতো বেঁচে থাকার সমস্যা বলে ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে,

> ব্রিটিশ শাসন মুক্ত আমরা হয়েছি সত্য, কিন্তু বৃটিশের উত্তরাধিকার সূত্রে যারা আমাদের উপর চেপে বসেছেন, তারা ব্রিটিশ শাসনের ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন তার নির্ম্মমতার অমানুষিক চরম পর্যায়ে।[৬২]

সম্মেলনে যে প্রস্তাবাবলি পেশ করা হয়, তাতে ভাষার প্রশ্ন, মূলনীতি কমিটির রিপোর্টসহ ছাত্র-শিক্ষকের ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত দাবির প্রতি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ আরোপের নিন্দাসহ দেশীয় চা শিল্পের স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও দাবি উত্থাপন করা হয়।[৬৩] এই সম্মেলনের ভাষণ, প্রস্তাবাবলি ও ঘোষণা শুধু যুবসম্মেলনের দলিল ছিল না, বরং তাতে তৎকালীন পূর্ববাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ জীবনের বিভিন্ন দিকের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য চিত্র অঙ্কিত হয়।[৬৪]

জিঞ্জিরা বাজারে পুলিশবাহিনী উপস্থিত হলে সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকার ওপর। এই অধিবেশনে খসড়া ঘোষণাপত্র বা ম্যানিফেস্টো গৃহীত হয়। ঘোষণাপত্রে সমাজের প্রতিটি স্তরের তরুণ-তরুণীর বিভিন্ন সমস্যার ওপর নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রদান করা হয়। তাছাড়া অর্থনৈতিক সংকটসহ শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সরকার ও আমলা কর্তৃক ইসলামকে ব্যবহার ও সরকারি দমননীতির সমালোচনা করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিরোধিতায় সচেতন যুবসমাজের ভূমিকা উল্লেখ করে স্বাধীনতা ও শান্তির পক্ষে তাদের অবস্থানের কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়।[৬৫] সেই সাথে 'আমাদের ঘোষণা ও দাবি' শীর্ষক ১৪ দফা কর্মসূচি পেশ করে যুবসমাজের প্রতি পাকিস্তানের সর্বত্র শক্তিশালী যুবআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।[৬৬]

সম্মেলনের শেষ দিকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' নামে একটি যুব সংগঠন গঠনের পক্ষে এবং এই উদ্দেশ্যে ১২৫ সদস্যের 'সংগঠনী কাউন্সিল'ও গঠিত হয়।[৬৭] পরদিন গঠিত হয় ৩০ সদস্যের কার্যকরী কমিটি[৬৮] এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুরু হয় এর সাংগঠনিক কার্যক্রম। যুবলীগ প্রথম থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হয় এবং সরকারি নেতিবাচক নীতির সক্রিয় প্রতিবাদ জানায়। এমনকি লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।[৬৯] পূর্ববাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে যেসব প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করে তারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে এবং কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়েই সাংগঠনিক তৎপরতার সূত্রপাত করে।

যুবলীগের সাংগঠনিক কাজকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং বিভিন্ন এলাকায় কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য ২৭ ও ২৮ মে ১৯৫১ তারিখে ঢাকা জেলার নরসিংদীতে পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ সাংগঠনিক কাউন্সিলের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ বলেন,

'দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে সুসংবদ্ধ করা, বর্তমান মন্ত্রিসভার কবল হতে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পূর্ণভাবে মুক্ত করাই আমাদের বর্তমান জরুরী কাজ।'[৭০] নভেম্বর মাসে যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে পূর্ববাংলার অনেকগুলো জেলা সফর করেন এবং তাদের উপস্থিতিতে কতকগুলো জেলায় যুবলীগের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এই প্রাথমিক সাংগঠনিক কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় যুবলীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন।[৭১]

ইসলামিক উৎসব পালনে অতিরিক্ত গুরুত্বারোপে সরকারি নীতির বিপরীতে পূর্ববাংলায় অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি চর্চাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যুবলীগ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, যেমন বাংলা নববর্ষ, সুকান্ত মৃত্যুবার্ষিকী, রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি। এমনকি ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জনই ছিল যুবলীগের।[৭২]

ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়করণ, ইত্যাদি দাবি উত্থাপনের দ্বারা পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের রাজনীতিতে যুবলীগই অকমিউনিস্ট বামপন্থি রাজনীতির সূচনা করে।[৭৩] কারণ, পূর্ববাংলার রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে ধর্মনিরপেক্ষতা, সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, বিশ্বশান্তি, মুক্তচিন্তা, গণতন্ত্র ও জনকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এবং কর্মতৎপরতা শুরু করে যতটা সম্ভব বেশি সংখ্যায় জনজোট তৈরিতে অবদান রাখার জন্য সচেষ্ট হয় সংগঠনটি।[৭৪] তাছাড়া ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত যুবলীগ ব্যাপকসংখ্যক বাম মনোভাবাপন্ন কর্মী তৈরি করতে সক্ষম হয়, যারা বিভিন্ন গণসংগঠন, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

বস্তুত, ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে যুবলীগের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। বলা যায় যে, ভাষা-আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্বও ছিল যুবলীগ নেতাদের হাতে। ফলে এই দলের অনেক নেতা-কর্মী জেল-জুলুমের মুখোমুখি হয় এবং যুবলীগের নামে কাজ করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বস্তুত, ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ১৯৫২ সালের মার্চের মধ্যে যুবলীগের অধিকাংশ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়, যারা কার্যনির্বাহী কমিটিতে ছিলেন।[৭৫] এমতাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯৫২ সালের এপ্রিলে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামের ছাত্রফ্রন্ট এবং ৩১ ডিসেম্বর 'গণতন্ত্রী দল' (Democratic Dal) নামের রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়।[৭৬] আওয়ামী মুসলিম লীগের মাধ্যমে কাজ করতে আগ্রহী ও হিন্দু কমিউনিস্ট কর্মীগণই প্রধানত এই দলের সদস্য হন। ১৯৫৫ সালে গণতন্ত্রী দল ভেঙে গেলে অনেক কর্মী আওয়ামী লীগে যোগ দেন দলটির অসাম্প্রদায়িক রূপ লাভের কারণে। বলা বাহুল্য যে, তৎকালীন পূর্ববাংলায় প্রগতিশীল রাজনীতির অঙ্গনে যুবলীগ ও গণতন্ত্রী দলের বিশেষ অবদান অনস্বীকার্য।

৪. পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (ছাত্রলীগ)

ছাত্রলীগ প্রাচীনতা ও ঐতিহ্যের দিক থেকে অগ্রগণ্য একটি সংগঠন, যা ১৯৩৮ সালে সংগঠিত হয় 'অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগ' নামে প্রধানত তিনটি মৌলিক লক্ষ্য সামনে রেখে–

১. সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বার্থের দাবি তুলে ধরা,
২. মুসলমান ছাত্রদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও
৩. শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশ[৭৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিভিন্ন সময় নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন-সহ পাকিস্তান আন্দোলনেও এই সংগঠনের নেতা-কর্মীগণ অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নতুন প্রেক্ষাপটে সংগঠনটি 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নামে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটির মাধ্যমে রাজশাহীর নঈম উদ্দিন আহমেদকে আহ্বায়ক করে East Pakistan Muslim Student League গঠিত হয়। সরকার সমর্থিত অংশের নামকরণ হয় All East Pakistan Muslim Student League। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সংঘটিত ভাষা-আন্দোলনে যেখানে EPMSL অগ্রণী ভূমিকা রাখে সেখানে AEPMSL সরকারের গুণ্ডাবাহিনীতে পরিণত হয়।[৭৮] ১৯৪৯ সালের জুন মাসে East Pakistan Awami Muslim League গঠিত হলে EPMSL আওয়ামী মুসলিম লীগের অঙ্গসংগঠনে পরিণত হয় এবং AEPMSL মুসলিম লীগের এক কাগুজে ছাত্র-সংগঠনে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য যে, AEPMSL নেতৃত্বের বাংলা ভাষার বিরোধিতা এবং চরম সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার জন্য সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ছাত্র নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে। নিজেদের মধ্যে কিছু প্রাথমিক ঘরোয়া আলোচনার পর সমগ্র প্রদেশের ছাত্রদের প্রতি একটি নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের আহ্বান জানিয়ে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁরা 'পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি আবেদন' নামে একটি সার্কুলার প্রচার করেন, পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে যা ছিল একটি উল্লেখ্যযোগ্য দলিল। সাধারণ ছাত্রদের সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য এই সার্কুলারে বলা হয়:

> ছাত্র সমাজের অভূতপূর্ব ত্যাগ ও কর্মপ্রেরণা দ্বারাই আমরা পাকিস্তান অর্জন করেছি। এই শিশু রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারেও আমাদেরই প্রধান ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও জনগণ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন তার আশু সমাধানের জন্য সুষ্ঠু ছাত্র আন্দোলন একান্ত

প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ব্যাপারে পূর্বতন ছাত্র প্রতিষ্ঠান "মুসলিম ছাত্র লীগ" আমাদের নিরাশ করিয়াছে। বর্তমানে নির্জীব ও অকর্মণ্য এই প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আমরা যাহা চাহিয়াছি, তাহার কিছুই পাই নাই। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই ছাত্র আন্দোলন পরিচালনা করিবার জন্য "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ" নামে একটি নূতন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করিবার জন্য আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। মন্ত্রিসভা বা বিরোধী দলের হস্তে ক্রীড়া পুত্তলী হওয়া আমাদের নীতি নয়। বরং দলীয় রাজনীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সম্পর্কহীন থাকিয়া পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্নমুখী প্রতিভা সৃষ্টি এবং উদ্ভূত জাতীয় সমস্যাগুলির উপর গঠনমূলক আন্দোলন সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য।[৭৯]

সার্কুলারটিতে "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ অস্থায়ী অর্গনাইজিং কমিটির" নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ স্বাক্ষর দান করেন:

নাইমউদ্দিন আহমদ বি.এ. অনার্স কনভেনর (রাজশাহী), আবদুর রহমান চৌধুরী বি.এ. (বরিশাল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুবসম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা), আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী বি.এ. অনার্স (চট্টগ্রাম), শেখ মুজিবুর রহমান বি.এ. (ফরিদপুর), আজিজ আহমদ বি.এ. (নোয়াখালী), আবদুল আজিজ বি.এ. (নোয়াখালী), আবদুল আজিজ এম.এ. (কুষ্টিয়া), সৈয়দ নূরুল আলম বি.এ. (মোমেনশাহী), আবদুল মতিন বি.এ. (পাবনা), দবিরুল ইসলাম বি.এ. (দিনাজপুর), মফিজুর রহমান (রংপুর), অলী আহাদ (ত্রিপুরা), নওয়াব আলী (ঢাকা), আবদুল আজিজ (খুলনা), নুরুল কবীর (ঢাকা সিটি)।[৮০]

প্রতিষ্ঠালগ্নে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করে:

১. ক. পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্নমুখী প্রতিভা সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা;
   খ. বিভিন্ন রকমের কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা।

২. পাকিস্তানকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের কবলমুক্ত করা এবং সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

৩. ক. স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম এবং ছাত্রসমাজকে তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে চালিত হইতে না দেওয়া;
   খ. ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখা।

৪. ক. নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা;
   খ. ছাত্রসমাজকে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে একত্রীভূত করা;

গ. ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবি-দাওয়াগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা;
ঘ. ছাত্রসমাজকে কৃষ্টি ও আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আনিয়া নৈতিক ও চারিত্রিক বিপ্লবের সৃষ্টি করা;
ঙ. জাতি ও দেশের কল্যাণের জন্য ছাত্রসমাজের বিক্ষিপ্ত কর্মশক্তিকে সুসংবদ্ধ কেন্দ্রীভূত করা।

৫. ইসলামিক নীতির উপর ভিত্তি করত জাতীয় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমতা আনয়ন করা।
৬. পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সৌহার্দ্য ও মিলনের পথ সুপ্রশস্ত করা।
৭. জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ন্যায্য দাবি-দাওয়াগুলোকে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মিলনকে সুদৃঢ় করা।
৮. সরকারের জনকল্যাণকর কর্মপদ্ধতিকে সমর্থন করা এবং গণস্বার্থবিরোধী কর্মপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।
৯. প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি।
১০. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মুনাফাকারী ও চোরাকারবারীদের উচ্ছেদ সাধন এবং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র-আন্দোলন পরিচালনার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তার ধ্বংস সাধন।[৮১]

এই সংগঠনের নামকরণে 'মুসলিম' শব্দ থাকায় হিন্দু সদস্যগণ যোগদান করতে পারেনি। ১৯৪৯ সালে অসাম্প্রদায়িকীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও কার্যকর কারণে বিলম্ব হয়। ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশনের পর থেকে ছাত্রলীগ অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়। এদেশের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে এই সংগঠন।

সংগঠনটির সংগ্রামী ঐতিহ্য গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন বেতনভূক কর্মচারীদের আন্দোলনে, ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলনে, ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে এই সংগঠন বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ১৯৫৭ সালে যে শিক্ষক ধর্মঘট হয়, তাতেও ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দান করে।[৮২] বলা যায়, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপে ছাত্রসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের অন্যতম উদাহরণ সৃষ্টি করেছে ছাত্রলীগ। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে ছাত্রলীগের কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যায়।

৫. ছাত্র ফেডারেশন

পূর্ববাংলার একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ছাত্রপ্রতিষ্ঠান ছিল ছাত্র ফেডারেশন। ভারত ভাগের পর পূর্ববাংলা ছাত্র ফেডারেশনের যে শাখা গঠিত হয় তা গোড়াতেই বেশ দুর্বল ছিল। এই সংগঠনটি কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গসংগঠন ছিল; যার অধিকাংশ সদস্য ছিল হিন্দু। ফলে মুসলমান ছাত্ররা সাধারণভাবে এর সাথে জড়িত হওয়ার বিরোধী ছিল।[৮৩] অতঃপর পাকিস্তান থেকে হিন্দু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা ব্যাপক হারে ভারতে গমন করায় কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন উভয় সংগঠন এখানে দুর্বল এবং অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া সরকারের দমননীতির কারণেও ছাত্র ফেডারেশন পাকিস্তানে স্থায়ী হতে পারেনি। কাজেই প্রগতিশীল ছাত্রপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে এই সংগঠনের যে প্রভাব ছিল তা অনেকাংশেই কমে আসে। তবে অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও নানা গণতান্ত্রিক দাবির ভিত্তিতে ছাত্র ফেডারেশন অন্যান্য ছাত্রপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সভাসমাবেশ অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে। কিন্তু সুবিধাবাদী ছাত্রনেতৃত্ব এবং ছাত্রদের সাম্প্রদায়িক সংস্কারের জন্য এর সাফল্য ছিল খুবই সীমিত। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে এই দলের অনেক নেতা-কর্মীর উদ্যোগে পূর্ব-পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়।[৮৪]

৬. পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল 'পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিকায় এই সংগঠনটির জন্ম। রাজনীতি সচেতন বামপন্থি ছাত্ররা যেহেতু ছাত্র ফেডারেশনের নামে রাজনীতি করতে সরকারি বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম-হয়রানির সম্মুখীন হয় এবং যেহেতু ধর্মীয় কারণে মুসলিম ছাত্রলীগেও (১৯৫৩ পর্যন্ত) যোগ দেয়া সম্ভব ছিল না; তাই একটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিবাদী ছাত্র-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই ছাত্র ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। জাতীয়ভিত্তিক এই ছাত্র-সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ছাত্র-ইউনিয়ন নামে সংগঠন বিভিন্ন মফস্বল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মর্মে ড. আবুল কাশেম তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।[৮৫] সাম্প্রদায়িকতাকে উৎখাত করার জন্যই অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, এই উপলব্ধি ঘটে মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের চরম পর্যায়েও অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ছাত্রপ্রতিষ্ঠান পূর্ববাংলায় না থাকার কারণে।[৮৬]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ছাত্রদের ওপর নিখিল পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রভাব ক্ষুণ্ন হওয়ায় নবরূপে গঠিত পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগও ছিল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। কাজেই ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিকায় ছাত্র-আন্দোলন তথা গণতান্ত্রিক-আন্দোলনের সম্মুখে যেসব নতুন সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায়

প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে একটি নতুন ছাত্রপ্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষে মত দেয়। সম্মেলনে প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

> স্বাধীনতা লাভের পরেও শিক্ষাজীবনের সংকট প্রশমিত না হয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। শাসক শ্রেণী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আঘাতের পর আঘাত করেই চলেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ বিভিন্ন সময় এই সব আঘাতকে প্রতিরোধ করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ১৯৪৮ সালে প্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হতে শুরু করে বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, মূলনীতি রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন এবং বিশেষ ভাবে '৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে ছাত্র সমাজ শক্তির ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক শক্তির অভাবে ঐ সব আন্দোলন পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে পারে নাই। অন্যদিকে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক দলাদলির উর্দ্ধে এমন কোন ছাত্র প্রতিষ্ঠান নাই, যা ছাত্র আন্দোলনকে সঠিক পথে চালিত করবার প্রচেষ্টা করতে পারে। সুতরাং বিগত আন্দোলন সমূহের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজে সকল দলীয় মতাদর্শ ও ভেদাভেদের উর্দ্ধে একটি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক ও ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগঠন প্রয়োজন।[৮৭]

ছাত্র প্রতিনিধিদের এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই ঐ সম্মেলনে গঠিত হয় নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান 'পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' যার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়–

শিক্ষা ও সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের অধিকার কায়েম করার জন্য, ছাত্রসমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ও দেশের উন্নতির জন্য দলমত, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রসমাজের একতাবদ্ধ আন্দোলন এবং সর্বপ্রকার দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে থাকিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলাই হবে নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।[৮৮]

১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে আবার একটি ছাত্রসম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংগঠনের ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করে নাম পরিবর্তন করে প্রাদেশিক সংগঠনে পরিণত করা হয়, নাম হয় "পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন"। সারা প্রদেশে গণতান্ত্রিক ছাত্র কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে প্রদেশের প্রায় সব জেলাতেই এই প্রতিষ্ঠানের শাখা গড়ে ওঠে এবং অল্পকালের মধ্যেই নেতৃস্থানীয় ছাত্রপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে সংগঠনটি ত্রিমুখী সংগ্রামে নিয়োজিত হয়–

প্রথমত, দৈনন্দিন শিক্ষাজীবনের ছোট খাট সমস্যা ও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবি।

দ্বিতীয়ত, ছাত্রসমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ও জাতীয় জীবনে মৌলিক সমস্যা সমাধানের দাবি।

তৃতীয়ত, ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপক ঐক্য গঠনের প্রচেষ্টা।[৮৯]

১৯৫৪ সালের ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। এসময় একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে ছাত্র ইউনিয়ন যুক্তফ্রন্ট গঠনে এবং নির্বাচনে জয়লাভে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয় লাভ ও মুসলিম লীগের চরম বিপর্যয় শাসকচক্র মেনে নিতে না পেরে প্রদেশে ৯২(ক) ধারা জারি করলে সংগঠনের শত শত কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সামগ্রিকভাবে ছাত্রআন্দোলন একটা বড় সংকটে পড়ে যায়। ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহারের পর অবস্থার উন্নতি ঘটলে ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় সম্মেলন। অতঃপর প্রদেশে ও কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ পাওয়ায় দেশে রাজনীতিতে নতুন ইতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব-পাকিস্তানে পরিস্থিতি উন্নত হয়, তার ফলে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিরও উন্নয়ন ঘটে। তবে সংগঠনটি কোনো বিশেষ দলের বা মতের লেজুড়-বৃত্তির বিরোধিতা করায় পরিস্থিতি কিছুটা জটিলাকার ধারণ করে, যদিও তা আয়ত্তের বাইরে যেতে পারেনি।[৯০]

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র ইউনিয়নের শেষ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সামরিক শাসন জারি হওয়ায় সংগঠনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। কিন্তু অপ্রকাশ্যেই সংগঠনের প্রতি ছাত্রসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকায় প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে প্রদেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার নতুন কৌশল আয়ত্ত করে সংগঠনটি। কাজেই সামরিক শাসনবিরোধী-আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, পাকিস্তানের শুরু থেকেই পূর্ববাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীগণ শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত ও সচেতন ছিলেন। কারণ, পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেন্দ্র-প্রদেশ শৃংখলে পূর্ববাংলা ছিল সর্বাপেক্ষা ভঙ্গুর অবস্থানে। কাজেই পাকিস্তানের প্রথম দশকে এই প্রদেশের রাজনীতি চিহ্নিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বশ্যতাহীন বিরুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে। সেক্ষেত্রে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে ছাত্র-সংগঠনসমূহের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়েও প্রশংসার দাবিদার।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

১. M. Rafiqul Islam, *The Bangladesh Liberation Movement: International Legal Implications*, (Dhaka: UPL 1987) P. 65

২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিল পত্র (প্রথম খণ্ড)* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) পৃ. ৫৩

৩. M. Rafiqul Islam, op. cit., Pp. 49-66. 'উপনিবেশবাদের সূত্র পর্যবেক্ষণ পূর্বক পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ পরীক্ষা করে গবেষক পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম

পাকিস্তানের প্রায় ২৪ বছরের শাসনকে 'অভ্যন্তরীণ নব্যউপনিবেশবাদ' রূপে আখ্যায়িত করে বলেন যে, It may be said that the independence of Pakistan is no way altered the ground of East Pakistani's right to self determination. Even if it is assumed that they forfeited the right in ১৯৪৭, the right resuscitated once again after almost a quarter-century of 'internal neocolonialism.'

৪. Keith Callard, *Pakistan, A Political Study*, (London: London Ruskin House, George Allen & Urwin Ltd.) P. 25

৫. M. Rafiqul Islam, op. cit., Pp. 45-46

৬. *Gazette of Pakistan* (Extraordinary), *1948*, (Dated, 19th July, 1948, Karachi) P. 363, Notification No. G.G.O. 13

৭. ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, (ঢাকা: সময় প্রকাশন ১৯৯৯) পৃ. ১০৩

৮. *Constituent Assembly of Pakistan Debates*, (Vol. 1, 17th January 1956) p. 1845

৯. রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স ২০০০) পৃ. ২৪

১০. *CAPD*, (vol-1, January 16, 1956) Pp. 1818-19, 1846-47.

১১. পশ্চিম পাকিস্তানের ২২ পরিবারের নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা/শিল্প, বাণিজ্যের বিবরণ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে, ছদ্রুদ্দিন, *বাংলাদেশ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ*, (ঢাকা ১৯৭৫) পৃ. ১২

১২. Nazma Chowdhury, *The legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature, 1947-58*, (Dacca: University of Dacca 1980) p. 165

১৩. Ibid।

১৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে গঠিত (জুলাই, ১৯৪১) ভাইসরয়ের 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল'-এ যোগদান ও সরকারি যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাথে সহযোগিতা দান প্রশ্নে জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের তীব্র মত পার্থক্য দেখা দেয়। অবশেষে ১০ ডিসেম্বর ১৯৪১ তাকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। সিদ্ধান্তটি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি অনুমোদন করে নাগপুরে ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৪১। Md. Enamul Huq Khan, *A.K. Fazlul Huq and Muslim League in Bengal 1906-1947*, (Dhaka: The Registrar, Jahangirnager University, ২০০২), Pp. 99-106.

১৫. Nazma Chowdhury, op. cit. p. 82, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল ১৯৮৪) পৃ. ৩২-৩৩

১৬. নির্বাচিত পাঁচজন ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, খাজা নাজিমুদ্দীন, হাসান আলী, হামিদুল হক চৌধুরী ও ইউসুফ আলী চৌধুরী। দৈনিক *আজাদ* (ঢাকা: ১৩, ২৬, ২৭ জানুয়ারি, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২ জুন, ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৮)। উদ্ধৃত, মোঃ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি, ১৯৫৩-১৯৬৬*, (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২০০৫) পৃ. ২৮

১৭. পূর্ববাংলার প্রাদেশিক গভর্নর ব্যক্তিগত অতিরিক্ত ক্ষমতা বলে খুররম খান পন্নীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। মো. খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, তদেব, পৃ. ২৯

১৮. আতাউর রহমান খান, *ওজারতির দুই বছর*; (ঢাকা: ১৯৮৪) পৃ. ৬৮; Nazma Chowdhury, op. cit. P. 86, শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ২০১২) পৃ. ১১৫, ১১৮-১২১

১৯. M.A Choudhuri, *Government and Politics in Pakistan*, (Dacca: Puthighar Ltd. 1968) P.186
২০. G.W Choudhury, *Constitutional Development in Pakistan*, (London: Longman Group Ltd. 1969) P. 57
২১. Keith Callard, *Pakistan, A Political Study*, (London: London Ruskin House, George Allen & Urwin Ltd. 1958) P. 25; Nazma Chowdhury, op. cit., P. 87
২২. Nazma Chowdhury, op. cit., P. 88, ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২
২৩. Ayesha Jalal, *The State of Martial Rule,* (Pakistan: Lahore 1999) P. 154
২৪. Ibid, P. 84
২৫. *East Bengal Legislative Assembly Proceedings,* (vol. VII, February 21, 1952) P. 90
২৬. Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan,* (Dhaka: UPL 2001) Pp. 20-26; Nazma Chowdhury, op. cit., P. 79
২৭. M.A. Chaudhuri, op. cit. P. 380
২৮. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স ২০০১) পৃ. ১৭০
২৯. উদ্ধৃত, Muzaffar Ahmed Chowdhury, *Government and Politics in Pakistan*, (Dacca: Puthighar Ltd. 1968) P. 385
৩০. T. Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath,* (Dhaka: UPL 1988) P. 235
৩১. Ibid, P. 19
৩২. Aminur Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh*, (Dhaka: UPL 1997) P. 214
৩৩. কামাল উদ্দিন আহমেদ, 'সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা', এমাজ উদ্দিন আহম্মেদ (সম্পা.), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র, প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা*, (ঢাকা: করিম বুক করপোরেশন, মোহাম্মদপুর ১৯৯২) পৃ. ৮৬
৩৪. Keith Callard, op. cit., P. 173
৩৫. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে মতভেদের কারণে ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করেছিলেন ১৯৪১ সালেই। আর স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালে শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের শিকার হন সোহরাওয়ার্দী, তাঁর গণপরিষদ সদস্য পদ বাতিল করা হয়।
৩৬. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল ২০০২) পৃ. ২৩৯
৩৭. S. K. Chakrabarti, *The Evolution of Politics in Bangladesh 1947-1978*, (New Delhi 1978), P. 42
৩৮. বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ*, (ঢাকা: মুক্ত ধারা ১৯৭৮), পৃ. ১৬৮-৬৯
৩৯. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শন কোষ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৭৩) পৃ. ৩২৭
৪০. মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, (ঢাকা: ইউপিএল ১৯৯৬) পৃ. ২১৪
৪১. Dr. M.A. Chaudhuri, op. cit., P. 371
৪২. Keith Callard, op. cit., P. 5
৪৩. ড. মো. মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৫

৪৪. *আশু দাবি কর্মসূচী আদর্শ*, প্রকাশক: কামরুদ্দীন আহমদ, কনভেনার গণ-আজাদী লীগ, (পূর্ব পাকিস্তান পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, জুলাই-১৯৪৭); উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭

৪৫. *আশুদাবি কর্মসূচী আদর্শ*, পৃ. ১-২৩, উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ১৮

৪৬. কলিকাতার কর্মীদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান (রাজশাহী), কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, শহীদুল্লাহ কায়সার, আখলাকুর রহমান, একরামুল হক, আব্দুর রশীদ খান প্রমুখ। ঢাকার কর্মীগণ ছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক (টাঙ্গাইল), শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ, তসদ্দুক আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আব্দুল ওদুদ, হাজেরা মাহমুদ প্রমুখ। বদরুদ্দীন উমর, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০-২১

৪৭. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, (ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ ১৯৯২), পৃ. ৫১

৪৮. *ঐ*, পৃ. ২২

৪৯. *ঐ*

৫০. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

৫১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র*, ১ম খণ্ড (নতুন সংস্করণ) পৃ. ৯৪

৫২. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫, ২৬

৫৩. মোহাম্মদ হান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১

৫৪. অজয় রায়, *বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন*, ১৯৪৭-১৯৭১ (ঢাকা: সাহিত্যিকা, এপ্রিল ২০০৩) পৃ. ৪৭

৫৫. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

৫৬. *ঐ*

৫৭. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র*, ১ম খণ্ড (নতুন সংস্করণ), পৃ. ৯৫-৯৭

৫৮. *ঐ*, পৃ. ৯৪-৯৫

৫৯. *ঐ*, পৃ. ১০২-৩

৬০. বদরুদ্দীন ওমর, *পূর্বোক্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬

৬১. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭-১১৯

৬২. *নওবেলাল*, ৫ এপ্রিল, ১৯৫১, বদরুদ্দীন উমর, *ঐ*, পৃ. ১১৭-১৯

৬৩. *ঐ*, পৃ. ১২০-২১

৬৪. বদরুদ্দীন উমর, ৩য় খণ্ড, *পূর্বোক্ত* পৃ. ১২৭

৬৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড*, পৃ. ২০৭-১১

৬৬. *ঐ*, পৃ. ২১২-১৪

৬৭. *নওবেলাল*, ৫ এপ্রিল, ১৯৫১, উদ্ধৃত, *ঐ*

৬৮. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল ২০০২) পৃ. ৯৭ সাংগঠনিক কমিটি ছিল নিম্নরূপ:

সভাপতি	ঃ	জনাব মাহমুদ আলী
সহ-সভাপতি	ঃ	সর্বজনাব খাজা আহমদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, শাহসুদ্দোহা (টাঙ্গাইল), আবুল মজিদ এবং মিসেস দৌলতুন্নেসা
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	জনাব অলি আহাদ
যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	সর্বজনাব আবদুল মতিন ও বুহুল আমীন

কোষাধ্যক্ষ ঃ জনাব তসাদ্দক আহমদ চৌধুরী

কার্যকরী সংসদ-সদস্যবর্গ ঃ সর্বজনাব মাহমুদ নূরুল হুদা, মোঃ তোয়াহা, মতিউর রহমান (রংপুর), আবদুল হালিম (ঢাকা), আবদুস সামাদ (সিলেট), মকসুদ আহমদ, কে,জি, মোস্তফা, কবির আহমদ (চট্টগ্রাম), এম.এ, ওয়াদুদ, আবদুল গফফার চৌধুরী, প্রাণেশ সমাদ্দার, তাজউদ্দীন আহমদ, আকমল হোসেন, মোতাহার হোসেন, মিস রোকেয়া খাতুন।

৬৯. *ঐ*, পৃ. ৯৮
৭০. *নওবেলাল*, ৭ জুন, ১৯৫১, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত* পৃ. ১২৮
৭১. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৯
৭২. T. Maniruzzaman, op. cit. P. 7
৭৩. ফাইজুস সালেহিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬
৭৪. T. Maniruzzaman, op. cit. P. 6
৭৫. Proceedings of the East Bangal Legislative Assembly 8, No. 3, 24 March, 1952, বক্তব্য: মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন।
৭৬. ড. মো. মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৬
৭৭. ফাইজুস সালেহিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১, ৩২
৭৮. ড. মো. মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬০
৭৯. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩
৮০. ঐ, পৃ. ১৫৫
৮১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড*, পৃ. ৪৭-৪৮
৮২. ফাইজুস সালেহীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫
৮৩. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৬
৮৪. ড. মো. মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৩।
৮৫. ড. আবুল কাশেম, 'বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পটভূমি: একটি পর্যালোচনা', (*Rajshahi University Studies*, Part-A, Vol. 23-24, 1995-96) P. 1-12
৮৬. *পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন, ১৯৬৩, সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক কার্যবিবরণী*, পৃ. ৪
৮৭. কার্যবিবরণী, পৃ. ৫
৮৮. কার্যবিবরণী, পৃ. ৬
৮৯. কার্যবিবরণী, পৃ. ৭
৯০. কার্যবিবরণী, পৃ. ১১

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023
ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

সুলতানি ও মোগল আমলে রচিত বাংলা কাব্যে বাঙালি ও বাঙালিত্ব

মোহাম্মদ আব্দুস সবুর*

সারসংক্ষেপ: সুলতানি ও মোগল আমলে রচিত বাংলা কাব্যে বাঙালি ও বাঙালিত্ব প্রসঙ্গ বিদ্যমান। বাঙালি শব্দ দিয়ে তখন ভাষিক জনগোষ্ঠী বোঝাতো না। বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙ্গালি শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হতো। কখনও জনজাতি, কখনও মাঝিমাল্লা এমনকি খেলার নাম হিসেবে বাঙালি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙালি শব্দের নেতিবাচক অর্থের নজিরও এ সময়ের কাব্যে লক্ষণীয়। বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব এ সময়ের কাব্যের একটা উল্লেখযোগ্য দিক। আবার বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার চিত্রও এগুলোতে পাওয়া যায়। সর্বোপরি বাঙালিত্ব বিকাশে এ সময়ের কাব্যসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১. ভূমিকা

চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, নির্দিষ্ট করে বললে ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ প্রথম পুরো বঙ্গদেশকে একক শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে ব্রিটিশরা শাসন ক্ষমতা নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুলতানি ও মোগল শাসকরা বঙ্গদেশকে শাসন করেন। দীর্ঘ পাঁচ শতকে বিচিত্র বিষয় নিয়ে বাংলা কাব্য রচিত হয়। এ সময়ে একে একে রচিত হয় লৌকিক-পৌরাণিক কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, প্রণয়োপাখ্যান, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি। সুলতানদের অনেকেই কাব্যানুরাগী ছিলেন এমনকি অনেক সুলতান নিজেরাও কাব্যচর্চা করতেন। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিরা আরবি ফারসি, হিন্দি ও সংস্কৃত কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অনেকে অনুমান করেন যে, শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত *ইউসুফ জোলেখা* সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আমলে (১৩৮৯-১৪১০ খ্রি.) রচিত হয়েছে।[১] সুলতান রুকুনুদ্দীন বারবাক শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু ভাগবত অবলম্বনে *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* রচনা করেন। সময় ও সুলতানের নাম জানা না

***পিএইচডি গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।**

গেলেও যশোরাজ খান সুলতানের আনুকূল্যে *কৃষ্ণমঙ্গল* রচনা করেন। হোসেন শাহের একজন অমাত্য পরাগল খানের নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রথম *মহাভারত* অনুবাদ করেন। বাংলার বাইরে আরাকান রাজসভাতেও কবিরা রাজার আনুকূল্য পেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই কবিরা তাঁদের কাব্যে সমকালীন সমাজজীবনকে উপস্থাপন করেছেন। সেই সূত্রে কাব্যসমূহে বঙ্গ, বাঙ্গাল, বাঙালি, বাঙালিত্ব প্রসঙ্গ এসেছে। সেকালে এই শব্দগুলো আজকের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে। নেশন অর্থে বাঙালি না হলেও তখন বাংলাভাষীরা স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে সংগঠিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ জেগেছিল। এভাবে সুলতানি ও মোগল আমলে কবিরা কাব্যচর্চার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্ব বিকাশে সচেষ্ট ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাঙালি একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যের যুগ-বিভাজনে এই দুই আমল মধ্যযুগ কালপর্বের অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামে মধ্যযুগের পরিবর্তে সুলতানি ও মোগল আমল ব্যবহার করা হয়েছে। কালিক বিচারে আরাকান রাজসভায় রচিত কাব্যও এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাথমিক ও সহায়ক উৎস থেকে পাঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুলতানি ও মোগল আমলের কাব্যে বাঙালি ও বাঙালিত্ব প্রসঙ্গগুলো অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। বাঙালি জাতিসত্তার শিকড় সন্ধানে উল্লিখিত কালপর্বের কাব্যসমূহ পুনঃপুন অনুসন্ধান প্রয়োজন।

২. সুলতানি ও মোগল আমলে বাংলা কাব্যে বাঙালিত্ব

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য*কে অহমিয়া ও ওড়িয়া প্রভাবমুক্ত খাঁটি বাংলা বলে বিবেচনা করা হয়। তবে তখন ভাষার নাম বাংলা ছিল না। এখনও আঞ্চলিক ভাষাগুলোর যেমন সুনির্দিষ্ট নাম নেই। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে ভাষা নামে চিহ্নিত করতেন।[২] এ কাব্যে রাঢ়ীয় ভাষাভঙ্গির প্রভাব স্পষ্ট। কাব্যে প্রতিটি পদের রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে। এদের কয়েকটির নামে বঙ্গযোগ আছে। যেমন ভাঠিআলীরাগ, বঙ্গালরাগ, বঙ্গালবরাড়ীরাগ। *চর্যাগীতিকা*তেও বঙ্গাল রাগের উল্লেখ আছে।[৩] চৌদ্দ শতকে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের এই কাব্য লৌকিক ভাষায় লিখিত। কারো কারো মতে এটি পনেরো শতক বা তার পরের রচিত।[৪] কবি বাঁকুড়ার ছাতনা বা বীরভূমের নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ কাব্যে ঐ অঞ্চলের ভাষার প্রভাব পড়েছে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করলে তিনি অভিজাতদের স্বীকৃতি পেতেন। তা না করে তিনি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্বের প্রতি গভীর ভালোবাসা না থাকলে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে/ কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে।' অথবা 'রূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ/ মেদনী

বিদার দেই পসিআঁ লুকাওঁ।' এ ভাষা একেবারে জীবনঘনিষ্ঠ। নাটগীতি রচনা করতে তিনি সংস্কৃতের চেয়ে এই ভাষাকেই উপযুক্ত মনে করেছেন। তিনি গীতোপযোগী আখ্যান কাব্য রচনায় জয়দেবের *গীতগোবিন্দম*-এর অনুসরণ করতে পারেন কিন্তু ভাষা পরিকল্পনা তাঁর নিজস্ব।[৫]

কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*-এ বঙ্গ ও বাঙালি প্রসঙ্গ এসেছে। আত্মপরিচয় অংশে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। সংশ্লিষ্ট অংশটি নিম্নরূপ–

পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি, ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥[৬]

এ থেকে জানা যায়, পূর্ববঙ্গের বেদানুজ মহারাজার অমাত্য ছিলেন কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা। পূর্ববঙ্গে প্রমাদ দেখা দিলে নরসিংহ ওঝা পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে বসতি গড়েন। কৃত্তিবাসের সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায় না। আত্মবিবরণী থেকে পাওয়া যায়–

এগার নিবড়ে যখন বারোতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ॥
বৃস্পতিবার ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার॥[৭]

উত্তরদেশ বলতে কবি উত্তরবঙ্গ বুঝিয়েছেন। বারো বছর বয়সে কবি উত্তরবঙ্গে পড়তে যান। আর বড় গঙ্গা বলতে কবি পদ্মানদীকে বুঝিয়েছেন। পাঠ শেষ করে তরুণ বয়সে যান গৌড়েশ্বরের দরবারে–

সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর।
সিংহসম রাজা আমি করিলাম গোচর॥[৮]

কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙালি জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। এর কাহিনির বিস্তৃতি বাংলার পল্লির জনজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু মূল রামায়ণের বিস্তৃতি উত্তরভারত থেকে দক্ষিণভারত পর্যন্ত। তাঁর রামায়ণে কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম সভ্যতার আচার আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রথা-সংস্কার, খাবার-দাবার, বেশ-ভূষা, পশু-পাখির চিত্র পাই। খাদ্য তালিকার যে বর্ণনা দেওয়া আছে তা চিরায়ত বাঙালি জীবনের ছবি তুলে ধরে–

যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচুর।
যাহা নিরখিয়া মাত্র হয় মতি চুর॥
নিখুঁত নিখুঁতি সণ্ডা আর রসকরা।

দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা॥
গুরু চাকুলির রাশি লবণ ধিকরি।
গুড়পিঠে রুটি লুচি খুরমা কচুরি॥
বীর ও ক্ষীরসা লাড়ু মুগের সাউলি।
অমৃতা চিতুই পুলি নারিকেল পুলি॥
কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া।
ছানা ভাজা খাজা গজা জিলেপি পাঁপড়া॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
ভোজন করিলে সুখে রামের কটক॥[৯]

কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙালি জনজীবনের যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে বলে তা আজও সমান জনপ্রিয়। এখানে সীতাকে বাঙালি গৃহবধূরূপে দেখা যায় কোনো ক্ষত্রিয় নারী হিসেবে নয়। ঋষিপত্নীরা সীতার কাছে রামের পরিচয় জানতে চাইলে সীতা বাঙালি বধূর মতো লজ্জায় মুখ নিচু করে–

লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার॥[১০]

তুলসীদাসের রামচরিত মানসে যেমন কোশলের জীবন ফুটে উঠেছে তেমনি কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাংলার লোকজীবনের ছবি দেখতে পাই। কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে অলংকার সংগ্রহ করেছেন বাংলার লোকজীবন থেকে–

১. 'জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি'
২. 'কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে'
৩. 'কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় দুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে।'[১১]

এই মহাকাব্যের কাহিনী, চরিত্ররীতি ও ঘটনা সংস্থান বাংলার সমাজজীবনকে উপস্থাপন করেছে।

কাশীরাম দাস অনূদিত *মহাভারত*-এ সরাসরি বঙ্গ বা বাঙালি শব্দের উল্লেখ নেই তবে এতে বাঙালির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, জীবন-যাপন প্রতিফলিত হয়েছে। চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে, বিশেষ করে আনন্দ-বেদনা, ক্রোধ-অভিমান প্রকাশে কাশীরামের মহাভারতের চরিত্রগুলো বাঙালির সমধর্মী হয়ে উঠেছে। এতে মূল মহাভারতের চরিত্রগুলোর ক্ষত্রিয়সুলভ তেজ তেমন দেখা যায় না। সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার কলহের বিবরণ দেখে মনে হয় দুই বাঙালি সতীন ঝগড়া করছে। কাশীরামের মহাভারতে ভক্তিরস প্রাধান্য লাভ করেছে।

নাথসাহিত্যে বাঙাল প্রসঙ্গ এসেছে। নাথ সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি– *গোরক্ষবিজয়*, *মানিকচন্দ্র রাজার গান*, *ময়নামতীর গান*, *গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস*, *যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত*, *চোরঙ্গীনাথ*, *সাধন মাহাত্ম্য*, *যোগীর গান*, *যোগীকাচ*, *যোগচিন্তামণি*। *গোরক্ষবিজয়* গ্রন্থের গাভুর সিধাই বাংলার লোক ছিলেন। এখানে উল্লিখিত সালবান, গাভুর সিধাই-সৎমা ত্রিপুরা বা বর্তমান কুমিল্লার সঙ্গে জড়িত। মীননাথ বঙ্গদেশে সম্ভবত দক্ষিণ বঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। মাছের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। অনুমান করি, এজন্য তাঁকে ধীবর বলা হতো। সমুদ্র নিকটবর্তী অঞ্চল তাঁর বিচরণক্ষেত্র ছিল।[১২] *গোরক্ষবিজয়*-এ বঙ্গ প্রসঙ্গ এসেছে– 'গোর্ক্ষনাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন'।[১৩] *ময়নামতীর গান*-এ বঙ্গবাসীর কথা আছে। ময়নামতীর বিয়ে হয় রাজা মানিকচন্দ্রের সঙ্গে। মনের বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় রাজা দ্যাবপুরের পাঁচ যুবতীকে বিয়ে করে। এভাবে সুখে শান্তিতে বারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কী ঘটিল তা কবির ভাষায়:

আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল
এক দক্খিন দেশি বাঙ্গাল সেই রাজার দরবারত উপস্থিত হৈল।
দক্খিন হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকত্ কৈল্ল কড়ি॥
দেওআনগিরি চাকরি রাজা সেই বাঙ্গালক দিল।
দ্যাড় বুড়ি ছিল খাজনা পোন্দর গণ্ডা নিল॥
রাম লক্খন দুটা গোলা দুআরে ছান্দিল।
কাঙ্গাল দুক্খিক মারি রাজার এ ধন ছাচিল॥[১৪]

এখানে 'দক্খিন হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি' চরণটি লক্ষ করলে দেখা যায় যে বাঙ্গালদের অবস্থান দক্ষিণ দিকে আর বঙ্গে মুসলমান উপস্থিতি নিশ্চিত করে লম্বা লম্বা দাড়ি। এ বর্ণনা মতে এর রচনাকাল নিঃসন্দেহে তেরো শতকের অনেক পরে– পনেরো-ষোলো শতক হওয়া সম্ভব। শুকুর মাহমুদের কাব্য *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*-এ বঙ্গ ও গঙ্গার প্রসঙ্গ এসেছে। ১৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এ কাব্যে মানিক রাজা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

মানিকচন্দ্র রাজা ছিল [ষোল] বঙ্গের ইশ্বর।
রজত কাঞ্চন তার ছিল সপ্তবর।
শেষকালে ধনমাল রহিল পড়িয়া।
বুকে বাঁশ দিয়া রাজাক লইল বান্ধিয়া॥
মুনির আদেশে রাজাক করিল বন্ধন।
গঙ্গার কূলে লইল রাজাক করিতে দাহন॥[১৫]

বর্ণনা মতে মানিকচন্দ্র বঙ্গের রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল মৃকুল বা মেহেরকুল। কুমিল্লা জেলা গেজেটিয়ারে এ সম্পর্কে তথ্য আছে। কুমিল্লার বর্তমান ময়নামতি ও সংলগ্ন অঞ্চল ছিল মধ্যযুগে মেহেরকুল পরগনা।

সুলতানি ও মোগল আমলে রাঢ় ও গৌড় অঞ্চল ছিল রাজধানী বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ফলে এ সময়ের সাহিত্যে রাঢ় বা গৌড়ের প্রভাব লক্ষণীয়।[১৬] কবিবল্লভ রাঢ়-গৌড়ের ষোলো শতকের কবি। ঐ অঞ্চল থেকে তাঁর একটি *সত্য নারায়ণের পুথি* পাওয়া যায়। মুন্সি আবদুল করিম পুথিটি সম্পাদনা করেন। এই কাব্যে সওদাগরের নদীপথে বাণিজ্যযাত্রার কথা আছে। এরকম নৌপথে বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ *মনসা-চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*-এ দেখা যায়। নৌকায় যাত্রাপথে সওদাগর কিছু অলৌকিকতা দেখতে পায়। সে কেবল একাই অলৌকিক দৃশ্য দেখে না। সহযাত্রীরাও এসব দৃশ্য দেখে। সহযাত্রীদের মধ্যে বাঙ্গাল আছে। দৃশ্যগুলো এমন– হরিণের চামড়ায় চার ফকিরের নামাজ পড়া, কবর ভেসে যাওয়া, কবরের ওপর নানা রকম ফুল ইত্যাদি। সহযাত্রী সাক্ষী হিসেবে বাঙ্গাল উপস্থিতি কবি যেভাবে উল্লেখ করেছেন–

কর্ণধার কাণ্ডার বাঙ্গালে করে সাক্ষী।
দহের উপরে বড় বিপরীত দেখি॥
জয়পত্রে সদাগর লিখ্যা পড়্যা নিল।
বঙ্গ দুই তিন রাখি পাটন পাইল॥
কীকড়া পেলিয়া দগে রাখে মধুকর।
নাএ বস্যা বাদ্য করে গ্াঠ্যার গাবর॥[১৭]

এ অংশে বঙ্গ শব্দটি আছে। এতে অনুমান করা যায় বঙ্গের অধিবাসীদের বাঙ্গাল বলা হতো। তাদের পেশা ছিল মাঝিমাল্লাগিরি। নিরক্ষর লোককেও বাঙ্গাল বলা হতো।[১৮]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আধুনিক কাগজে লিখিত শা'বারিদ খাঁর ভণিতায় দক্ষিণ চট্টগ্রামের কুলীন পরিবারের পরিচয়জ্ঞাপক একটি পদবন্ধ পেয়েছিলেন। তা এরূপ–

আদ্য সৃষ্টি কহি জান শুন উপদেশ।
ভাটি মধ্যে বাইশ বাঙ্গালা চাটিগাঁ প্রধান দেশ॥

উদ্ধৃতাংশের মর্ম এই যে একসময় পূর্ববঙ্গ ও আসামের কতকাংশ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। ভাটির অন্যতম 'বাঙ্গালা' চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান পরগনা ছিল।[১৯]

মনসামঙ্গল কাব্য-এর রচয়িতাদের মধ্যে নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত; তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল এবং বিষ্ণুপাল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ধারার কাব্যে সাধারণত চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় বাঙ্গাল ও বিশেষ লাঠিধারী হিসেবে বাঙালির উল্লেখ আছে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে বাঙ্গালের উল্লেখ নেই। তবে বাঙালি জীবনের চালচিত্র আছে। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের নানা দিক এখানে পাওয়া যায়।[২০] বাঙালির প্রিয় খাদ্য মাছের অনেক রেসিপির উল্লেখ আছে–

ছোট ছোট চেঙ্গ মৎস্যের ফালাইয়া মুড়।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক নন্দন বারির থোড়॥
বড় বড় ইচা মৎস্যের ফেলাইয়া তালু।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক সঙ্কচুর আলু॥
বড় বড় টাইন মৎস্য দেখিতে বড় ভাল।
কত করে ভাজা ভোজা কত করে ঝোল॥
বড় কই মৎস্য করিয়া ভাগ ভাগে।
তাহা রান্ধিল লাউ আলু কচুর লগে॥
চেঙ্গ পোড়া দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বউল।
কলার মূল দিয়া রান্ধে পীপলিয়া সউল॥

নারায়ণদেবের কাব্যেও বাঙ্গাল শব্দের উল্লেখ সরাসরি নেই। তাঁর কাব্যে বস্ত্র ও অলংকারের যে বর্ণনা পাই, তা বাঙালির–

মলিন যে বস্ত্র পরি স্রবনে পিতলের করি
ভেলুয়া ছন্দে বাঁধিলেক কেস।
দুই ছরা কাইমের কাটি পরিলেক বাহুটি
পিতলের খারু পরিলেক হাতে।[২১]

৩. আরাকান রাজসভায় রচিত কাব্যে বাঙালিত্ব

বঙ্গীয়দের সঙ্গে উত্তরভারত ও দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক ছিল। প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে থাকতো। তেরো শতকের শুরুতে এ দেশে তুর্কি আফগানদের আগমন ঘটে। এরপর আরব অঞ্চল, আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়া থেকে ভাগ্যান্বেষী মানুষ এদেশে আসতে থাকেন। উত্তরভারতের প্রাথমিক বিবাদ সমন্বয়ের পর এদের অনেকে বাংলায় স্থায়ী হয়। তারা বাংলার ভাষা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। আসাম বা কামরূপ, ত্রিপুরা, ব্রহ্মদেশের প্রান্তিক অঞ্চলেও এর প্রভাব পড়ে। ইতোমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে অরাজকতা দেখা দেয়। প্রথমে মগরা শুরু করে পরবর্তীকালে মগদের সঙ্গে পর্তুগিজরা যোগ দেয় যারা হার্মাদ নামে কুখ্যাত ছিল। এ কারণে বাংলায় অরাজকতা বোঝাতে মগের মুল্লুক প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সতেরো শতকে শুরুতে বঙ্গীয় আলাওল হার্মাদদের কবলে পড়ে আরাকানে যান। বাংলার নিকটবর্তী বার্মা বা মায়ানমারের রাজ্যটির নাম আরাকান। দশম শতকে চট্টগ্রামের কিছু অংশ আরাকানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন সেখানে অনেক বাঙালি চাকরি বা ব্যবসার জন্য বসতি স্থাপন করে। ফলে সেখানে একটা বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজধানী স্থাপিত হয় ম্রোহঙ্-এ এবং তা ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। বাংলাভাষীরা ম্রোহঙ্কে বলতো রোসাঙ্গ।

আরাকান রাজ্য এক সময় গৌড়ের আনুকূল্য পেয়েছে। এ কারণে অনেক রাজা মুসলিম নাম গ্রহণ করেছে। রাজারা গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেক মুসলমানদের নিয়োগ দিয়েছে। বাঙালিরা আরাকান রাজাদের উৎসাহে বাংলা ভাষা চর্চা করেছে।[২২] আরাকান রাজসভার কবিরা ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম বাংলায় অনুবাদ করেন। এর আগ পর্যন্ত বঙ্গবাসীরা কেবল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বা ভাবানুবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিল। এর ফলে বাংলা ভাষায় *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ভগবত* ও *পুরাণ* ইত্যাদি গ্রন্থের আগমন ঘটে। আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভার কবিরা দেখলেন কেবল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করলে বাংলা ভাষার যথাযথ সমৃদ্ধি হবে না। তাই তাঁরা ভারতের অন্যান্য ভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করার উদ্যোগ নিলেন। এ ব্যাপারে কবি দৌলত কাজী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ১৬২২ থেকে ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *সতী ময়না* রচনা করেন। এটা গোহারি দেশের *ঠেঠ* হিন্দি ভাষায় রচিত *সাধন* নামক কাব্যের ভাবানুবাদ।[২৩] কবি তাঁর কাব্যের ভূমিকায় এ বিষয়ে লিখেছেন–

শ্রীযুত আসরফ অমাত্য প্রধান॥
---- --- ----
কহেন্ত সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে।
--- --- --- ---
আরবী, ফার্ছি, নানা তত্ত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ॥
গুজ্রাতী, গোহারী, *ঠেঠ*, ভাষা বহুতর।
সহজে মহত সভা আনন্দ নিয়র॥
শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি।
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী॥
--- --- --- ---
ঠেঠা চৌপাইয়া দোহা কহিল সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে॥
দেশী ভাষে কহ তাক পঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে বুঝিয়া যেন পড়এ সানন্দে॥
তবে কাজী দৌলত বুঝি সে আরতি।
পঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী॥[২৪]

কবি দৌলত কাজীর দেখানো পথ পরবর্তী কবিরা অনুসরণ করলেন। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আলাওল হিন্দি কাব্য *পদুমাবৎ* বাংলায় *পদ্মাবতী* নামে অনুবাদ করে কবিজীবন শুরু করেন। ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *পদ্মাবতী* কাব্যের স্তুতি খণ্ডে বিভিন্ন

জাতি গোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কে লেখেন।[২৫] এই অংশের নাম 'রোসাঙ্গরাজ প্রশস্তি'। সমৃদ্ধ নগরীতে জনবসতি গড়ে ওঠে তার উদাহরণ পাওয়া যায় কাব্যের এই অংশে–

নানা দেশী নানা লোক শুনিয়া রোঙ্গ ভোগ
আইসন্ত নৃপছায়া তল।
আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রূমী
খোরাসানী উজবেকী সকল॥
লাহোরী মুলতানী হিন্দী কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী
কামরূপী আর বঙ্গদেশী
ভূপালী কুদংসরী কান্নাই মনল আবারি
আচি কুচি কর্ণাটকবাসী॥[২৬]

৪. সুলতানি ও মোগল আমলে রচিত কাব্যে বঙ্গ প্রসঙ্গ

ষোলো শতকের পরে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের ভাববিপ্লব শুরু হয়। বৈষ্ণবধর্ম হিসেবে পরিচিতি পায় তাঁর মতাদর্শ। ব্রাহ্মণ্যধর্মে তিনি প্রেমধর্ম যোগ করেন। যার ফলে বর্ণবিভাজিত সমাজে সমন্বয়ের ফলে জাগরণ ঘটে। তাঁর জীবন ও মতাদর্শ কেন্দ্র করে জীবনীসাহিত্যের ধারা শুরু হয়। বৃন্দাবন দাস এ ধারা শুরু করেন। তাঁর রচিত *চৈতন্যভাগবত*-এ বঙ্গদেশ প্রসঙ্গ এসেছে। শ্রীচৈতন্য মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বিদেশ তথা বঙ্গদেশ যাচ্ছেন। কাব্যে আছে– '... চলিলেন বঙ্গদেশ হরষিত হৈয়া'।[২৭] শ্রীচৈতন্য শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে পদ্মাবতী বা পদ্মা নদীর তীরে এসেছিলেন। এ থেকে বুঝতে সুবিধা হয় যে পদ্মার তীরেই বঙ্গদেশ অবস্থিত। কাব্যে আছে–

বঙ্গদেশে মহাপ্রভু করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥[২৮]

অন্যত্র–

হাসি প্রভু সবা প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কতদিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও সর্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন করে স্ত্রী পুরুষে॥[২৯]

জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* কাব্যেও শ্রীচৈতন্যের বঙ্গদেশে আগমনের কথা আছে। তবে এখানে প্রসঙ্গ ভিন্ন। জয়ানন্দ দেখিয়েছেন যে শ্রীচৈতন্যদেব বিয়ে করেছেন, সংসার চালাতে অর্থের প্রয়োজন। তাই তিনি পরিচিত জনদের বললেন–

অর্থ উপার্জন বিনে সংসার না চলে।
বঙ্গদেশে যাই আমি অর্থের ছলে॥[৩০]

স্ত্রীকে সব বুঝিয়ে দিয়ে চৈতন্য বঙ্গযাত্রা করলেন। কবির ভাষায়–

এই উপদেশ কহি গেলা বঙ্গদেশে।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতেরে কহিআ বিশেষে॥
বঙ্গদেশে জত বৈসে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
সর্ব্বলোক করাইল ব্রাহ্মণভোজন॥
পদ্মাবতী নামে নদী আছে বঙ্গদেশে।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী বৈশ্য শুদ্র তার তীরে বৈসে॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে জত বঙ্গদেশের লোক।
যুবতী যুবক সভার নাঞিখ রোগ শোক॥
নিরবধি কীর্ত্তন আনন্দময় বঙ্গ।
গৌরচন্দ্র বিনা কার নাঞিখ প্রসঙ্গ॥
পদ্মবতী স্নান করি পারিষদ সঙ্গে।
পদ্মাবতী তীরে গৌরচন্দ্র রহিল রঙ্গে॥
বঙ্গ পায়্যা নবদ্বীপ পাসরণ হৈলা।
অশেষ অমূল্য ধন বঙ্গেতে অর্জ্জিলা॥[৩১]

কাব্যের এই অংশ থেকে বঙ্গের অবস্থান জানা যায়। পদ্মাবতী বা পদ্মা নদীর তীরে ছিল বঙ্গের অবস্থান। ধর্মমঙ্গলে পদ্মানদী পার হয়ে একটি চরিত্র কামরূপে যায়– 'পার হয়ে পদ্মাবতী পিছে রাখি গৌড়ে।'[৩২] বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা যে ভালো ছিল তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে শ্রীচৈতন্য প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। লোচন দাস ষোলো শতকের কবি ছিলেন। তাঁর রচিত *চৈতন্যমঙ্গল* কাব্যেও শ্রীচৈতন্যের বঙ্গ গমনের চিত্র পাওয়া যায়–

একদিন প্রভু কহিলেন আচম্বিতে
পূর্ব্বদেশ যাব আমি সর্ব্বলোক হিতে॥
পাণ্ডববর্জিত দেশ সর্ব্বলোকে গায়।
গঙ্গা হঞা গঙ্গা নহে এই শিক্ষা তায়॥
আমার পরশে পদ্মাবতী হবে ধন্য।
সর্ব্বজন আমা বহি না জানিবে অন্য॥
ঐছন যুগতি প্রভু মনে অনুমানে।
মায়েরে কহিল যাব ধন উপার্জ্জনে॥[৩৩]

সতেরো শতকের গোড়ায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যেও চৈতন্যদেবের বঙ্গে আগমনের প্রসঙ্গ এসেছে। এ কাব্যে বৈষ্ণবদর্শনের গূঢ় আলোচনা আছে। আছে বৈষ্ণব ধর্মমত প্রচারের কথা। প্রাসঙ্গিকভাবে বঙ্গে এসে অর্থ উপার্জনের কথা এসেছে–

সর্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয় ভঙ্গিয়ে কারো দুঃখ নাহি হয়॥

বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জল কেলি করে নানা রঙ্গে॥
কথোদিনে কৈল প্রভু বঙ্গকে গমন।
যাহা যায় তাহা লওয়ায় নাম সংকীর্তন॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে।
সহস্র পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে॥
এই মতে বঙ্গে কৈল লোকের বহু হিত।
নাম দিঞা ভক্ত কৈল পঢ়াঞা পণ্ডিত॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে বিহ্বলা॥[৩৪]

মঙ্গলকাব্য ধারায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলো রাঢ়ে ও গৌড়ের আবহে রচিত। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে বঙ্গের উল্লেখ আছে। কবি মানসিংহ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গৌড়, বঙ্গ উৎকল ইত্যাদি অঞ্চলসমূহকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন–

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল মহীপ[৩৫]

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বঙ্গ বা বাঙ্গালা প্রসঙ্গ আছে। 'রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন' অংশে প্রতাপাদিত্যকে বঙ্গজ কায়স্থ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

যশোর নগর ধাম প্রতাপআদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।[৩৬]

রাঢ় ও গৌড়ের পার্থক্য বোঝা যায় বিদ্যা ও সুন্দরের সাক্ষাতের সময়। পাতশার বঙ্গবাসীকে বাঙ্গালি হিসেবে সম্বোধন করেছেন– 'বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে। পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে॥'[৩৭] বঙ্গদেশে বর্গিদের অত্যাচার প্রসঙ্গে লিখেছেন– 'লুঠি বাঙ্গলার লোকে করিল কাঙ্গাল।'[৩৮] মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমনের পর ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। এ প্রসঙ্গে কবি লেখেন–

মানসিংহ বাংলার যত যত সমাচার
মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।[৩৯]

মানসিংহের বাংলায় আগমন সম্পর্কে কবি বলেছেন–

বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥[৪০]

কাব্যের অন্যত্র জাহাঙ্গীর মানসিংহের কাছে বঙ্গদেশের বিবরণ জানতে চান। এ প্রসঙ্গে কবি লেখেন–

কহ মানসিংহ রায় গিয়াছিলে বাঙ্গালায়
কেমন দেখিলা সেই দেশ।[৪১]

ধর্মমঙ্গল-এর রচয়িতা নরসিংহ বসু তাঁর *পাঁচালী*তে আত্মকথা লিখেছেন। তিনি ছিলেন আঠারো শতকের কবি। আত্মকথার সাথে সমকালীন কিছু প্রসঙ্গ এতে ফুটে উঠেছে। কবি বাল্যকালে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর পিতামহী তাঁকে বাংলা, পারসি, উড়িয়া এমনকি হিন্দুস্তানি শিখিয়েছিলেন। কবি জীবিকার জন্য নানা দেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত বীরভূমে থিতু হয়েছিলেন। কবির ভাষায়–

বাঙ্গলার বীরভূমি বিখ্যাত অবনী
শ্রীআসাফুল্লা খান রাজা শিরোমণি।
প্রবল প্রতাপ ভূপ সমওে প্রচণ্ড
সবদেশে যশ গায় রাজা ঝারিখণ্ড।[৪২]

৫. জনজাতিভিন্ন অন্য অর্থে বাঙালি প্রসঙ্গ

মানিক দত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে বাঙালি প্রসঙ্গ এসেছে। মানিক দত্তের কাব্যের রচনাকাল ১৪৫০খ্রি. থেকে ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় বলে অনুমান করা হয়।[৪৩] কাব্যে আছে– কালকেতু গুজরাট নগর নির্মাণের পর বিক্ষুব্ধ কলিঙ্গরাজ তা আক্রমণ করে। কালকেতুর রাজ্যটি আধুনিক নগররাষ্ট্রের আদলে নির্মাণ করা হয়েছিল। নগরে প্রবেশের চারটি রাস্তা। কলিঙ্গরাজের বাহিনী চার রাস্তা দিয়ে আক্রমণ করে। প্রথমে তারা পূর্বদিকে আক্রমণ করে। কবির ভাষায়–

পূর্ব্বদ্বার জাগে বাঙ্গালি নস্কর
তার সঙ্গে বাজি গেল বিষম ঝগড়া॥
কাটাকাটি মারামারি হৈল ঘোরতর।
থানা ছাড়ি পালাইল কালুর নস্কর॥[৪৪]
এরপর উত্তর ও পশ্চিম দুয়ারে আক্রমণ করে–
দুয়ারে রহিয়া পাইক বাহির দিকে চাএ।
আর কত২ পাইক বাঙ্গালি খেলাএ॥[৪৫]

এরপর আক্রান্ত হয় দক্ষিণ দিক–

দক্ষিণ দ্বারে জাগে বাঙালি মগর।
তার সঙ্গে বজিল বিষম ঝগর॥
কাক মারে কাক কাটে কেহু হৈল তল।
দ্বার ছাড়িয় পালাএ কালুর নঙ্কর॥[৪৬]

মানিক দত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে বাঙালি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা পরিষ্কার জানা যায় না। এখানে বাঙালি জনজাতি নাকি অন্য কোনো নির্দিষ্ট পেশাজীবী, তা নিশ্চিত নয়। *চণ্ডীমঙ্গল* ও *মনসামঙ্গল* কাব্যে মাঝিদের বাঙ্গাল বলে সম্বোধনের উল্লেখ আছে। নমশুদ্র ও রাজবংশক্ষত্রিয় জাতির রয়েছে বাঙ্গাল পদবি। বাঙ্গাল শব্দটি সে সময়ে কিছুটা ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হতো। পূর্ববঙ্গবাসীদের সাধারণভাবে বাঙ্গাল বলা হতো।

পনেরো শতকের শেষ দশকে রাঢ়ের কবি কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র *বাশুলীমঙ্গল* বা *বিশাললোচনীর গীত* রচনা করেন। তাঁর কাব্যে বাঙ্গাল প্রসঙ্গ এসেছে–

নায়ের গাবর যত জল জল চাহে।
জীবনে কাতর নব বাঙ্গাল পলায়ে॥
পথে লাগ পাইয়া কেহ কারে মারেন কিল।
না মারে চরণে পড়োঁ হও ধর্ম্মশীল॥
সানন্দা আনন্দা গৌরীবর তিন ভাই।
আর যত বাঙ্গাল রহিল ঠাই ঠাই॥
একত্র হইয়া কান্দে পাঁচ সাত জনে।
রমানাথে রক্ষ দেবী কবিচন্দ্র ভনে॥[৪৭]

ষোলো শতকে দ্বিজ মাধব রচনা করেন *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*। গৌড়ের অধিবাসী হলেও তিনি পূর্ববঙ্গে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কাব্যের একটি মুদ্রিত ও বিশটি পুথির সবগুলো পূর্ববঙ্গে পাওয়া গেছে। এ কাব্য থেকে জানা যায়– ভাঁড়ুদত্তের উস্কানিতে কলিঙ্গরাজ কালকেতুর গুজরাট নগর আক্রমণ করে এবং কালকেতুর সৈনিকেরা পরাজিত হয়–

গড় লঙ্ঘি রাজার পাইক উঠিল নগরে।
চারিদিকে উঠিলেক নৃপতির দলে॥
যথেক বাঙ্গাল পাইক ভয় পাইয়া মনে।
পিন্ধন্ত বাস খসিলেক কেশ খসে রণে॥
পলায় কৈবর্ত্ত পাইক মনে পাইয়া ভয়ে।
বাঁশ ফেলাইয়া বনে লুকাইয়া রহে॥[৪৮]

এখানে বাঙ্গাল প্রসঙ্গ এসেছে। তবে এখানে বাঙ্গালদের বেশ নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে। এ পর্বে *চণ্ডীমঙ্গল* ও *মনসামঙ্গল* কাব্যে বাঙ্গাল প্রসঙ্গ এসেছে কৌতুককর চরিত্র হিসেবে।[৪৯] বাঙ্গালদের অসহায়ত্ব, দুঃখ-দুর্দশা, ভাষিক ব্যবহার ইত্যাদি দেখে শ্রোতারা আনন্দ পেতো। কাব্যের একাধিক স্থানে মুকুন্দ মিশ্র বাঙ্গালদের নিয়ে লিখেছেন। তিনি 'বাঙ্গাল মাঝিদের ক্রন্দন' নামে বিশেষ একটি অংশ জুড়ে দিয়েছেন–

কাঁদেরে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাফই।
কুখনে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥

কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই পেলাইয়া সোনা।
হেট মাথা করি রহে কাকতলি মনা॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই গায় নাহি বল।
আমার জীবনধন এড় রে হিন্দল॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই মিথ্যা কেন দ্বন্দ্ব।
পুরুষ সাতের মুঞি হারাল কামন্দ॥[৫০]

দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে দেবীর ইচ্ছায় ধনপতি ঝড়ের কবলে পড়ে তার ছয়টি ডিঙ্গা হারায়। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন–

বাপৈ বাপৈ কান্দে বাঙ্গাল ভাইয়া রে।
আর কি লইয়া যাইব পাটনে রে॥[৫১]

এখানে লক্ষণীয় যে মুকুন্দ মিশ্রের কাব্যে বাঙ্গাল ও মাঝি আলাদা হলেও দ্বিজ মাধবের কাব্যে বাঙ্গালের জাতি পরিচয় অনুল্লিখিত, মাঝি মাল্লা হিসেবে চিহ্নিত। বাঙ্গালদের মাঝি হিসেবে হিসেবে দেখানো হয়েছে প্রায় সব মনসামঙ্গল কাব্যে। ফলে মধ্যযুগের কাব্যে বাঙ্গাল ও মাঝি প্রায় অভিন্নার্থক হয়ে ওঠে।[৫২]

বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গল কাব্য *মনসা-বিজয়* রচনা করেন। তিনি পনেরো শতকের কবি ছিলেন। এই কাব্যে বিভিন্ন জাতির উল্লেখ আছে যেমন তুড়ক, যবন, মোঙ্গল ও পাঠান জাতি। এতে বাঙ্গাল প্রসঙ্গ নেই। তবে বাঙ্গালি শব্দটি আছে–

শৃঙ্গ সারি মনোরথ মারিবারে জায়
লাফে লাফে বুলি ব্যাঘ্র বাঙ্গালি খেলায়।[৫৩]

এখানে উল্লিখিত বাঙ্গালি শব্দটি কুস্তি খেলার সমার্থক বলে সুকুমার সেন মত দিয়েছেন। এ পর্যন্ত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের *মনসামঙ্গল*-এর চারটি পুথি পাওয়া গেছে। সবগুলো পুথি চব্বিশ পরগনার বারাসাতের কাছাকাছি অবস্থিত ছোট জাগুলিয়া থেকে পাওয়া যায়। দুটি পরিবারের কাছে এগুলো সংগৃহীত ছিল। এ কাব্যে বাঙ্গালি শব্দটি এসেছে কুস্তি হিসেবে।[৫৪]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রাঢ়ের বাসিন্দা। তিনি সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাব্যটি রচনা করেন। এ কাব্যে মাঝি মাল্লা সূত্রে বাঙালি প্রসঙ্গ এসেছে–

কান্দয়ে বাঙ্গাল হইনু কাঙ্গাল
ভেসে গেল পোস্তের হোলা।
বিপদ সাগরে জলের উপরে
ভেসে গেল পোস্তের হোলা॥[৫৫]

কাব্যে অন্যত্র বাঙ্গাল প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে বাঙ্গালকে কৌতুককর চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে যা এর আগে *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*-এও লক্ষ করা গেছে। সম্পাদক এখানে বাঙ্গাল শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করে তা স্পষ্ট করেননি।

জগজ্জীবন ঘোষালের *মনসামঙ্গল কাব্য*-এ বরেন্দ্র জনজীবনের কথা পাওয়া যায়। এ কাব্যটি সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত বলে মনে করা হয়। তাঁর কাব্যেও মাঝি মাল্লা প্রসঙ্গে বাঙ্গাল প্রসঙ্গ এসেছে। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় বাঙ্গালের কাতরতা কৌতুকপূর্ণ ঢঙে প্রকাশিত হয়েছে–

সদাগর কান্দে তবে মাথে হাত দিয়া।
বাঙ্গাল সব কান্দে নৌকাতে পড়িয়া॥
হায় হায় করিয়া বাঙ্গাল করে আত্মঘাতী।
আর না দেখিব আমরা আপনা বসতি॥[৫৬]

মঙ্গলকাব্যের প্রায় সমকালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ গীতিকা গীত হতো। পূর্ববঙ্গ গীতিকার বারতীর্থের পালায় আছে–

বোঙ্গদেশে জোঙ্গল রে ভাই নইসরাবাজের জেলা।
জয়ানসাইয়ের গড়ে বইস্যাছে বারতীর্থের মেলা॥[৫৭]

উল্লিখিত গীতিকায় বাঙ্গাল্যা শব্দটি 'হাতি খেদার গান' পালায় পাওয়া যায়। শব্দটি জুম্ম জনজাতির সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে–

জুম্মার জোম হৈলরে নাশ বাঙ্গাল্যার ক্ষেতি।
পূগের পাহাড়ে আইলো ঝাঁকে ঝাঁকে হাতী॥[৫৮]

উল্লিখিত কাব্যসমূহে বাঙালদের প্রসঙ্গ নেতিবাচকভাবে উল্লিখিত হলেও বাঙালদের সাহসিকতারও অনেক নজির আছে। এ অঞ্চলে ভীম, দিব্যক, ঈসা খান, চাঁদ রায় প্রমুখ বীরেরা অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। বঙ্গবাসী প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রযাত্রায় নির্ভীক। মহাকবি কালিদাস বঙ্গবাসীদের নৌবিদ্যায় দক্ষ বলে মত দিয়েছেন। তারা একসময় সুমাত্রা, জাভা, বালিদ্বীপ, কম্বোডিয়া ও বোর্নিও পর্যন্ত সাগর পাড়ি দিত। কবিকঙ্কন প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে ধনপতি সদাগরের মাঝি মাল্লাদের বঙ্গবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলার প্রভাব আছে। সেখানে বাংলার উপকথা এখনও প্রচলিত আছে। জাভার বরবুদুরের স্থাপত্যের সঙ্গে পাহাড়পুর বিহারের মিল আছে। এসব কিছু বঙ্গবাসীদের সমুদ্রযাত্রার পারদর্শিতাই প্রমাণ করে।[৫৯]

৬. বাংলা ভাষা চর্চা

মধ্যযুগের অনেক কবি ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্যকে পাঠকের কাছে বোধগম্য করার জন্য আরবি-ফার্সি উৎস থেকে অনুবাদ করেছেন। এ কাজ তখন মুসলমান সমাজে পাপ হিসেবে গণ্য হতো। পাপী হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে সেসময় মুসলমান কবিরা আরবি ফার্সি থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে রচিত শেখ মুত্তলিবের *কিফায়িতুল মুসল্লীন* গ্রন্থে উক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়–

আরবীতে সকলে না বুঝে মন্দ।
তেকারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ॥
মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলু।
এই পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু।[৬০]

চট্টগ্রামের কবি বদিউদ্দিন তাঁর *ছিফতে ঈমান* গ্রন্থে বলেছেন–

দিন ইসলামের কথা শুন দিয়া মন।
দেশী ভাষে রচিলে বুঝিব সর্বজন॥

নসরুল্লা খান তাঁর *মুসার সওয়াল* নামক ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ বাংলায় রচনা করেছেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন–

বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিতাবের বাণী।
আপনে বুঝন্ত যদি বাঙ্গালের গণ।
ইচ্ছা সুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন।[৬১]

সতেরো শতকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে কবি আব্দুল হাকিমের রচনায় প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনা স্ফুট হয়। সমকালীন একশ্রেণির মুসলমানের বাংলা ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখে কবি মর্মাহত হন। এর প্রতিক্রিয়ায় কবি লেখেন–

জে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে-সব কাহার জন্ম নির্ণএ ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা জার মনে ন জুয়াএ।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন জায়॥
মাতাপিতামহক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মন হিত অতি॥[৬২]

বাংলাবিদ্বেষী ঐ মুসলমান শ্রেণি মনে করে যে বাংলা হিন্দুর ভাষা তাই তাদের এই ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। এর প্রতিক্রিয়ায় কবি ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে লেখেন–

জেই দেশে জেই বাক্যে কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন॥
সর্ব বাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশি বাক্য কিবা জত ইতি বাণী॥
... ...
সর্ব বাক্য বুঝে প্রভু বুঝে সর্ব কথা।
প্রভু আগে ভেদাভেদ নাইক সর্বথা॥
মারফত ভেদে জার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সেসবেরগণ॥[৬৩]

এ কবিতার লক্ষণীয় বিষয় হলো, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে মিশে গেছে। প্রথমত, কবি দেশি ভাষা-বিদ্বেষীদের জন্ম পরিচয় নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তাদের দেশ ত্যাগের কথা বলেছেন। তৃতীয়ত, তিনি 'নিরঞ্জন'কে সব ধর্মের, সব মতের ঈশ্বর বা সর্বজ্ঞ বলে প্রচার করেছেন। এ থেকে মনে করা সঙ্গত যে, তিনি একাধারে যেমন বাঙালি ছিলেন তেমনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তিনি সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলকে 'বঙ্গদেশ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর আগে এমন অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও দেশপ্রেম বাংলা কবিতায় দেখা যায়নি। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিশ শতকে বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটায়।[৬৪]

জাতিগঠনের কাজে সতেরো শতকের আরেক কবি সৈয়দ সুলতানের ভূমিকা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি সুফি ভাবধারার পির ছিলেন। পৃথিবীতে এমন জাতি নেই যাদের কাছে নিজ ভাষাভাষী নবী প্রেরণ করা হয়নি– কোরানে উদ্ধৃত এই বাণীকে কবি সুলতান ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর *রসুল চরিত* কাব্যের 'কবির নিবেদন' অংশে কাব্যটি বাংলায় রচনার কারণ জানিয়েছেন–

বঙ্গদেশে সকলেরে কিরূপ বুঝাইব।
বাখানি আরব ভাষা এ বুঝাইতে নারিব॥
যারে যেই ভাষে প্রভু করিছে সৃজন।
সেই ভাষ তাহার অমূল্য সে ধন॥[৬৫]

পূর্ববর্তী শতকের ধারাবাহিকতায় আঠারো শতকের কবি রামনিধি গুপ্ত বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন–

নানান্ দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু, ঘুচে কি তৃষা?[৬৬]

আঠারো শতকে অনেক কাব্য রচিত হওয়ায় বাংলা ভাষার দিগন্ত বিস্তৃত হয়। এর আগে রাজভাষা ফারসির প্রতি বাংলাভাষী এক শ্রেণির কবিদের অনুরাগ ছিল। এ নিয়ে সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিম বিষোদগার করেছিলেন যা আগেই উল্লেখ করেছি। আঠারো শতকে ফার্সি, হিন্দি, উর্দু ভাষার প্রভাবে দোভাষী পুথির ভাষা ও কাব্যরীতির সূচনা হয়। *অন্নদামঙ্গল কাব্য*-এর ৩য় ও শেষ খণ্ডে দিল্লিতে মানসিংহ ও ভবানন্দের কথোপকথন অংশে আরবি-ফারসি-হিন্দুস্তানি মিশ্রিত বাংলার ব্যবহার আছে। এ ধরনের ভাষা ব্যবহারের আগে ভারতচন্দ্র পাঠকের কাছে যুক্তি দেন–

উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী।
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারী॥
না রবে প্রসাদগুণ না রবে রসাল॥
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগন গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে॥[৬৭]

ভারতচন্দ্রের এ তত্ত্ব সত্ত্বেও আঠারো শতকে বিশুদ্ধ বাংলার চর্চা অব্যাহত থাকে। এ ঘটনা জাতির ইতিহাসে একটি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে। রাজনৈতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক দুর্দশাও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যেও বাংলার মানুষ বাংলা ভাষার মাধ্যমে স্বীয় ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। দোভাষী পুথির কাব্যরীতি ও ভারতচন্দ্রের কাব্যতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত টিকেনি। এক্ষেত্রে আঠারো শতকে বাংলা ভাষানুরাগী কবিদের অবদান অপরিসীম। তাঁদের অমন প্রচেষ্টা বাংলা ভাষার ভিত্তিকে মজবুত করেছে যা প্রকারান্তরে বাঙালি জাতিসত্তার ভিত রচনায় সাহায্য করেছে।[৬৮]

৭. উপসংহার

সুলতানি ও মোগল আমলে রচিত বাংলা কাব্যে বাঙালি ও বাঙালিত্ব প্রসঙ্গ নানা জায়গায় এসেছে। তবে এ বাঙালি শব্দ দিয়ে সবসময় জাতিবাচকতা বোঝায়নি। মূলত আঠারো শতকের আগে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হিসেবে বাঙ্গালি বা বাঙ্গালী শব্দের ব্যবহার সাহিত্যে দেখা যায় না। তপনরায় চৌধুরীর মনে করেন, ভারতচন্দ্রের আগে বঙ্গের অধিবাসী অর্থে বাঙালি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু আহমদ শরীফের মতে, ১৫৮৪ সালের দিকে লেখা সৈয়দ সুলতানের রচনায় বাঙালি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়– 'কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙালী উৎপন/ না বুঝে বাঙালী সবে আরবী বচন॥' *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*-এ যে 'বাঙ্গালী' শব্দের দৃষ্টান্ত

দেওয়া আছে তা ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে– 'বাঙ্গালী গোঁয়ার ভয় নাহি তিলেক। মারিয়া আমার ঘর খেদায়ে দিলেক॥'[৬৯] বঙ্গভাষা ব্যবহার করে বলে বাঙালি এটাও এ সময়ের কাব্য পাঠ করে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কোথাও কোথাও বাঙ্গালি শব্দ দিয়ে মাঝি মাল্লা বোঝানো হয়েছে। কখনও কখনও নৌপথে বা গভীর সমুদ্রযাত্রায় পারদর্শী হিসেবে দেখানো হয়েছে। আবার কখনও নিম্নজাতের অর্থেও বাঙ্গাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে বাঙ্গাল শব্দের বিশেষণ অর্থে একগুঁয়ে এবং বিশেষ্য অর্থে পূর্ববঙ্গবাসী হিসেবে উল্লিখিত। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য*-এ রাগের নাম হিসেবেও বাঙ্গালি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। চৌদ্দ শতকে এসে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বঙ্গ বিজয়ের পর নিজেকে শাহে বাঙ্গালিয়ান বলে ঘোষণা করেন। ধারণা করা হয়, তখন থেকে বঙ্গের অধিবাসী হিসেবে বাঙ্গাল শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। এ ধারণা জোরালো হয় যখন নূর কুতুবে আলম নিজেকে 'আলম বাঙালি' বলে পরিচয় দেন। এর পর ভারতচন্দ্র গোটা বাংলার অধিবাসী হিসেবে বাঙালি শব্দের উল্লেখ করেন।[৭০] মধ্যযুগের প্রতিকূল সময়ে কবিরা বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করে নিজেদের বাঙালিত্বের প্রমাণ রেখেছেন। পাপ ও নরকের ভয় অগ্রাহ্য করে সংস্কৃত, আরবি ও অন্যান্য ভাষা থেকে ধর্মীয় গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া এখনকার মতো তখনও বাংলা ভাষার প্রতি কিছু স্বদেশির বিরূপ মনোভাব ছিল। এদের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের কবিরা সোচ্চার ছিলেন। ভাষার প্রতি মধ্যযুগের কবিদের নিবেদন ও ভালোবাসা পরবর্তীকালেও বহমান ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে বাঙালি একটা ভাষিক জাতিগোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

তথ্যসূত্র

১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯) পৃ. ১৪১
২. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, ২০১৬) পৃ. ২৩
৩. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯) পৃ. ১২৪-১২৫
৪. আহমদ শরীফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০১-২০২
৫. ওয়াকিল আহমদ, 'প্রধান অতিথির ভাষণ', মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙালীর বাংলাভাষা চিন্তা* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১৯) পৃ. ১২-১৩।
৬. তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, *আদি-মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৫) পৃ. ৪৯০।
৭. *ঐ*, পৃ. ৪৯১
৮. *ঐ*, পৃ. ৪৯১

৯. *ঐ*, পৃ. ৫১২
১০. *ঐ*, পৃ. ৫১১।
১১. *ঐ*, পৃ. ৫১১।
১২. পঞ্চানন মণ্ডল (সম্পা), *গোর্খ-বিজয়* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬) ভূমিকা
১৩. *ঐ*, পৃ. ১৩
১৪. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (সংকলক), দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় (সম্পা.), *গোপীচন্দ্রের গান* (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২) পৃ. ৩
১৫. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পা.), *কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪) পৃ. ২০
১৬. মুহম্মদ এনামুল হক, 'মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য', মুহম্মদ আব্দুল হাই (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০*, (ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০২০) পৃ. ৬৪-৬৫
১৭. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (সম্পা.) *শ্রীকবিবল্লভ বিরচিত সত্যনারায়ণের পুথি* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ১৯১৫) পৃ. ৩
১৮. *ঐ*, পৃ. ৭
১৯. আহমদ শরীফ, (সম্পা.), *শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৬) পৃ. খ
২০. তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫৭-৬৫৮
২১. *ঐ*, পৃ. ৬৫৮
২২. সিরাজ সালেকীন, *কবিতায় নৃগোষ্ঠী মূলত কেন্দ্র থেকে দেখা* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ,২০২০) পৃ. ৫১-৫২
২৩. আবদুল করিম ও মুহম্মদ এনামুল হক, *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* (ঢাকা: আকাশ, ২০১৯) পৃ. ৯৫-৯৬
২৪. মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ (সম্পা.), *দৌলত কাজীর সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৩) পৃ. ৩
২৫. আবদুল করিম ও মুহম্মদ এনামুল হক, *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* (ঢাকা: আকাশ, ২০১৯) পৃ. ৯৬
২৬. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *জায়সী ও আলাওল রচিত পদ্মাবতী দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫) পৃ. ১৩
২৭. সুকুমার সেন (সম্পা.), *বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত* (নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯১) পৃ. ৬৬
২৮. *ঐ*, পৃ. ৬৬
২৯. সুকুমার সেন (সম্পা.), *বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত* (নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯১) পৃ. ৬৭
৩০. বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল* (কলকাতা: এশিয়টিক সোসাইটি, ২০১৬) পৃ. ৬৫
৩১. *ঐ*, পৃ. ৬৬
৩২. ঘনরাম চক্রবর্তী, *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল* (কলকাতা: বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো মেশিন প্রেস, ১৩১৮) পৃ. ১৪৫
৩৩. বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই (সম্পা.), *লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল* (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০০০) পৃ. ১২৭

৩৪. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫) পৃ. ৯২
৩৫. সুকুমার সেন (সম্পা.), *কবিকঙ্কন-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল* (নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৩) পৃ. ৩
৩৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.), *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান* (ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৮) পৃ. ১৯
৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৭) পৃ. ৩৮০
৩৮. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.), *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২
৩৯. *ঐ*, পৃ. ২০
৪০. *ঐ*, পৃ. ১৯
৪১. *ঐ*, পৃ. ৪৮
৪২. আহমদ শরীফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৯
৪৩. সুনীলকুমার ওঝা (সম্পা.), *মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল* (দিনাজপুর: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়) পৃ. ৫৩
৪৪. *ঐ*, পৃ. ১৪০
৪৫. *ঐ*, পৃ. ১৪১
৪৬. *ঐ*, পৃ. ১৪১
৪৭. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দুসুন্দর সিংহ রায় (সম্পা.), *কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র প্রণীত বাশুলীমঙ্গল বা বিশাললোচনীর গীত* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৪) পৃ. ১০৮
৪৮. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), *দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২) পৃ. ৮৭
৪৯. অবশ্য বাঙ্গাল শব্দ যে সব সময় নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা কিন্তু নয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে– 'বঙ্গাল আমাদের নিন্দার কথা নয়, এই দেশবাসীর প্রাচীন নাম। সীরাজের অমর কবি হাফিজ সোনারগাঁওয়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে যে গজল কবিতা পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলেছেন–

শক্কর শিকল শওন্দ হমা তূতীয়ানে হিন্দ।
যে কন্দে পারসী কে ব-বঙ্গালা মী রওদ।
--ভারতের তোতা হবে চিনি-খেকো সকলি।
পারসীর মিছরি এই যে বাঙ্গালায় চলিছে।'

৫০. সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দুসুন্দর সিংহ রায় (সম্পা.) *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮
৫১. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.) *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৬
৫২. সিরাজ সালেকীন, *ভাটির দেশের বাঙ্গাল* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০২২) পৃ. ৪৩
৫৩. সুকুমার সেন (সম্পা.), *বিপ্রদাসের মনসা-বিজয়* (কলকাতা: এশিয়টিক সোসাইটি, ১৯৫৩) পৃ. ২৪
৫৪. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল* (কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০২) পৃ. ১৪১
৫৫. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, (সম্পা.), *মনসামঙ্গল: কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (*দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭) পৃ. ৪

৫৬. সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস, (সম্পা.), *কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০) পৃ. ১৪৩-১৪৪
৫৭. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা.), *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯) পৃ. ১১৯৭
৫৮. তদেব, পৃ. ৯২৭।
৫৯. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'অভিভাষণ', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাদেশ: বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*, (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯৫) পৃ. ১৫৮
৬০. ওয়াকিল আহমদ, 'আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্য', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২১) পৃ. ২১৯
৬১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, 'অভিভাষণ', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
৬২. আলী আহমদ (সম্পা.), *আবদুল হাকীম বিরচিত নূরনামা* (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০) পৃ. ১৬-১৭
৬৩. *ঐ*, পৃ. ১৫-১৬।
৬৪. আবু জাফর শামসুদ্দীন, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', সফর আলী আকন্দ (সম্পা.), *বাঙালির আত্মপরিচয়* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১৮) পৃ. ৩২-৩৩
৬৫. আহমদ শরীফ (সম্পা.), *সৈয়দ সুলতান বিরচিত রসুল চরিত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮) পৃ. ৪৮০
৬৬. অনাথকৃষ্ণ দেব, *বঙ্গের কবিতা প্রথম ভাগ* (কলকাতা: জুনো প্রিন্টিং প্রেস, ১৯১০) পৃ. ২৯৫
৬৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৬৩) পৃ. ৩০৩
৬৮. ওয়াকিল আহমদ, 'আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্য', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১০-১১
৬৯. গোলাম মুরশিদ, *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩) পৃ. ১৯৯১
৭০. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, ২০১৬) পৃ. ২২

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

১৯৪৯ সালের টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে শামসুল হকের বিজয় পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের বাঁক

শেখ ফরিদ*

সারসংক্ষেপ: উপনির্বাচন, নির্বাচনী রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক আবশ্যিক ও সম্পূরক কার্যক্রম। টাঙ্গাইল উপনির্বাচন ১৯৪৯ আইনগত দিক থেকে তাই-ই। তবে, ঐতিহাসিক তাৎপর্যের বিচারে এই নির্বাচনটি বিশেষ গুরুত্ববাহী। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে স্বাধীনতা আনয়নকারী একটি রাজনৈতিক দলের পতনের পটভূমি, আরেকটি অর্থবহ স্বাধীনতা অর্জনের নিয়ামক রাজনৈতিক শক্তির জন্ম, স্বৈরাচারী শক্তির নৈতিক মনোবল ধ্বংস তথা স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে একটি নতুন ধারা তৈরির সার্বিক কার্যক্রমের সূচনা এই উপ-নির্বাচন। জনজোয়ার তৈরি এবং এই শক্তি উপলব্ধির জন্য নির্বাচনটির গুরুত্ব কালোত্তীর্ণ সত্য। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আরও দু-একটি উপনির্বাচন গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়, তবে আলোচিত নির্বাচন ও বিজয়ী প্রার্থীর গুরুত্ব, ভূমিকা তথা তাৎপর্য রাজনীতির অঙ্গনে বিপুল ও ব্যাপক। আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে উক্ত নির্বাচনটি এক মাইলফলক। টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে বিজয় আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় উর্বর একটি জমি তৈরি করেছিল এবং শামসুল হক এই জমি ও তার ওপর গৃহ নির্মাণের অন্যতম কারিগর।

ভূমিকা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে এতদঞ্চলে যে রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তাকে কোনোভাবেই সুষ্ঠু বা সুস্থ বলা যায় না। স্বাধীনতা তথা দেশভাগের পরে পরিবেশ সুষ্ঠু হওয়ার প্রাক-প্রত্যাশাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তদানীন্তন রাজনৈতিক ব্যবস্থাপকদের ব্যর্থতা। প্রাদেশিক রাজনীতির দুই দিকপাল সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাসিম ভারতে অবস্থান করায়[১] এবং শামসুল হক-সহ প্রধান প্রধান মুসলিম লীগ সংগঠককে দল থেকে বহিষ্কার করায়[২] রাজনীতির ভারসাম্য একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম-পাকিস্তানি নেতারা যেমন মূল নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে তেমনি পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেন জনসম্পৃক্তি থেকে দূরে অবস্থানকারী আকরম খাঁ, খাজা

***পিএইচডি গবেষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা**
সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল

নাজিমুদ্দীন, নূরুল আমীন-সহ জমিদার পরিবারকেন্দ্রিক ব্যক্তিবর্গ। উল্লিখিত নেতৃত্ব সকল সুবিধা ভোগ করার পাশাপাশি অবর্ণনীয় নির্যাতন চালান তাঁদের একসময়ের সহযোগী রাজনৈতিক কর্মী (তবে কখনই একই ধারার নয়), তথা সমসাময়িক বিরোধীদের ওপর। এই নির্যাতিত অংশটি সংগঠিত হতে থাকে শামসুল হকের নেতৃত্বাধীন ১৫০ মোগলটুলি অফিসকে কেন্দ্র করে। মুসলিম লীগের প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী তরুণ সম্প্রদায়ের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে উক্ত নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু ওয়ার্কার্স ক্যাম্প।

সরকারি ক্ষমতায় আসীন সুবিধাবাদী নেতৃত্ব এতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। 'পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ' ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয়, যা পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু কিংবা সীমান্ত প্রদেশে করা হয়নি।[৩] উল্লেখ্য, শামসুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল অংশ সর্বদাই দলীয় সংহতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট থাকলেও কায়েমি স্বার্থবাদী নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব হারানোর শঙ্কা থেকে তাঁদের ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। মুসলিম লীগের দরজা চরম অন্যায়ভাবে তাঁদের মুখের ওপরে বন্ধ করে দেয়া হয়।[৪] তার ফলে ত্যাগী কর্মীবাহিনী হারিয়ে দলটি জনবিরোধী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। আর তার একেবারে প্রাথমিক ফল হলো টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনে তাদের পরাজয়, যা তাঁদের জন্য এক তাৎক্ষণিক জনজবাব হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় পরিষদের সর্বশেষ নির্বাচনে বিজয়ী খুররম খান পন্নীর আসন শূন্য ঘোষিত হলে[৫] আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল দক্ষিণ (মুসলিম) কেন্দ্র থেকে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন[৬] করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী এবং আরও দুইজন প্রার্থীকে পরাজিত করে।[৭] উল্লেখ্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে মওলানা টাঙ্গাইলের কাগমারী অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন।

নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নী ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে ভাসানীর নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য আবেদন জানান। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক গভর্নর উপরোক্ত নির্বাচন বাতিল করে দেন। তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এবং প্রাদেশিক সরকারের নেতৃত্ব হারানোর ভয়ই তাঁর নির্বাচন বাতিলের মূল কারণ। কেননা, প্রাদেশিক রাজনীতিতে ক্রমশ মওলানা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিলেন। নির্বাচনে ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করার অপরাধে মওলানা ভাসানী, খুররম খান পন্নী-সহ চারজনের ওপর ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[৮] অবশ্য নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর এবং আবুল মকসুদ ১৯৫০ পর্যন্ত বলবৎ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

নাজমা চৌধুরী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন:

> The political development which took place following Bhashani's election had a most decisive influence on the politics of the first legislature. He was nominated by the central parliamentary board of Muslim League. On ground of election irregularities election tribunal declared the seat of bhashani is vacant and also both candidates were debarred from contesting any elections.[৯]

১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল দক্ষিণ (মুসলিম) আসনে প্রাদেশিক সরকার নতুন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এই খবর শোনার পর ১৫০ মোগলটুলিতে খন্দকার মোশতাক আহমদ, শওকত আলী, কামরুদ্দীন আহমদ, নবাবজাদা হাসান আলী-সহ ওয়ার্কার্স ক্যাম্প কর্মীরা মিলে শামসুল হককে মুসলিম লীগবিরোধী প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর অন্য সকলেই মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারে একমত হন, তবুও নির্বাচনের ব্যাপারে সাবধান হওয়ার জন্য নারায়ণগঞ্জের ওসমান আলীর বাসায় এক বৈঠকে শওকত আলী, শামসুজ্জোহা-সহ ১৫০ মোগালটুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মী মুসলিম লীগের সর্বাত্মক বিরোধিতার প্রশ্নে স্থির করেন যে, এমনকি মুসলিম লীগ যদি শামসুল হককে মনোনয়ন দেয় তাহলে তাঁকে সমর্থন না করে বিকল্প প্রার্থী ঘোষণা করে হলেও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধাচরণ করবেন।[১০] ঐ সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন:

> আমরা ঠিক করলাম, শামছুল হক সাহেবকে অনুরোধ করব মুসলিম লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়তে। শামসুল হক সাহেব শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন, কিন্তু টাকা পাওয়া যাবে কোথায়? হক সাহেবেরও টাকা নাই আর আমাদেরও টাকা নাই। তবু যেই কথা সেই কাজ। শামসুল হক সাহেব টাঙ্গাইল চলে গেলেন, আমরা যে যা পারি জোগাড় করতে চেষ্টা করলাম।[১১]

শেষ পর্যন্ত অবশ্য শামসুল হকই মুসলিম লীগবিরোধী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন দেয় খুররম খান পন্নীকে। কিন্তু ইতোপূর্বে প্রাদেশিক সরকারের জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ।[১২]

১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিলে টাঙ্গাইলে পূর্ববাংলার প্রথম উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। খাজা নাজিমুদ্দীন তখন পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী (ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের প্রার্থী) শামসুল হক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়াও প্রার্থী ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আলীম আল রাজী, আমির আলী মোক্তার এবং আব্দুল জলিল এম.এ।[১৩] তখনো

আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়নি। প্রধানত, একজন ছাত্রনেতা এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগের নেতার পরিচিতি নিয়ে শামসুল হক নির্বাচনে নামেন। এখানে জমিদারির বিশাল প্রভাব, আর্থিক জোর এবং মুসলিম লীগের ব্যাপক সমন্বিত শক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক সংগতিহীন প্রতিবাদী শামসুল হক। তাঁর নির্বাচনে ঢাকা থেকেও ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কিছু কর্মী টাঙ্গাইল গিয়েছিলেন। মুসলিম লীগের মন্ত্রী ও এমএলএ-মণ্ডলী টাকা-পয়সা, গাড়ি ও সব কিছু নিয়ে টাঙ্গাইলে উপস্থিত হয়েছিলেন। মুসলিম লীগ প্রার্থী করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার খুররম খান পন্নী, উক্ত নির্বাচনী এলাকার অধিকাংশ ভোটারই যাঁর প্রজা। সরকারি ক্ষমতা আর অর্থবল ছিল তাঁর মূল শক্তি। শামসুল হক গরিব, কিন্তু নিঃস্বার্থ-ত্যাগী কর্মী যিনি, আদর্শবাদী ও ব্যাপক কর্মক্ষমতার অধিকারী।[১৪] এই নির্বাচনী এলাকা ছিল দক্ষিণ টাঙ্গাইলের নাগরপুর, মির্জাপুর ও বাসাইল– এই তিনটি থানা নিয়ে।[১৫]

এলাকার প্রায় সমস্ত কৃষকই ছিল জমিদারদের প্রজা। প্রজাদের ওপর জমিদারের ছিল মারাত্মক প্রভাব। প্রজার নিকট জমিদার ছিল মহামনীষী। জমিদার তার জমিদারি এলাকার প্রজাদের মাঝে গেলে আনন্দের ঢেউ বইত। জমিদারকে প্রজারা নিজেদের মাঝে পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তো। নানা ধরনের মূল্যবান উপহারসামগ্রী দিয়ে জমিদারকে বরণ করা হতো বা সম্মান প্রদর্শনের রেওয়াজ ছিল। জমিদারকে প্রজারা টাকা দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পরিয়ে দিতো। এমনি অবস্থায় জমিদারপুত্রের বিরুদ্ধে প্রার্থী হন কৃষক প্রজার সন্তান যুবনেতা শামসুল হক। এরকমটি ভাবাও ছিল ঐ সময়ে এক অস্বাভাবিক ব্যাপার।[১৬]

মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থী খুররম খান পন্নী নিজে জমিদার। তাঁর ছিল অগাধ ধনসম্পদ। আর সরকারি দলের প্রার্থী হওয়ায় সরকারও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাঁর নির্বাচনে। জমিদারি প্রভাব এবং সরকারি প্রভাবের সামনে একজন কৃষকসন্তানের পক্ষে বিজয় অর্জন করা অকল্পনীয় ছিল। এই নির্বাচনের সময় পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ, সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ভোটারদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আবেদন প্রচার করেন:

> লাখো মোজাহেদের ত্যাগ ও কোরবানীর ফলে আমরা পাকিস্তান লাভ করিয়াছি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মোসলেম রাষ্ট্র আমাদের পাকিস্তান। পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের আইন-কানুন তৈরী হইতেছে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক। এই নতুন রাষ্ট্রের শিশু অবস্থায় একে কত বিপদ-কত মছিবতের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। কত জানী দুশমন শৈশবেই ইহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতের কোটি মুসলমান মুসলিম লীগের ঝাণ্ডার নীচে একযোগে কাজ করিয়াছিল বলিয়াই আমরা পাকিস্তান হাসিল করিতে পারিয়াছিলাম। পাকিস্তান হাসিলের জন্য মুছলেম সংহতি ও মুছলেম লীগের যতখানি দরকার ছিল আজ পাকিস্তানকে গড়িয়া তুলিবার জন্য এর দরকার তার চেয়েও বেশি। কায়েদে আজম বারে বারে

বলিয়াছেন– পাকিস্তানকে মজবুত করিতে হইলে মুসলিম লীগকে মজবুত করিতে হইব। এন্তেকালের কিছুদিন আগে তিনি ঢাকায় বক্তৃতায়ও মুসলিম লীগের দুশমনদের সম্বন্ধে আপনাদের সতর্ক করিয়াছেন এবং মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করিবার জন্য আকুল আহ্বান জানাইয়াছেন।[১৭]

পাকিস্তানের সংহতি দৃঢ় করার দোহাই দিয়ে বলা হয়:

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক যে আইন-কানুন তৈরি করিতেছেন, তা চালু করিতে হইলে প্রাদেশিক আইন সভায়ও মুসলমান সদস্যদিগকে একদিন একমত হইয়া মুসলিম লীগের ভিতর থাকিয়া কাজ করিতে হইবে। আপনারা জানেন দক্ষিণ টাঙ্গাইল হইতে আগামী ২৬শে এপ্রিল পূর্ববঙ্গ আইন সভার উপ-নির্বাচন হইবে। এইবার এই আসনের জন্য মুসলিম লীগের তরফ হইতে নমিনেশন পাইয়াছেন করোটিয়ার স্বনামধন্য চাঁদ মিয়া সাহেবের নাতি খুররম খাঁ পন্নী। পাকিস্তান রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইলে আপনাদের কর্তব্য হইবে এক বাক্যে মুসলিম লীগের সাইকেল মার্কা বাক্সে ভোট দেওয়া। মুসলিম লীগে ও মুসলিম জামাতে ভাঙ্গন ধরাইবার জন্য পাকিস্তান লাভের আগে যেমন চেষ্টা হইয়াছে এখনও সেই রকম চেষ্টা হইতেছে। বন্ধুর বেশে আসিয়া অনেকে মুসলিম লীগের ও মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিবে। আপনি যদি মুসলিম রাষ্ট্রকে মজবুত দেখিতে চান দুনিয়ায় পাকিস্তানের ও মুছলিম জাতির ঝাণ্ডা চলন্ত হোক এ যদি আপনার কামনা হয় আপনি নিশ্চয়ই লীগ প্রার্থী খুররম খাঁ পন্নীর জন্য মুসলিম লীগের সাইকেল মার্কা বাক্সে ভোট দিবেন। মনে রাখবেন এ ভোট মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান দৃঢ় করিবার জন্য। আশা করি অন্য বারের ন্যায় এবারও আপনারা মুসলিম লীগকে সমর্থন করিয়া মোছলিম জমাত, কায়েদে আজম ও পাকিস্তানের মর্যাদা রক্ষা করিবেন।[১৭ক]

তারা শুধু আবেদন নিবেদন করেই ক্ষান্ত হননি প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন-সহ ছয়জন মন্ত্রী, বলা যায় টাঙ্গাইলেই অবস্থান করেন। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য ১০ হাজার মন চাল বিতরণসহ ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করেন।[১৮] 'টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচন' নামে একটি সম্পাদকীয়তে দৈনিক আজাদ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রতিবেদনে বলে:

জনাব খুররম খান পন্নী সাহেব লীগের মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব শামছুল হক সাহেব দুই বৎসর আগে, তদানীন্তন প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশেমের অনুবর্তী হিসেবে লীগের প্রচার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আশা করা গিয়াছিল যে, লীগ কর্মী হিসেবে শেষোক্ত প্রার্থী জনাব শামছুল হক সাহেব লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব খুররম খান পন্নীর অনুকূলে নির্বাচন-দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন এবং লীগ মনোনয়ন অগ্রাহ্য করিয়া লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইয়াছেন। এটি খুব দুঃখজনক ব্যাপার, সন্দেহ নাই। লীগের নিয়ম-শৃঙ্খলা লীগ কর্মী বলিয়া পরিচিত এক ব্যক্তি ভাঙ্গিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সত্যিকার লীগারদের কাছে তাহা এতদিন অভাবনীয় ব্যাপারই ছিল...।[১৯]

শৃঙ্খলা ভঙ্গের যে অভিযোগ সম্পাদকীয়তে করা হয়েছে সে অভিযোগ বস্তুত প্রযোজ্য ছিল সংবাদপত্রটির মালিক এবং পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ এবং মুসলিম লীগের অন্য নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে, তাঁরাই মুসলিম লীগকে কুক্ষিগত করে তাঁদের উপদলের বাইরের কোনো কর্মী অথবা নেতা যাতে প্রতিষ্ঠানে ঠাঁই পেতে না পারেন তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আজাদের উক্ত সম্পাদকীয়টিতে ভোটারদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আবার বলা হয়:

> আমরা অবশ্য শামছুল হক সাহেবের এই লীগ-বিদ্রোহিতায় বিস্মিত হই নাই। তিনি আগেও যত না ছিলেন সত্যকার লীগমনা কর্মী তার চাইতে বেশি ছিলেন আবুল হাশেম সাহেবের অন্ধ ভক্ত শিষ্য। জনাব আবুল হাশেমের হটকারিতাপূর্ণ কীর্তিকলাপের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া লীগারদের পরিচয় যথেষ্টই আছে, কাজেই সে সম্পর্কে এখানে পুনরালোচনা অনাবশ্যক। সেই আবুল হাশেম সাহেবের অন্ধভক্ত শিষ্য হটকারিতার বশবর্তী হইয়া লীগ নির্দেশ অমান্য করিয়া বসিবেন, তাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি থাকিতে পারে। টাঙ্গাইলের ভোটারদের কাছে আমাদের আরজ: এখনো পূর্ব পাকিস্তান সর্বাংশে বিপদমুক্ত হয় নাই, এখনো বাহিরের শত্রুদল পাকিস্তানের নাম-নিশানা মুছিয়া ফেলার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পাতিয়া আছে এবং পাকিস্তানপন্থীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও ভাঙ্গন সৃষ্টির মধ্য দিয়াই যে সে সুযোগ আসিবে, ইহারা তাহা জানে। কাজেই আমরা ভোটারদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করি: সাধু সাবধান।[২০]

একথা ঠিক যে, শামসুল হক আবুল হাশিমের একনিষ্ঠ ভক্ত-অনুসারী ছিলেন। তিনি পাকিস্তান সৃষ্টিতে আবুল হাশিমের নির্দেশনায় পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগকে জন-সংগঠনে রূপায়িত করতে ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি মুসলিম লীগকে অবশ্য ঢাকার নবাবদের করালগ্রাস থেকে উদ্ধারে সচেষ্ট ছিলেন। জমিদার পরিবারের অত্যন্ত যোগ্য প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও দলীয় ও সরকারি স্বৈরাচারের প্রতিবাদ মানুষ প্রথমবারের মতো করে। উল্লেখ্য, মওলানা ভাসানী নির্বাচিত হয়েছিলেন মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে।[২১] যদিও শামসুল হক কৃষক সন্তান ছিলেন, কিন্তু তার প্রভাবের পাল্লাই ভারী হয়ে পড়ে। কৃষক সন্তানের প্রতি কৃষক প্রজার কী দরদ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় শামসুল হক আর খুররম খান পন্নীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে।[২২]

শামসুল হকের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ঢাকা থেকে যে সমস্ত নেতারা আসেন তাদের মধ্যে ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আসলাম, মোহাম্মদ আউয়াল, শওকত আলী, আজিজ আহম্মেদ, সামসুজ্জোহা প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের পক্ষে একটি আন্দোলনে

অংশগ্রহণের জন্য কারাবরণ করার কারণে শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহবুব, আবুল হাসনাত-সহ প্রধান ছাত্রনেতৃবৃন্দ টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনে শামসুল হকের পাশে দাঁড়াতে পারেন নি।[২৩]

ঢাকার বাহির থেকে, বিশেষ করে ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর থেকে প্রচুর মুসলীম লীগবিরোধী কর্মী শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী-প্রচারণা চালানোর জন্য টাঙ্গাইলে আসেন। শেখ মুজিবুর রহমান বন্দি অবস্থায়ই তাঁর সমর্থকদের নির্দেশ দেন শামসুল হকের নির্বাচনে কাজ করার জন্য।[২৪] নূরুল আমীন সরকারের এই চরম অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং নির্লজ্জ দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে সমগ্র প্রদেশের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক চরিত্রও এই অদৃষ্টপূর্ব সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। এই প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক *নওবেলাল* 'একটি দৃষ্টান্ত' শিরোনামে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়:

> মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই জনসাধারণ জানত এবং সেই জন্য তাদের সমর্থনও দান করেছেন। কিন্তু মুসলিম লীগের বর্তমান অগণতান্ত্রিক নীতির ফলে জনসাধারণ যদি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে, তাহলে দায়িত্ব কার হবে? জনসাধারণের, না দলীয় স্বার্থে যারা গণতন্ত্রের ন্যায়নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়া ফ্যাসিস্ট নীতি অবলম্বন করেছেন তাদের? এই প্রশ্নের জবাবের ভার আমরা গণতন্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী পূর্ব পাকিস্তানের কোটি কোটি জনগণের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। দেশের সত্যিকারের কোনো উন্নতিমূলক পরিকল্পনা সামনে নিয়ে যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যায় না তার পক্ষে এইরূপ ফ্যাসিষ্ট নীতি অবলম্বন করা ছাড়া কি উপায় আছে? পাকিস্তান লাভের পর মুসলিম লীগের কর্তব্য ছিল জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি হিসেবে সদ্য জাগ্রত এক জাতির সামনে রাষ্ট্রগঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসা। কিন্তু মুসলিম লীগ সে কর্তব্য মোটেই পালন করে নাই; বরং দলীয়, উপদলীয় স্বার্থ নিয়ে কোন্দল করতেই রত আছে। এমতাবস্থায় জনসাধারণ যদি মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে তা হলে কাকে দোষী করা যাবে?[২৫]

সার্বিক কর্মকাণ্ডে টাঙ্গাইলবাসী ব্যাপক সাহস আর উৎসাহ উদ্দীপনা পায়। নির্বাচনে টাঙ্গাইলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন জনাব হযরত আলী ও বদিউজ্জামান খাঁ। নির্বাচন পরিচালনার জন্য তখনকার দিনেও কমবেশি টাকার প্রয়োজন ছিল। তার ওপর আবার জমিদার ও ক্ষমতাসীন দলের বিপক্ষে। প্রথম দিকে অর্থের অভাব দেখা দিলেও পরে আর টাকার তেমন অভাব হয়নি। টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খানের বিরুদ্ধে শামসুল হক স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষণা করার পর মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধীমহলে সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই শামসুল হককে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে ১৫০ নম্বর

মোগলটুলির 'পার্টি হাউস'কে কেন্দ্র করে যে কর্মীদল তখনো পর্যন্ত মোটামুটি একত্রিত ছিলেন তাঁরাই সব থেকে সংগঠিত এবং ব্যাপকভাবে শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। মোশতাক আহমদ ছিলেন এই নির্বাচনের অন্যতম মূল সংগঠক। তা ছাড়া অন্য যাঁরা এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেন তাঁদের মধ্যে কামরুদ্দীন আহমদ, নারায়ণগঞ্জের শামসুজ্জোহা, মহম্মদ আলমাস, মহম্মদ আউয়াল, শওকত আলী, আজিজ আহমদ, হযরত আলীর নাম বিশেষ উল্লেখ্য।[২৬]

নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিজ নিজ উদ্যোগে সামর্থ্য অনুসারে সাহায্য নিয়ে ব্যক্তি উদ্যোগে অনেককেই এগিয়ে আসতে দেখা যায়। আলমাস নারায়ণগঞ্জ এলাকা থেকে ৫০০ টাকা তোলেন। তাছাড়া চেম্বার অব কমার্সে সাখাওয়াৎ হোসেন ৫০ টাকা, আতাউর রহমান খান ৫০ টাকা, কাদের সর্দার ১৫০ টাকা প্রদান করেন। অন্যদের নিকট থেকে আরও কিছু টাকা নিয়ে সর্বসাকুল্যে নির্বাচনের জন্য কর্মীরা প্রায় ১৩০০ টাকা তুলতে সমর্থ হয়।[২৭] মুসলিম লীগের বিপুল অর্থ সামর্থ্যের তুলনায় শামসুল হকের এই অবস্থা রীতিমতো আশঙ্কাজনক ছিল।[২৮]

নির্বাচনের তারিখ যতই আগাতে থাকে রসদ ততই বাড়তে থাকে, স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দচিত্তে। বহু প্রেসের মালিক শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। তারা বলেন, শামসুল হকের বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্য কোনো প্রকার টাকা পয়সার প্রয়োজন হবে না। শুধু কাগজের দাম দিলেই চলবে। অনেক প্রেস মালিক আবার কাগজের দামও গ্রহণ করেন নি।[২৯]

কয়েক দিনের মধ্যে হাজার হাজার বিজ্ঞাপন ছাপানো হলো। নির্বাচনের সাত আট দিন বাকি থাকতেই পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা করে সাহায্য আসতে লাগল। এমনকি অনেক মেয়ে নিজেদের কানের গহনা, হাতের চুড়ি প্রভৃতি পাঠাতে শুরু করে। তাদের অনুরোধ ছিল, এগুলো বিক্রি করে যেন নির্বাচনের খরচ চালানো হয়। সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটে যখন খুররম খান পন্নীর স্ত্রী শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন। জনাব হককে তাঁর নির্বাচনের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু শামছুল হক, পন্নী সাহেবের স্ত্রীর টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানান।[৩০] পরে অবশ্য খুররম খান পন্নীর স্ত্রী স্ব-উদ্যোগে জমিদারের বিপক্ষে এবং শামসুল হকের পক্ষে এক প্রচারপত্র বিতরণ করেছিলেন।[৩১]

নির্বাচনে শামসুল হকের জন্য যেমনি টাকা পয়সা নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এগিয়ে আসেন, তেমনি নির্বাচনী কাজ করার জন্য এলাকার অসংখ্য কর্মী এগিয়ে আসে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে। ঐ সময় শামসুল হকের নির্বাচনে যে বিশাল কর্মীবাহিনী গড়ে উঠেছিল, তাদের সংগঠিত করা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

খুররম খান পন্নীর পূর্বপুরুষকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত করটিয়ার সা'দত কলেজের বহু ছাত্র-সহ এলাকার বিভিন্ন স্কুলের অগণিত শিক্ষার্থী শামসুল হকের নির্বাচনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে।[৩২] এই সমস্ত ছাত্র সারাদিন না খেয়ে, পায়ে হেঁটে নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারবিরোধী প্রচারণা চালায়। সরকারি দলের সভা-সমাবেশে এই কর্মীবাহিনী দলে দলে যোগদান করে বহু সভা-সমাবেশকে বিরোধী দলের সমাবেশে পরিণত করে।[৩৩] এ ধরনের কয়েকটি জনসভায় শামসুল হক প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন-সহ অন্যদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেন এবং তাদের গণবিরোধী নীতিমালার তীব্র সমালোচনা করেন ও সরকারের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভের সৃষ্টি করেন।

প্রজাপ্রিয় জমিদার পরিবারের সন্তান খুররম খান পন্নী ছিলেন একজন নিপাট ভদ্রলোক, নিপীড়নের কোনো অভিযোগ তাঁর নামে কেউ করেনি। তিনি আচরণে শিষ্ট ও বিনয়ী ছিলেন। প্রথমাবস্থায় শামসুল হক তাঁর বিরুদ্ধে কোনো বিবেচনাযোগ্য প্রার্থী ছিলেন না বলেই মনে করা হয়েছিল। খুররম খান পন্নী তাঁর নির্বাচনের জন্য মাইক নিয়ে এসেছিলেন। টাঙ্গাইল অঞ্চলে এটাই মাইকের প্রথম ব্যবহার, স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি আশ্চর্যান্বিত ও কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। সা'দত কলেজের সেই জনসভায় শত সহস্র মানুষের সমাগম হয়েছিল। জমিদার সাহেবের কথা শেষ হওয়ার পর শামসুল হক মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান। জমিদারকে তাঁর পরিচয় দিয়ে ভোট প্রার্থনার সুযোগ চান। জমিদার ভদ্রলোক না করতে পারলেন না। তারপর শামসুল হক সেখানে বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে খুররম খান পন্নী ও তাঁর পরিবারের সুখ্যাতি করেন। তিনি এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, জমিদার পরিবারের কারণে সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এলাকায় শিক্ষার বিস্তার সম্ভব হচ্ছে, অধিক বিনয়ের সঙ্গে উল্লেখ করেন তিনি এই কলেজেরই প্রাক্তন শিক্ষার্থী। তিনি ধীরচিত্তে বলেন তাঁর নির্বাচন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, বরং দলীয় অনাচারের প্রতিবাদে। উল্লেখ করেন, তিনিও পাকিস্তান তৈরিতে উক্ত দলকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। বক্তব্যে তিনি মুসলিম লীগ সরকারের সকল প্রকার দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ করে বাঙালির ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য তাকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করেন।[৩৪] শামসুল হকের বক্তব্য শেষে উপস্থিত জনতা মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নীকে ভোট না দিয়ে তাকে ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।[৩৫]

অনুরূপভাবে নাগরপুরের একটি জনসভায় শামসুল হক বক্তব্য রাখেন। এই জনসভাটি ছিল মূলত মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থী খুররম খান পন্নীর। পন্নী সাহেবের জনসভায় পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন-সহ পাঁচজন মন্ত্রী ও এলাকার বেশকিছু নেতা উপস্থিত ছিলেন। সভা অনুষ্ঠানের বেশ কয়েকদিন আগে থেকে মাইকযোগে

ব্যাপক প্রচার করার ফলে জনসভার প্রচুর জনসমাবেশ ঘটে। যথাসময়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। খুররম খান পন্নী ও মন্ত্রীগণ বক্তব্য শেষ করেছেন। এবার বক্তব্য রাখার পালা সভার সভাপতি পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের। তিনি যখন বক্তব্য শুরু করেছেন এমন সময় সভাস্থলে শামসুল হক সাইকেল যোগে বেশ কয়েকজন কর্মী সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখামাত্র সভার লোকজন শামসুল হক জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাঁরা চিৎকার করে বলতে থাকে যে, এখনি আমরা শামসুল হকের ভাষণ শুনব। নূরুল আমীন-সহ অন্য মন্ত্রীরা জনতাকে শান্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু জনতা তাদের কথা না শুনে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অসংখ্য মানুষ যখন সভাস্থলে মারাত্মক বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে, ঠিক সেই সময় শামসুল হক সভামঞ্চে ওঠেন এবং জনতাকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ করেন। জনতা শামসুল হকের অনুরোধ করামাত্র শান্ত হয়ে বসে। এরপর শামসুল হক তাঁর বক্তব্য রাখেন।[৩৬] জনাব হকের বক্তব্য শুরু হলে উপায়ন্তর না দেখে নূরুল আমীন ও পন্নী সাহেব-সহ সরকার দলীয় লোকজন সভাস্থল ত্যাগ করেন। সরকারি দলের মন্ত্রীমণ্ডলীসহ অন্যরা চলে গেলেও শ্রোতৃগণ অনড় থাকে। তারা শামসুল হকের বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করে। জানা যায়, এই জনসভায় শামসুল হক প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তব্য রাখেন।[৩৭]

সরকার পক্ষের আয়োজনে বাসাইলের জনসভায়ও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এতে মন্ত্রীগণ-সহ সরকারি দলের অভ্যাগতরা অপ্রস্তুত হন। জমিদারের বাড়ির নিকটবর্তী হওয়ায় এটি ছিল জাঁকজমকপূর্ণ জনসভা। সভায় যথারীতি প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন-সহ ৫ জন মন্ত্রী উপস্থিত। পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দকেও ডেকে আনা হয়েছে। সভার কাজ শুরু হওয়ার পর শামসুল হক সেখানে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখামাত্র উপস্থিত জনতা স্লোগান দিতে থাকে এবং শামসুল হকের চারপাশে সমবেত হয়। নূরুল আমীন জনতাকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন কিন্তু জনতার মধ্যে সে রকম কোনো সাড়া পরিলক্ষিত হয়নি। শামসুল হককে জনতা মঞ্চে তুলে দেন কিন্তু এবার আর তাঁকে বক্তব্য দিতে রাজি করা যায়নি সভার আয়োজকগণকে। এরপর শামসুল হক জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন আসুন আমরা সরে গিয়ে মিটিং করি। উপস্থিত সকল জনতা তাঁর সঙ্গে গমন করে এবং তিনি বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে এক আবেগময় ভাষণ দেন। তিনি পাকিস্তান-আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণ হিসেবে মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যের কথা বলেন কিন্তু তা করতে সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ করেন। জমিদারি উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এ ব্যাপারে উদ্যোগ না নেওয়ায় তিনি সরকারের সমালোচনা করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলে তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকদের জুলুমের চিত্র তুলে ধরেন। এরপর তিনি অর্থ পাচারের অভিযোগ এনে

সরকারের সমালোচনা করেন এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে যে জুলুম সরকার করছে তাঁর সমুচিত জবাব দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি সভায় মুসলিম লীগের প্রসঙ্গ টেনে নেতৃবৃন্দের স্বৈরাচারী ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি ভাষা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহরও সমালোচনা করেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও উপস্থিত তাঁর অন্যতম দুই সহচর বদিউজ্জামান খাঁ এবং হযরত আলীর (পরে ব্যারিস্টার) উদ্ধৃতি হতে জানা যায়[৩৮] সরকারি দলের লোকজন বা মন্ত্রীমণ্ডলী শুধু জনসভাতেই অপদস্থ হননি, তারা যেখানেই জনসভা বা নির্বাচনী প্রচারে গেছেন সেখানেই জনসাধারণের নিকট নাস্তানাবুদ হয়েছেন। নূরুল আমীন এসেছেন জেনে সামান্য সময়ের মধ্যে শত শত লোকজন এসে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। নূরুল আমীন সাহেব গাড়ি নিয়ে পিছিয়ে যাবেন সে উপায়ও নেই। ইতোমধ্যে বদিউজ্জামান খাঁ উপস্থিত লোকদের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে শুরু করনে। তিনি তার বক্তব্যে মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন এবং সরকারের সকল প্রকার দুর্নীতি অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনতাকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনুরোধ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা সময় বক্তব্য শুনানোর পর নূরুল আমীন ও অন্য মন্ত্রীদের ছেড়ে দেয়া হয়।[৩৯]

এই নির্বাচনের সময় সরকারের শীর্ষমহল প্রচার-প্রচারণার পাশাপাশি অন্যায় প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেছে। পুলিশপ্রধান, সরকারি বিভিন্ন কর্মকর্তা-সহ নির্বাচনী আচরণবিধির সঙ্গে অসঙ্গত ও জনবিরোধী বিভিন্ন কাজে সচেষ্ট থেকেছে। তবুও জনসাধারণ এবং ভোটারদের পক্ষে আনা সম্ভব হয়নি। ভয়ভীতি লোভ-লালসা দেখানোর পাশাপাশি তারা জনসাধারণকে, বিশেষ করে অশিক্ষিতদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালান। সরকার বিভিন্ন স্থান থেকে কাঠমোল্লাদের ভাড়া করে এনে ধর্মের দোহাই দিয়ে জনসাধারণের নিকট থেকে ভোট আদায় করার চেষ্টা করে। মোল্লা সাহেবরা অশিক্ষিত লোকজনদের বুঝান শামসুল হককে ভোট দেয়া মানে কাফেরকে ভোট দেয়া। শামসুল হক বিধর্মী, তাকে ভোট দেওয়া মানে বিধর্মীকে ভোট দেওয়া। সে ইসলামের দুশমন। কাজেই তাকে ভোট দেয়া উচিত হবে না। শামসুল হক ভারতের দালাল। তাকে ভোট দিলে পূর্ব-পাকিস্তানকে হিন্দুস্তানে পরিণত করবে। পাকিস্তান রক্ষার দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের। আর সেই পাকিস্তান রক্ষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের প্রার্থী খুররম খান পন্নীকে সাইকেল মার্কায় ভোট দিতে হবে। এ ধরনের বক্তব্য শুধু কাঠ মোল্লারাই দিত না, বিভিন্ন সভা-সমাবেশে স্বয়ং খাজা নাজিমুদ্দীন ও নূরুল আমিন-সহ মন্ত্রীরাও দিতেন। সভা-সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও সরকারের পক্ষে এবং শামসুল হকের বিপক্ষে ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হয়।[৪০] শামসুল হকের পক্ষে তাঁর পিতার তৈরি করা শ্লোগান সবাই বলত, 'শামছুল হক

ভালো লোক, ধানের আঁটিতে দিবেন ভোট"[৪১] –কৃষকসন্তানের বিজয়ের জন্য তাঁর নিজের যোগ্যতার পাশাপাশি জনগণের ভালোবাসাও সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সকল প্রকার ভয়ভীতি লোভ-লালসা এবং অপপ্রচারের পরও দক্ষিণ টাঙ্গাইলবাসী ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে শামসুল হককে বিজয়ী করে। খুব কম ভোটের ব্যবধানে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয় বলে মন্তব্য করে দৈনিক আজাদ জানায় ভোটের সংখ্যা জানা যায় নাই।[৪২] আগেই বলা হয়েছে, খুররম খান পন্নী খুব শরিফ ও খানদানি ব্যক্তি ছিলেন। নির্বাচনে ফলাফল নির্ধারিত হবার পর ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে আনা তাঁর সম্ভাব্য বিজয় উদ্‌যাপনের মণ্ডা তিনি শামসুল হকের নিকট পাঠিয়েছিলেন শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে এবং শামসুল হকও তা গ্রহণ করেন শিষ্টাচারের নিদর্শন স্থাপন করে এবং এই মণ্ডা তিনি কর্মীবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করেন পন্নী সাহেবের সৌজন্যে।[৪৩]

পর্যালোচনায় দেখা যায়, গণতান্ত্রিক পরিবেশ তুলনামূলকভাবে তখন বেশ ভালোই ছিল। তবে সরকারের মনোভাব ছিল এর বিপরীত। নির্বাচন শেষ হওয়ার ঠিক পরই সরকারি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মোহন মিয়া, শাহ আজিজুর রহমান ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর হামলার কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করে হুকুমের আসামি করে শামসুল হক, বদিউজ্জামান-সহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। যে যুবক পুলিশ অফিসার তাঁদেরকে গ্রেফতার করেন তিনি জানান, তাঁদের জামিনে মুক্তি লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ তাঁদেরকে যাতে জামিন না দেয়া হয় সেই মর্মে ঢাকা থেকে নির্দেশ এসেছে। এই খবর দেয়ার সঙ্গে পুলিশ অফিসারটি শামসুল হক ও মোশতাক আহমদকে পরামর্শ দেন মোহন মিঞা, শাহ আজিজুর রহমান এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা দায়ের করতে।[৪৪] পরামর্শ মোতাবেক তাঁরাও পাল্টা মামলা রুজু করেন। মামলা দায়েরের পর সেই পুলিশ অফিসারটি মহকুমা হাকিম খুরশিদ আলমের বাসভবনে উপস্থিত হন। সেখানে মোহন মিঞা সাঙ্গপাঙ্গ-সহ অবস্থান করছিলেন। মহকুমা হাকিমকে পুলিশ অফিসার পাল্টা মামলার কথা জানান এবং মোহন মিঞাদেরকে ঐ একই কারণে গ্রেফতার করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। এর উত্তরে মহকুমা হাকিম মোহন মিঞাদের জামিন দিতে নির্দেশ দিলে পুলিশ অফিসারটি তাঁকে জানান যে, অন্যদেরকে একই ধরনের মামলার জামিন না দেওয়ার নির্দেশ আছে, কাজেই সেই নির্দেশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এদেরকে জামিন দেওয়া সম্ভব হবে না। এরপর অন্য উপায় না দেখে মহকুমা হাকিম সকলকেই জামিন দেয়ার নির্দেশ দেন।[৪৫]

১৯৪৯ সালের ২৬ এপিলের নির্বাচনে শামসুল হকের বিজয় অর্জন ও মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নীর পরাজয় বরণ করা ছিল তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক

অঙ্গনে একটি অন্তত্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় একদিকে লীগ সরকারকে ভাবিয়ে তুলে। অন্যদিকে লীগবিরোধী শক্তিকে আন্দোলন করার উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। পন্নী সাহেবের পরাজয় শুধু তার নিজের পরাজয় ছিল না, এ পরাজয় ছিল মুসলিম লীগ মন্ত্রিপরিষদের। আবার নির্বাচনে শামসুল হকের বিজয় শুধু তার নিজের বিজয় ছিল না। এ বিজয় ছিল মুসলিম লীগবিরোধী প্রগতিশীল শক্তির। এ বিজয় ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির বিজয়।

১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিলের নির্বাচন ও ভাষা-আন্দোলনে এদেশের নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষ যেমনি একদিকে নিজেদের আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছিল, অন্যদিকে লীগ সরকারের পক্ষে তাদের দুর্বলতাও ধরা পড়েছিল। যেকোনো বিচারেই এ বিজয় ছিল আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ বিজয় সম্পর্কে মুসলিম লীগ সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা দৈনিক আজাদের ভাষা প্রণিধানযোগ্য। আজাদের সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে লীগ মনোনীত প্রার্থী হারিয়া গিয়াছেন। ইহা মুছলিম লীগ নির্বাচনের ইতিহাসে এক অভিনব এবং অভাবিতপূর্ব ব্যাপার। কোনো সাধারণ নির্বাচনের সময় যদি কোনো একজন লীগ প্রার্থীর পরাজয় ঘটে, তবে তাকে এতখানি গুরুত্ব না দিলেও চলে। কারণ, তখন লীগের নির্বাচন জয়ের প্রচেষ্টা একই সঙ্গে বহুদিকে ছড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু একটা উপনির্বাচনের পরাজয়ের সময় এই ধরনের কৈফিয়ত দিয়া অব্যাহতি লাভ করা যায় না। তারপর বিভক্ত ও অবিভক্ত বাঙলার লীগের ইতিহাসে কোনো পরিষদী উপনির্বাচনের লীগ প্রার্থীর আর কোনো দিন পরাজয় ঘটে নাই। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং জাতির একমাত্র বলিয়া বহুকীর্তিত লীগের ভাগ্যে এই কলঙ্ক স্পর্শ অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা। এক হিসেবে একে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান মর্মান্তিক ব্যাপার বলিয়া চিরকাল বেদনা এবং ক্ষোভের সঙ্গে দেশের মানুষ স্মরণ করিবে।[৪৬]

নির্বাচনের পূর্বে করা নিজেদের অভিযোগের জবাব এরপর আত্মসমালোচনার ভঙ্গীতে দেন ভোল পাল্টাতে পারঙ্গম আজাদ কর্তৃপক্ষ:

> প্রশ্ন জাগে, কেন এইরূপ ঘটনা ঘটিল। পূর্ব বাঙলার লীগের বহু কষ্টে অর্জিত গৌরব আজ কেন এইভাবে কলঙ্কমলিন হইল? এ প্রশ্ন আজ পূর্ব পাকিস্তানের কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেই জিজ্ঞাসা না করিয়া পারেন না। আমাদের মনে হয় এ প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে হইলে বহু দূরে যাইবার কোনো দরকার নেই। একটু তলাইয়া দেখিলেই, একটা সত্য সকলের নিকট পরিষ্কার হইয়া যাইবে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লীগের তাহার জনপ্রিয়তা এবং আবেদনের অনিবার্যতা অনেকখানি হারাইয়া ফেলিয়াছে। পাকিস্তান আনিতে হইবে– লীগের সে অতীত আবেদন আজ আর নাই, যদিও পাকিস্তান রক্ষা করিতে হইবে– এ আবেদন আজও অর্থপূর্ণ। কায়েদে আজমের অতুলনীয় নেতৃত্ব আজ আর নাই; যদিও কায়েদে আজমের অসমাপ্ত কাজের ভার তাঁর স্বনামধন্য অনুসারী নেতাদের দায়িত্ব আজও লীগের; তবু সে দায়িত্ব আজ যথাযথ পালিত হইতেছে না।[৪৬ক]

নির্বাচনের আগে শামসুল হককে দায়ী করে সংগঠনবিরোধী বিশৃংখলাকারী হিসেবে করা অভিযোগের ব্যাপারে আত্মস্বীকৃতি, আত্মশ্লাঘা আর অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ করে আজাদ লিখে:

> লীগের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং লীগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের বিভিন্ন সরকারের ক্ষমতার লোভে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, যাতে লীগের কার্যে ত্রুটি বিচ্যুতি এবং গলদ দেখা দিতেছে। জনগণের মোকাবিলা করে বিশেষভাবে আজ লীগ, কিন্তু সর্বব্যাপী ক্ষমতা পরিচালনা করে সরকার। সরকারের প্রভাব লীগের কার্যকলাপকে আজ সর্বত্র প্রভাবান্বিত করিতেছে। ফলে নিজেদের বিশেষ ত্রুটি ও বিচ্যুতিরই নয়, সরকারি কাজের পাপের বোঝাও লীগকে সমানভাবে বহন করিতে হইতেছে। মুসলিম লীগ আজ সর্বত্র সরকারি ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছার লীগ আর বাহন নয়। এরই দরুন লীগ আজ জনপ্রিয়তা হারাইতে বসিয়াছে। যেদিন হইতে লীগ সরকারি ইচ্ছার প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হইয়াছে সেদিন হইতে তার কার্যকলাপে যথেচ্ছাচার ও দোষ ত্রুটি নানাদিক হইতে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। টাঙ্গাইলে লীগ প্রার্থী মনোনয়নেও ইহা লক্ষিত হইয়াছিল। আমরা কিছুদিন আগে টাঙ্গাইলে লীগের জয়ই কামনা করিয়াছিলাম – কিন্তু মনোনয়নের ব্যাপারে যে প্রকাণ্ড ভুল হইয়াছিল, তা আজ না বলিয়া উপায় নাই। বেশ বুঝা গেল, বহুদিন হইতে বহু ব্যাপারে অনাচার চরমে উঠিয়াছিল এবং তাহাই জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ছিঁড়িয়া দিয়াছে। এ সত্যই টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের ভিতর দিয়া ঘোষিত হইল। টাঙ্গাইলের এই পরাজয় লীগের পরাজয় নিশ্চয়ই; কিন্তু ইহা এক হিসেবে সরকারের ওপর অনাস্থা। নির্বাচনী প্রচার কার্যে পাঁচজন মন্ত্রীর উপস্থিতিও তার ফলাফলকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিল না– ঘটনার ইঙ্গিত আজ সকলকে গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। টাঙ্গাইলের পরাজয়কে এক প্রকাণ্ড বিপদ সঙ্কেত [হিসাবে] সকলকে আজ গ্রহণ করিতে হইবে। লীগের বিরুদ্ধে উত্তোলিত বিদ্রোহের পতাকা একদিন সমগ্র পাকিস্তানকে আচ্ছন্ন করিবে কি না, লীগ এবং পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হইবে কি না, এ কথাও হয়তো এখন হইতেই চিন্তা করিতে হইবে। শুধু চিন্তা নয়, আজ ইহা সকল লীগপন্থিকে চক্ষুন্মিলনের সাহায্য করুক – ইহাই আমাদের প্রার্থনা।[৪৬খ]

সাধুকে সাবধান করার যে বিবৃতি আজাদে প্রকাশিত হয় পরে জনগণের রায়ে তারাই সাবধান হয়েছিলেন। মন্তব্য প্রতিবেদনের জনজবাবের পর আত্মস্বীকৃতিতে আজাদের ভাষ্য:

> আমাদের পাপ কোথায়, গলদ কোনখানে তারই ক্ষমাহীন সন্ধান ও কঠোর প্রতিকারের সঙ্কল্প আজ প্রত্যেক লীগপন্থিকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাঁচা মরার সঙ্কট-সঙ্কেত যদি আজ ইহা হইতে গ্রহণ করিতে না পারে তবে আমাদের বিপর্যয়কে কেউ ঠেকাইতে পারিবে না। লীগকে সকল দুর্বলতা, সকল প্রভাব এবং পতন স্খলনের হাত হইতে মুক্তিদানের অনির্বার ইচ্ছা আজ জাতির মনে জাগিয়া উঠুক। লীগ পুনরায় হোক সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান এবং লীগ আজ আবার পরিচালনা করুক সরকারকে। লীগের ভিতর আবার শিখার মতো জ্বলিয়া উঠুক জাতির ইচ্ছাশক্তি এবং তারই সঙ্গে পূর্ব মহিমায় লীগের প্রতিষ্ঠা হোক জনগণের মনে।[৪৬গ]

তার মানে তাঁরা একথা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে জনগণের মনে আর তাঁদের ঠাঁই অবশিষ্ট নেই। আজাদের উপরোদ্ধৃত সম্পাদকীয়টিতে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি আকরম খাঁকে বাঁচিয়ে শুধু প্রাদেশিক সরকারের ওপর দোষারোপ করা হয়। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনের ওপর একটি প্রবন্ধে সাপ্তাহিক *সৈনিক* নিম্নলিখিত মন্তব্য করে :

> টাঙ্গাইলের সবচেয়ে জাঁদরেল প্রভাবশালী জমিদার, যাঁর পূর্বপুরুষ কলেজ ও অন্যান্য মহান প্রতিষ্ঠান করেছেন– তাঁকে সামান্য একজন নিঃস্ব কর্মী পরাজিত করেছেন– সুতরাং জমিদারি বা তালুকদারি শাসন যে চলবে না তা বলাই বাহুল্য। আজাদ বলেছে, এ নির্বাচন সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছে। আরও জানিয়েছে– বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদই জনগণ চায়। ...শোনা যায় চাটগাঁ উপনির্বাচন লীগ প্রার্থীর নিশ্চিত পরাজয় হবে জেনেই লীগ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন ঘোষণা করছেন না। কিন্তু এভাবে কতদিন আত্ম বা স্বার্থ রক্ষা করা চলবে? টাঙ্গাইল নির্বাচন লোকের চোখ খুলে দিয়েছে। এখন সরকারি প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বা ভোট দিতে কেউ দ্বিধা বা ভয় করবে না। টাঙ্গাইলে মন্ত্রীরাও গিয়েছিলেন সরকারি টাকা খরচ করেই। কিন্তু যে লীগ মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে ছাত্র কৃষক মজুরের জিন্দাবাদে সকল স্থানে মুখরিত হতো, সে মন্ত্রীরাই সেখানে দারুণভাবে অপমানিত ও অপদস্থ হয়েছেন। শুধু তাই নয়। মন্ত্রীদের সব কয়টি সভাই শামসুল হকের মিটিংয়ে পরিণত হয়েছে।[৪৭]

শামসুল হকের এই বিজয়ে তাঁর নিকটজনদের মূল্যায়ন আরও বস্তুনিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–

> ১৯৪৭ সালে যে মুসলিম লীগকে লোকে পাগলের মতো সমর্থন করছিল, সেই মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয় বরণ করতে হলো কী জন্য? কোটারি, কুশাসন, জুলুম, অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা না করার ফলে। ইংরেজ আমলের সেই বাঁধাধরা নিয়মে দেশের শাসন চলল। স্বাধীন হলেও দেশ চলল উল্টো নিয়মে।[৪৮]

শামসুল হকের বিজয়কে কেন্দ্র করে শুধু টাঙ্গাইল নয়, ঢাকায়ও বিজয় উৎসব শুরু হয়। আর এই বিজয় উৎসব পালন করা হয় বিভিন্ন স্থানে শামসুল হককে সম্বর্ধনা দিয়ে। এই সমস্ত সংবর্ধনার মধ্যে সবচেয়ে বিশাল আকারের ছিল ঢাকার সংবর্ধনা এবং তার নিজ গ্রাম টেউরিয়ার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি। ২৬ এপ্রিল নির্বাচনের কয়েকদিন পর টেউরিয়ার সংবর্ধনা সভাতে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। পল্লিগ্রামে ঐ ধরনের বিরাট সমাবেশ হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। সংবর্ধনা সভাতে শামসুল হক দীর্ঘ সময় বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে:

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক শাসন ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। কারণ, মুসলিম লীগ সরকার বাংলার মানুষকে শাসন করবে, শোষণ করবে। তারা বাংলার মানুষের উন্নয়নের জন্য কোনো কাজ করবে না, বাংলার মানুষকে পঙ্গু করে ছাড়বে। কাজেই মুসলিম লীগ সরকারের

শাসন ও শোষণের হাত থেকে বাঁচার তাগিদেই আজ আমাদের সংগঠিত হতে হবে। আর আমাদের সংগঠিত হওয়ার প্রশ্নেই রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। শামসুল হক আরও বলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং তাঁকে সভাপতি করে একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা হবে। তার সুদীর্ঘ বক্তব্য শোনার পর জনমনে মুসলিম লীগবিরোধী নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। এখান থেকেই নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে তুললে যে এদেশের গণমানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার ব্যাপারে জনমনে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে শামসুল হকেরও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস জাগে। এদিক দিয়ে বিচার করে বলা চলে, বিরোধী দল গঠনের পিছনে টেউরিয়া গ্রামের সংবর্ধনার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।[৪৯]

বিজয়ী শামসুল হককে ১৯৪৯ সালের ৮ মে ঢাকায় সর্বস্তরের মানুষের পক্ষ থেকে এক বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সুশোভিত মোটর গাড়িতে শামসুল হককে নিয়ে এক বিশাল মিছিল, সংবর্ধনা স্থান ভিক্টোরিয়া পার্কে উপস্থিত হয়। মিছিলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন শওকত আলী, কামরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান, আলী আমজাদ খান-সহ আরও অনেক। বেলা একটার সময় সংর্ধনার কাজ যথারীতি শুরু করা হয়। সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ইয়ার মোহাম্মদ সাহেব। সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত শামসুল হক। তিনি যখন ভাষণ দেওয়ার জন্য মাইকের সামনে দাঁড়ান তখন বিপুল করতালি আর 'শামসুল হক জিন্দাবাদ' ধ্বনি সম্বর্ধনা স্থানকে প্রকম্পিত করে তুলে। তিনি এই সম্বর্ধনা-সভায় প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তব্য রাখেন।[৫০]

তিনি মুসলিম লীগ সরকারের সকল প্রকার বৈষম্যমূলক শাসনের বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। সংবর্ধনা সভায় শপথ নিয়ে তিনি বলেন, 'শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, মানুষের দাবি আইন পরিষদে তুলে ধরাই আমার প্রধান দায়িত্ব। আমি বিশ্বাস করি এ ব্যাপারে আমার কণ্ঠে শক্তির অভাব হবে না।' শামসুল হক বক্তৃতার উপসংহারে বলেন, দেশে আজ যে সমস্যার পাহাড় জমে উঠেছে, তার কোনোটা থেকে কোনোটা বিচ্ছিন্ন নয়। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে। কিন্তু সবার আগে নজর দিতে হবে পল্লির কোটি কোটি ভূখা, বঞ্চিত চাষি ভাইদের দিকে। কারণ, সমাজের প্রাণ তারা। শামসুল হক তাঁর বক্তব্যে এখানেও বলেন, পাকিস্তানি মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হলে আমাদের নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সেই রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই বাংলার মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।[৫১]

১৯৪৯ সালের টাংগাইল উপনির্বাচনে শামসুল হকের বিজয় এদেশের রাজনীতিতে নতুন যাত্রপথের সূচনা করে। সোহরাওয়ার্দীর একটি উক্তি এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য–

> The Victory of Mr. Shamsul Hoque in the by election of Tangail is great feather of our political gap and...we can very well start from here.[৫২]

শামসুল হকের এ বিজয় লীগ সরকারের ওপর অনাস্থা-সহ পাকিস্তানের সংহতির মূলেও আঘাত চিহ্ন হিসেবে ছিল সুস্পষ্ট। প্রখ্যাত সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী বলেন, "৭১ এর যুদ্ধ শুরুর মূল কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে '৪৯ এর এই উপ-নির্বাচন।' এ বিজয় ছিল প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে বিশাল আঘাত যা আন্তর্জাতিক বিবেককেও আশান্বিত করে তোলে।

সমসাময়িক লন্ডন ডেইলির ভাষ্য: It is not only a victory of Mr. Shamsul Haque, but it is a threatning to the reactionary government of the world over.[৫৩]

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। '৪৯-এর উপনির্বাচন নিয়ে যে ব্যতিক্রমী ইতিহাস সৃষ্টি হয়, সেখানে সময় এবং পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও এক্ষেত্রে ব্যক্তি শামসুল হকের মূল্যায়ন কেমন হতে পারে? শামসুল হকের মতো সুযোগ্য আস্থা অর্জনকারী প্রতিনিধির আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ঘিরে সময় এবং পরিবেশের অপূর্ব মিলনে নবতর ইতিহাস সৃষ্টি হয়। নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু শামসুল হককে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মতো তাঁর বিরুদ্ধেও একটি নির্বাচনী মামলা দায়ের করা হয়। মামলা করতে সরকার প্রার্থীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে অধম ব্যক্তিকেই বেছে নেয়, কেননা পন্নী কিংবা ড. আলীম আল রাজী-সহ তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বীদের কেউই রাজি হলেন না জনধিকৃত হওয়ার ভয়ে। কিন্তু নির্বাচনে সবচেয়ে কম ভোট পাওয়া ব্যক্তিকে দিয়ে সরকার তাঁদের প্রতিশোধপরায়ণতা হাসিলের পথ খুঁজে নেয়।[৫৪]

পূর্ব-পাকিস্তান সরকার বিচারপতি আমিনউদ্দিন আহমেদ, এনায়েতুর রহমান এবং শহরউদ্দিনের সমন্বয়ে একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে এবং সেই ট্রাইবুনালের ওপর নির্বাচনী মামলাটি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। ট্রাইবুনাল এর প্রথম বৈঠকেই স্থির করে যে, মামলাটির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি শামসুল হক আইনসভায় আসন গ্রহণ করতে পারবেন না।[৫৫]

একটি নির্বাচনী ইস্তেহারকে ভিত্তি করে দক্ষিণ টাঙ্গাইল নির্বাচনে বিজয়ী শামসুল হকের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

বন্ধু-বান্ধব ও মুরিদদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আসাম প্রদেশের ধুবড়ী শহরে উপস্থিত হলে আসাম সরকার মার্চ মাসের মাঝামাঝি তাঁকে গ্রেফতার করে। টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের সময় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ধুবড়ী জেলে অবস্থান করছিলেন। হযরত আলী নামের শামসুল হকের একজন সহকর্মী সেখানে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে দেখা করে শামসুল হকের পক্ষে একটি ইস্তেহারে তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে আসেন। নির্বাচনী প্রচারণার কাজে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর স্বাক্ষরযুক্ত সেই ইস্তেহার বিলি করা শুরু হলে, কামরুদ্দীন আহমদ তৎক্ষণাৎ সেগুলো বিলি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে ছাপা ইস্তেহারগুলো নষ্ট করে দেন। কিন্তু তার আগেই বেশকিছু সংখ্যক ইস্তেহার নির্বাচনী এলাকায় বিলি হয়ে গিয়েছিল। ইস্তেহারটিতে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর স্বাক্ষরের ফ্যাক্সিমিলি পর্যন্ত ব্লক করে দেয়া হয়েছিল।[৫৬]

ইস্তেহারটির বিলি বন্ধ করার নির্দেশ সত্ত্বেও তার কপি মুসলিম লীগ কর্মী ও সরকারের পক্ষের লোকদের হস্তগত হয়। এবং নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর এই মর্মে তারা শামসুল হকের নির্বাচন বাতিলের আবেদন করে যে, নির্বাচনে তিনি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর স্বাক্ষর জাল করে জয়লাভের উদ্দেশ্যে অসৎপন্থা অবলম্বন করেছেন। এই নির্বাচনী মামলা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত চলে এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ট্রাইব্যুনালে শামসুল হকের পক্ষে সেই মামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঢাকা আসেন। সেই সময় ১৯ জুলাই ১৯৫০ সালে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি তাঁকে জানান যে, ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁর কার্যাবলি ইলেকশন ট্রাইবুনালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ঢাকা শহরের বাইরে অন্য কোনো স্থানে যেতে অথবা কোনো জনসভায় বক্তৃতা করতে পারবেন না। নির্দেশ অমান্য করলে তাঁকে গ্রেফতার করারও প্রয়োজন হতে পারে। প্রাদেশিক সরকারের এই নির্দেশ পাওয়ার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তিনি পাকিস্তানের উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করেন এবং পূর্ব-পাকিস্তান সরকার গণতন্ত্রের মূলনীতিকে কেন যে উপেক্ষা করে চলেছেন তার কারণ উপলব্ধি করতে তিনি অক্ষম।

এক বৎসরের বেশি সময়কাল টাঙ্গাইল নির্বাচনী মামলা চলার পর তার রায় বের হয় এবং শামসুল হকের নির্বাচনকে ট্রাইব্যুনাল বাতিল ঘোষণা করেন।[৫৭] টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে পরাজিত হয়েও সরকারের চোখ খুলল না। সরকারি দল তাদের সভায় ঘোষণা করল, যা কিছু হোক, শামসুল হক সাহেবকে আইনসভায় বসতে দেয়া হবে না।[৫৮] তাঁরা তা করেছিল তবে নিজেদের ধ্বংস করে। কেননা, ১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিলের নির্বাচনের বিজয়কে কেন্দ্র করেই পরবর্তী সময়ে এদেশের বিরোধী শক্তি

সংগঠিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিজয়ী বীর শামসুল হকের নেতৃত্বেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বপ্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়, যা আজ আওয়ামী লীগ নামে পরিচিত। এই সংগঠনের হাত ধরেই তাঁদের চরম বিনাশ সাধিত হয় এবং দেশ লাভ করে চূড়ান্ত স্বাধীনতা।

এই তাৎপর্যবাহী নির্বাচনের পর পাকিস্তানের একটি দেশীয় রাজ্যের মুসলিম লীগের সভাপতি মনজুর আলম করাচিতে এক সাংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, পূর্ববাংলার একটি উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয় খুবই অর্থপূর্ণ। মুসলিম লীগ যে আর সকল মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে না এই নির্বাচনই তা প্রমাণ করেছে। মনজুর আলম পাকিস্তান গণপরিষদ, প্রাদেশিক আইনসভা ও মুসলিম লীগের নতুন নির্বাচন দাবি করেন।[৫৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, টাঙ্গাইল নির্বাচনে লীগ প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয়ের পর পূর্ববাংলার ৩৪টি আসনে উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে নূরুল আমীন সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় অন্য কোনো এলাকাতেই উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেননি।[৬০]

উপসংহার

শামসুল হকের পূর্ব-পরিচয় একজন রাজনৈতিক সংগঠকের। তিনি সুবক্তা ছিলেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু তিনি মুসলিম লীগের প্রার্থী প্রজাবৎসল জমিদার খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করতে পারবেন, তা কল্পনাতীত ছিল। মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, সকল প্রতিকূলতা জয় করেছে শামসুল হকের নেতৃত্ব গুণ। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী-সহ কয়েকজন মন্ত্রী ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জনপ্রিয় নেতাদের পাশ কাটিয়ে জনতা যেভাবে শামসুল হকের পক্ষে কাজ করেছে, তা ছিল অভাবনীয়। সরকারি দলের জনসভা যেভাবে শামসুল হকের নির্বাচনী সভায় রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। ষড়যন্ত্র করে মওলানা ভাসানীর নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিল সত্যি, কিন্তু তাতেই জনগণ বিগড়ে গিয়েছিল, তা একমাত্র সত্যি নয়। আর মওলানা ভাসানী ছিলেন মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী। পক্ষান্তরে, শামসুল হক একেবারেই নবীন তারপরও জাতীয় পত্রিকা-সহ প্রচার মাধ্যম, ইসলামের নামে মোল্লাদের অপপ্রচার আর জমিদারি প্রভাব তো ছিলই, এই প্রভাব কেমন হতে পারে? প্রাবন্ধিক বিগত ২০১১ সালের ইউপি নির্বাচনে জমিদার পরিবারের প্রার্থীর প্রচার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে তা অবলোকন করেন। জমিদার পরিবারের প্রার্থীকে তাঁর সাবেক প্রজাগণ টাকার মালা পরিয়ে দিয়েছেন আর তাঁদের ভক্তি প্রকাশের যে ধরন তা শুধু দেব ভক্তিরই শামিল আর নির্বাচনী ফলাফলও জমিদার তনয়ের পদচুম্বন করেছে একাধিক জনপ্রিয় প্রার্থীর বিপরীতে।

সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচনে বিরোধিতার ধরন থেকে প্রতীয়মান হয় নির্বাচনকে তাঁরা কীভাবে গ্রহণ করেছিল। একথা ঠিক নির্বাচনের প্রত্যক্ষ ফল থেকে জয়ী পক্ষকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু তার যে ভয়াবহ পরিণতি শাসকদের ভোগ করতে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। জনপ্রতিনিধিত্বের বিকল্প পথ হিসেবে রাজনৈতিক দল গঠন করা তার একটি বড় সুফল। আর আওয়ামী মুসলিম লীগের পরিবর্তিত নাম আওয়ামী লীগ, যার হাত ধরেই এদেশের রাজনৈতিক অর্জনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো এসেছে। কাজেই একথা বলা যায়, পরবর্তী সকল ঘটনাপ্রবাহে এই নির্বাচন ভূমিকা রেখেছিল এক উজ্জ্বল প্রতীকের মতো।

তথ্যসূত্র

১. তাহমিনা খান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতির সাংগঠনিক বিকাশ ১৯৪৭-১৯৫৭* (ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৪) পৃ. ৯৮

২. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *স্বাধিকার আন্দোলনে শামছুল হক* (টাঙ্গাইল: শামছুল হক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২) পৃ. ৩৮

৩. তাহমিনা খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮

৪. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা : নওরোজ কিতাব মহল, ২০০৬) পৃ. ২৩৯

৫. কোনো কারণে পিতার সঙ্গে দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে পিতার আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে খুররম খান পন্নীর আসন শূন্য ঘোষিত হয়। তাঁর পিতা অভিযোগ করেন যে, নির্বাচনের মনোনয়নপত্র পূরণকাল অবধি প্রার্থী হওয়ার জন্য তাঁর বয়স পূর্ণ হয়নি। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি তাঁদের বিয়ের কাবিননামা দাখিল করেন, ফলে পন্নীর আসন শূন্য ঘোষিত হয়। সুলায়মান কবীর, *বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী*, (ঢাকা, সুবর্ণ, ২০২০), পৃ. ৫৪ ও ৭০ (তথ্যসূত্র ১৮০খ)।

৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, (ঢাকা : ইউপিএল, ২০১৩), পৃ. ১০১

৭. Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh Politics and Functioning of the East Bengal Legislature1947-58* (Dhaka: University of Dhaka, 1980) P. 82.

৮. Ibid, P. 85

৯. Ibid

১০. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১২) পৃ. ২১৩

১১. শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫

১২. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৪) পৃ. ৯৭

১৩. তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৬) পৃ. ১১

১৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫

১৫. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *স্বাধিকার আন্দোলনে শামছুল হক* (টাঙ্গাইল: শামছুল হক

ফাউন্ডেশন, ১৯৯২) পৃ. ৪১

১৬. তপন কুমার দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১; মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

১৭. *দৈনিক আজাদ*, ২০ এপ্রিল ১৯৪৯; উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৩-১৪

১৭ক. ঐ,

১৮. তাহমিনা খান, *পাকিস্তানের প্রথম দশক, ১৯৪৭-১৯৫৭: পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক বিবর্তন* (এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, জুন ২০১০) পৃ. ১৩৫

১৯. *দৈনিক আজাদ*, ২৩ এপ্রিল ১৯৪৯, দ্রষ্টব্য, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৭

২০. *দৈনিক আজাদ*, উদ্ধৃত বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৭

২১. Najma Chowdhury, op. cit., P. 381

২২. তপন কুমার দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

২৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭

২৪. তপন কুমার দে, *পূর্বোক্ত* পৃ. ১১

২৫. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৪

২৬. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫* (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, নভেম্বর ২০১৫) পৃ. ৮৯, দ্রষ্টব্য, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৪

২৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৪, দ্রষ্টব্য, তপন কুমার দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

২৮. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৪

২৯. তপন কুমার দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২, দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০

৩০. ঐ, পৃ. ৪১

৩১. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৫

৩২. ঐ, পৃ. ২১৪-২১৫

৩৩. তপন কুমার দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২-১৩

৩৪. মাহমুদুর রহমান মান্না, 'খোলা কলম', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৩৫. সাক্ষাৎকার : আবুল কালাম মোস্তফা লাবু, ডা. সাইফুল ইসলাম স্বপন।

৩৬. তপন কুমার দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

৩৭. ঐ, পৃ. ১৩

৩৮. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩

৩৯. তপন কুমার দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

৪০. ঐ, *পৃ.* ১৪-১৫

৪১. সাক্ষাৎকার: আবুল কালাম মোস্তফা লাবু।

৪২. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৭

৪৩. সাক্ষাৎকার: ঐ

৪৪. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৭

৪৫. হাফিজউদ্দিন আহমদ, 'শব মিছিল আমি দেখেছি', *দৈনিক ইনকিলাব* (২৬ সেপ্টেম্বর ৯৯); উদ্ধৃত, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮

৪৬. *দৈনিক আজাদ*, ৩ মে ১৯৪৯

৪৬ক. ঐ

৪৬খ. ঐ

৪৬গ. ঐ
৪৭. *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ৬ মে, ১৯৪৯
৪৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৯
৪৯. তপন কুমার দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭
৫০. ঐ, পৃ. ১৬-১৭
৫১. ঐ, পৃ. ১৭
৫২. মোঃ হযরত আলী সিকদার, 'টাঙ্গাইলের অগ্নিপূরুষ শামছুল হক', *ফাল্গুনী* (টাঙ্গাইলঃ টাঙ্গাইল সমিতি, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮) পৃ. ৭০
৫৩. ঐ
৫৪. সাক্ষাৎকার : ডা. সাইফুল ইসলাম স্বপন ও আবুল কালাম মোস্তফা লাবু ।
৫৫. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, ২২১
৫৬. ঐ
৫৭. তপন কুমার দে, *পূর্বোক্ত*, ১৮
৫৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৯
৫৯. সাপ্তাহিক *নওবেলাল*, ২ জুন ১৯৪৯
৬০. Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, First session 1948.vol I P. III, VI No.1 Fourth Session 1949-50, vol IV, No 1 p.I- VII, Eleventh Session 1953 Vol XI No.1 P. I-V, উদ্ধৃত, মোঃ হাবিবউল্লাহ্ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য* ১৯৪৭-১৯৬৯ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫) পৃ. ৪৯০

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

আঞ্জুমানে ইসলামিঃ বাংলার প্রথম মুসলিম সংগঠন

সুলায়মান কবীর

সারসংক্ষেপঃ উনিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলায় অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায় সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংগঠিতভাবে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহী বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় অন্যান্য বিষয়ের মতো সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে। সে কারণেই ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে ইসলামি'র পূর্বে আর কোনো মুসলিম সমিতি বা সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আঞ্জুমানে ইসলামি প্রতিষ্ঠার পরপরই প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় এই সংগঠনের প্রতি শুভকামনা জানায়। সংগঠনটি শুরু থেকেই ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে এবং মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য বিবিধ প্রচেষ্টা অবলম্বন করে। কিন্তু ইংরেজি বা আধুনিক শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ, পশ্চাৎপদ চিন্ত-চেতনা ও নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে সংগঠনটি নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে পারেনি। তা সত্ত্বেও বাংলা তথা ভারতের প্রথম মুসলিম সংগঠন বা সমিতি হিসেবে আঞ্জুমানে ইসলামির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সংগঠন বা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা ও চেতনার প্রসার-সহ সামগ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু সম্প্রদায় ও ইউরোপীয়দের উদ্যোগে বাংলায় অসংখ্য সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলোর দু-চারটিতে কলকাতাবাসী (প্রধানত অবাঙালি) মুসলমান সম্প্রদায়ের নগণ্য ভূমিকা লক্ষ করা যায়। কিন্তু সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন ও চরম পশ্চাৎপদ এই সম্প্রদায় সেসময় নিজেদের উদ্যোগে কোনো সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনই অনুভব করেনি।[১] তাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সভা হলো আঞ্জুমানে ইসলামি (১৮৫৫)। ইংরেজিতে একে মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (Mohamedan Association) বলা হতো। এটি কেবল বাংলায় নয়; সমগ্র ভারতে মুসলিম উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সংগঠন।[২]

প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও প্রতিক্রিয়া

উনিশ শতকে বাংলার মুসলমানরা ছিল পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়। প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা

*** পিএইচডি, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল**

অনেক পিছিয়ে পড়ে। ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজ সরকারের প্রতি সহযোগিতামূলক নীতি থেকেও তাদের অবস্থান দূরবর্তী ছিল। অন্যদিকে ইংরেজবিরোধী ওয়াহাবি আন্দোলনেও তাদের সক্রিয় সমর্থন-সহযোগিতা ছিল। এ কারণে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সাথে বাংলা তথা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন এ সম্পর্ক সমকালীন পরিস্থিতিতে তাদের অগ্রগতির পথে ছিল বিরাট বাধা। এরকম প্রেক্ষাপটে ভারতীয়দের অধিকার আদায়ে সমকালীন সংগঠন ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জোর তৎপরতা কলকাতাবাসী সচেতন মুসলমানদেরকে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। কেবল ভারতীয়রাই এর সদস্য ছিলেন বলে একে ভারতবর্ষীয় সভাও বলা হতো। সরকারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ভারতীয়দের অধিকার আদায় এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উচ্চবিত্ত ভূ-স্বামী শ্রেণি এই সংগঠনের মূল নিয়ন্তা হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেকেই এতে যোগ দেন। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের সনদ আইনে (Charter Act)[৩] কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে এটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আবেদনপত্র পাঠায়। আবেদনপত্রে ভারতে একটি আইন পরিষদ গঠন এবং এর অধিকাংশ আসন ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষণের দাবি জানানো হয়।[৪] এ বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত আলোচনায় স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে (পরবর্তীকালে বাংলার লে. গভর্নর) উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলেন: 'ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে গুরুতর মত-পার্থক্য আছে। সুতরাং উপযুক্ত ভারতীয় নেতা থাকলেও কোনো একজন ব্যক্তিকে উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধি মনোনীত করা কঠিন হবে।' ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল (১৮৪২-৪৪) লর্ড এলেনবরা হ্যালিডের মত সমর্থন করেন এবং আইন প্রণয়নে সুবিধার জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের দুটো আলাদা 'পরামর্শ-সমিতি' গঠনের প্রস্তাব দেন।[৫] এ প্রেক্ষাপটে সরকারের কাছে নিজেদের মতামত তুলে ধরতে কলকাতার সচেতন মুসলমানগণ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অনুরূপ একটি সংগঠন গড়ে তুলতে তৎপর হন। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, আঞ্জুমান গঠনের প্রেরণা মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে নয়, বরং বাইরে থেকে বা ব্রিটিশদের কাছ থেকে এসেছে। আর সঙ্গত কারণেই এটি শর্তহীনভাবে ব্রিটিশ অনুগত থাকার নীতি গ্রহণ করে।[৬]

আঞ্জুমানে ইসলামি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোগ নেন আইন-কর্মকর্তা মৌলবি মুহাম্মদ মজহার। তিনি ছিলেন কলকাতার শিক্ষিত ও সচেতন মুসলমান পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা কাজী গোলাম সোবহান ছিলেন কলকাতা সদর আদালতের

কাজী-উল-কুজ্জাত[৭] বা প্রধান কাজী। মৌলবি মজহারের আহবানে তাঁর তালতলার বাসভবনে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শহরের অভিজাত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হন। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় ফারসি পত্রিকা *দূরবীন*-এর সম্পাদক মৌলবি মুহাম্মদ আবদুর রউফ বলেন:

> ...আমাদের সমাজের অবস্থা পূর্বের ঠিক বিপরীত। শক্তি, সম্পদ ও প্রভাবহীন এই সম্প্রদায়ের চারপাশে এখন শুধু দারিদ্র্য আর দুরবস্থা। যাতে তারা বিস্মৃতি ও জড়তার গহ্বরে আরো তলিয়ে না যায়–তার জন্য সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও চেতনাসম্পন্নদের তিলমাত্র বিলম্ব বা ইতস্তত না করে স্বজাতির উন্নয়নে এগিয়ে আসা উচিত।[৮]

বলা বাহুল্য, মৌলবি আবদুর রউফ সভায় উপস্থিত সকলের মনের কথাই দৃপ্তস্বরে উচ্চারণ করেন। এ প্রসঙ্গে আরও আলোচনার পর সকলের সম্মতিক্রমে বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে আঞ্জুমানে ইসলামি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইসাথে সংগঠন পরিচালনা ও সাধারণ সভা আহবানের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। এতে কাজী ফজলুর রহমান সভাপতি, কাজী আবদুল বারী সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মদ মজহার ও মুহাম্মদ আবদুর রউফ যৌথভাবে সম্পাদকের দায়িত্ব পান।[৯] এর পরের সাধারণ সভায় (সম্ভবত ২৩ জুলাইয়ের সাধারণ সভায়) আঞ্জুমানের পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের তালিকা নিম্নরূপ:

সভাপতি	:	মৌলবি ফজলুর রহমান, খান বাহাদুর, কাজী-উল-কুজ্জাত (কলকাতা সদর আদালত)
সহ-সভাপতি	:	কাজী আবদুল বারী ও মৌলবি মোহাম্মদ ওজীহ্ [ওয়াজীহ]
সদস্য	:	মৌলবি আহমদ, মৌলবি আবদুস সামাদ, মৌলবি আবদুল লতিফ, মৌলবি মোহাম্মদ মজহার, মৌলবি মোহাম্মদ আবদুর রউফ, মৌলবি জোয়াদ আলী, মৌলবি গোলাম ঈসা, মৌলবি আবদুল হাকিম, মৌলবি আবদুল জব্বার, মৌলবি গোলাম এহইয়া [ইয়াহিয়া], সৈয়দ মারহুমাত হোসেন, সৈয়দ ফজলি, হাজি মোহাম্মদ খান ও মৌলবি মোহাম্মদ মাজদের।
অনারেরি সেক্রেটারি	:	মৌলবি মোহাম্মদ মজহার।[১০]

কার্যনির্বাহী কমিটির প্রায় সকলেই মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। কয়েকজনের পরিচিতি ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদের মধ্যে আরও কয়েকজনের পরিচয় জানা যায়। বিহারের অধিবাসী মুহাম্মদ ওয়াজীহ্ ছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার আরবি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। চট্টগ্রামের অধিবাসী কাজী আবদুল বারী কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৮২৭ থেকে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা সদর আদালতের কাজী ছিলেন। আবদুল লতিফ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পরবর্তীকালে তিনি মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা (১৮৬৩) ও পরিচালনার মাধ্যমে বাংলার মুসলমান সমাজের অগ্রগতিতে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। আবদুল জব্বার ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষার্থী। পরবর্তীকালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। গোলাম ইয়াহিয়া ছিলেন বীরভূমের প্রধান সদর আমিন (১৮৪৩-৫৫)। আবদুর রউফ (১৮২৮-৯৬) কলকাতার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে সদর দেওয়ানী আদালতের মুনশি (অনুবাদক), পরে বড়লাটের ব্যবস্থাপক পরিষদের মীর মুনশি (প্রধান অনুবাদক) হন। সাপ্তাহিক *দূরবীন* ছাড়াও তিনি সাপ্তাহিক *উর্দু গাইড*ও সম্পাদনা করতেন। কবি ও লেখক হিসাবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠা, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও পরিচালনার নানা কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সভায় ফারসিতে প্রবন্ধ পাঠ করতেন। মৌলবি আবদুস সামাদ কবি ও লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ২৮ নং জানবাজার স্ট্রিটের বাসভবনে আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্র লিখিত হয়। তিনি একাধিক সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। খ্রিষ্টান মিশনারিরা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করতেন আবদুস সামাদ সেসবের পাল্টা জবাব দিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন এবং আঞ্জুমানের সভায় তা পাঠ করতেন ও সাপ্তাহিক *দূরবীন*-এ প্রকাশ করতেন।[১১]

আঞ্জুমানে ইসলামি প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতার সচেতন মুসলমান সমাজে উৎসাহের সঞ্চার হয়। সেইসাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং তাদের পরিচালিত পত্রিকাগুলোতে এ বিষয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ করা যায়। *The Hindoo Patriot* পত্রিকা ২৪ মে (১৮৫৫) আঞ্জুমানের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে লিখে, '... an institution of great usefulness and advantage to the community it represents and to the country at large.'[১২] সমকালীন আরেকটি পত্রিকা *সোমপ্রকাশ*-এ 'যবন'[১৩] বা মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক একটি 'সভা' প্রতিষ্ঠায় সন্তোষ প্রকাশ করে লেখা হয়:

> ...নগরবাসী সদ্বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত যবনেরা স্বজাতির হিত বর্ধনার্থে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন; তাহার বিবরণ আমরা ইংরাজি পত্রে পাঠ করিয়া যে-প্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে বহুবিধ সভা স্থাপিত থাকাতে অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের

> উপকার হইতেছে ও ইংরাজ জাতির সহিত হিন্দু জাতির সদ্ভাবের ক্রমশ আধিক্য হইয়া আসিতেছে এবং হিন্দু মণ্ডলীর মধ্যে একতা বন্ধনের সূত্র সঞ্চারিত হইয়াছে; কিন্তু কি পরিতাপ! যবন জাতির মধ্যে একাল পর্যন্ত কোন প্রকার সভা স্থাপিত হয় নাই, গবর্নমেন্ট যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, তাঁহারদিগের কার্যবিষয়ে যবনজাতি কোন কথাই উল্লেখ করেন না, ইহাতে সভ্য লোকেরা ভারতবর্ষবাসী যবনগণকে অসভ্য বলেন। ... এদেশে অল্প যবন বাস করে না, কোন কোন প্রদেশে হিন্দু ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যবনের সংখ্যা অধিক, অতএব তাহারদিগের মঙ্গলোদ্দেশ্যে কোন প্রকার সভা না থাকাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম ; অধুনা নগরবাসী সম্ভ্রান্ত ও সদ্বিদ্বান যবনেরা আমারদিগের সেই দুঃখ নিবারণ করিলেন।[১৪]

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

ভারতীয় মুসলমানদের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধন আঞ্জুমানে ইসলামির সাধারণ লক্ষ্য ছিল। তবু, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

(i) ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা;

(ii) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন ভারতীয় জনগণ, বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণ সাধনের উপায় অন্বেষণ;

(iii) আগে থেকেই বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এরূপ সকল সমস্যা সমাধানে ভারত ও ইংল্যান্ডে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন প্রেরণ এবং অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত উপায় অনুসরণ;

(iv) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসিত মুসলমান প্রজাদেরকে বেআইনি পথ পরিহার ও সঠিক পথ অনুসরণে সহায়তার মাধ্যমে ভারতে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও উন্নতি বিধান;

(v) ব্রিটিশ সরকার বিব্রত ও অসন্তুষ্ট হতে পারে মুসলমান সম্প্রদায়ের এরূপ বিদ্রোহাত্মক ও বিরূপ মনোভাব নিরুৎসাহিত করা এবং সরকারের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।[১৫]

উল্লিখিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আঞ্জুমানের উদ্যোক্তারা বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ওয়াহাবি[১৬] ও ইংরেজবিরোধী মনোভাব সম্পর্কে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ প্রেক্ষাপটে তাঁরা ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি সহায়তা ও আনুকূল্য লাভ এবং এ প্রক্রিয়ায় পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কাজ করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, আঞ্জুমানের উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাদের প্রায় সকলেই সরকারি অফিস-আদালতে কর্মরত ও সরকারি নীতির সমর্থক ছিলেন।

উদ্যোক্তারা আঞ্জুমানকে সাধারণ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল একটি সংগঠনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তাঁরা গঠনতন্ত্র ও অন্যান্য বিষয় অনুমোদনের জন্য জুলাই (১৮৫৫) মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা টাউন হলে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই এরকম গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে সভাস্থলে উপস্থিত সকলকেই সরকার জোরপূর্বক খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করবে। এমন গুজবও ছড়ায় যে, সরকার মুসলমানদের খৎনা প্রথাও বন্ধ করে দিবে। ফলস্বরূপ প্রায় বারো হাজার উত্তেজিত লোক সভাস্থলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে নেতৃবৃন্দ সভা ভেঙে দিতে বাধ্য হন। এর কয়েকদিন পর ২৩ জুলাই স্থগিত সভাটি আবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় চারশত মুসলমান ভদ্রলোক অংশগ্রহণ করেন। সভার কার্যক্রম উর্দুতে পরিচালিত হয়। এতে আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্র বা বিধানগুলো অনুমোদিত হয় এবং কিছু নতুন সদস্যও নির্বাচিত হয়।[১৭] সাধারণ সভার মাধ্যমে আঞ্জুমান সাংগঠনিকভাবে দৃঢ় ভিত্তি পায় এবং এরপর থেকে এটি মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করতে তৎপরতা শুরু করে।

সমকালীন অন্যান্য সভা-সমিতির মতো আঞ্জুমানে ইসলামিও মাসিক সভার আয়োজন করত। এতে উর্দু ও ফারসি ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো। সভার কার্যবিবরণী লেখা হতো ফারসিতে। সমকালে খ্রিষ্টান মিশনারিরা ইসলামের বিরুদ্ধে নানাবিধ অপপ্রচার চালাত। সেসব অপপ্রচারের পাল্টা জবাব হিসেবে প্রবন্ধ লিখে আঞ্জুমানের সভায় পাঠ করা হতো এবং পরে সেগুলো *দূরবীন* পত্রিকায় ছাপানো হতো।[১৮] ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, *দূরবীন* ছিল ফারসি পত্রিকা। শিক্ষিত মুসলমান সমাজের বাইরে এ পত্রিকার পাঠক ছিল না বললেই চলে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সাথে আঞ্জুমানের প্রত্যক্ষ কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

সমকালীন মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আঞ্জুমানের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি কলকাতা সদর আদালত আইন-পেশার (pleadership) জন্য ইংরেজি জ্ঞান আবশ্যক বলে সার্কুলার জারি করে। এ সার্কুলার ইংরেজি না-জানা মুসলিম আইনজীবীদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় সেপ্টেম্বর মাসে আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে বাংলার লে. গভর্নর ফ্রেডারিক হ্যালিডের কাছে ঐ সার্কুলার সংশোধনের জন্য আবেদন জানানো হয়। এ আবেদনে তিনি সম্মতি দেন এবং আইন পেশায় ইংরেজির আবশ্যকতা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এতে মুসলিম আইনজীবীদের তেমন উপকার হয়নি। সদর আদালত তাঁদের বেশির ভাগ আবেদনই বাতিল করে দেয়।[১৯] তবু মুসলিম স্বার্থরক্ষায় আঞ্জুমানের প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। সেইসাথে এটাও বলা প্রয়োজন, যুগধর্মের চাহিদা ইংরেজি-জানা উৎসাহিত না করে উর্দু-ফারসি আঁকড়ে থেকে এটি রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের প্রকৃত উপকার করতে পারেনি।

১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে আইন পরিষদ কলকাতা শহরে গ্যাস-বাতি লাগানোর জন্য বিশেষ কর ধার্যের পদক্ষেপ নেয়। এ উদ্যোগকে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসিতা আখ্যায়িত করে আঞ্জুমান গ্যাস-বাতির জন্য কর ধার্যের বিরোধিতা করে আইন পরিষদে আবেদন জানায়। সম্ভবত মুসলমান সম্প্রদায়-সহ দরিদ্রদের কথা চিন্তা করে আঞ্জুমান উক্ত আবেদন জানায়। কিন্তু সংগঠনটির এ ধরনের পদক্ষেপকে পশ্চাৎপদতা ও বর্বরতা (barbarism) আখ্যায়িত করে সমকালীন পত্রিকা *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* কটাক্ষপূর্ণ ভাষায় মন্তব্য করে:

> The petitioners held gas to be a useless luxury. They, therefore, object to pay. Which is to rule, the barbarism which calls gas a "luxury" or the civilization which hold it to be a necessity.[২০]

অন্যদিকে, খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য সম্পর্কেও আঞ্জুমানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংগঠনটি ক্রমবর্ধমান রপ্তানিকেই খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী করে এবং এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠানোর প্রস্তাব গ্রহণ করে।[২১]

১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝিও আঞ্জুমানের সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। ২৪ জুলাইয়ের *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* পত্রিকা থেকে জানা যায়: এটি ঘোড়া ও গাড়ির ওপর কর আরোপের প্রতিবাদ জানায়। দেশীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্যও সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। দেশীয় আইনাঙ্গনে (native Bar) দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে এটি আইন পরিষদের কাছে স্মারকলিপি পাঠানোর উদ্যোগ নেয়। এ বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে উক্ত পত্রিকাটি লিখে: 'If the Association can furnish any practical suggestions in the subject, it will confer no small benefit on the country.'[২২] আঞ্জুমানের উক্ত প্রয়াসগুলো কতটা সফল হয়েছিল, সমকালীন তথ্যের অভাবে তা জানা যায় না। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিচালিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে আঞ্জুমানের নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়ায় স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে সমকালীন সচেতন সমাজে এটি সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঞ্জুমানের অতি সক্রিয়তাও লক্ষ করা যায়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে (সম্ভবত মার্চ মাসে) কারা কর্তৃপক্ষ এক সার্কুলার জারির মাধ্যমে কারাবাসীদের দীর্ঘ দাড়ি ও গোঁফ রাখতে নিষেধ করে। এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে না জেনে আঞ্জুমানের কর্মকর্তারা ধারণা করেন যে কর্তৃপক্ষ কারাবাসীদের দাড়ি 'মুণ্ডনের' আদেশ দিয়েছেন। ইসলামি আদর্শের পরিপন্থি হওয়ায় তাঁরা উক্ত নিষেধাজ্ঞা মুসলমান কারাবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করতে কারাগারসমূহের তত্ত্বাবধায়কের কাছে আবেদনপত্র পাঠান। অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় এ বিষয়ে কোনো জবাব দেননি।[২৩] এ ঘটনা থেকে ইসলামি আদর্শ ও মুসলিম স্বার্থরক্ষায় আঞ্জুমানের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রমাণিত হয়। সেইসাথে তথ্যপ্রাপ্তি-সহ সরকারের সাথে

যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর দুর্বলতার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রতিষ্ঠার পর আঞ্জুমানে ইসলামি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-সহ হিন্দু সম্প্রদায় পরিচালিত অন্যান্য সংগঠনের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে সচেষ্ট হয়। এজন্য ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সভায় আঞ্জুমানকে ধন্যবাদও জানানো হয়।[২৪] কিন্তু পরবর্তীকালে আঞ্জুমানের নীতির পরিবর্তন ঘটে। কেননা সমকালে শিক্ষা, চাকরি, আর্থিক অবস্থা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় এতটাই পশ্চাৎপদ ছিল যে এই দুই সম্প্রদায়ের একত্রে কাজ-করার বিষয়টি বাস্তবসম্মত ছিল না। তাছাড়া সেসময় উচ্চ সরকারি পদে দেশীয়দের নিয়োগ প্রসঙ্গে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্যোগ-আন্দোলনে ইংরেজি শিক্ষাহীন মুসলমান সম্প্রদায়ের মোটেই লাভবান হওয়ার সুযোগ ছিল না। অধিকন্তু, এতে সরকারের রোষানলে পড়ার আশঙ্কা ছিল। এসব কারণে আঞ্জুমান কোনো হিন্দু সংগঠনের সাথে সম্পর্কে না-জড়ানোর নীতি গ্রহণ করে।[২৫] সেইসাথে শুরু থেকে অনুসৃত সরকারের আনুগত্য লাভের মূলনীতি আরও সোৎসাহে আঁকড়ে ধরে, যাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল: 'No measures should on any occasion be adopted that might in any measure appear inimical to British Government.'[২৬] এজন্য এটি ১৮৫৭-৫৮ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বা মহাবিদ্রোহ 'সমর্থন তো করেইনি বরং সভার আয়োজন করে এর বিরোধিতা করে'। এখানেই শেষ নয়, বিদ্রোহ শেষে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর আঞ্জুমান মহারানি ভিক্টোরিয়ার কাছে একটি 'অভিনন্দনবাণী' (falicitation) পাঠায়। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-সহ ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ও মহাবিদ্রোহ সমর্থন করেনি।[২৭]

পর্যালোচনা ও উপসংহার

ভারতীয় মুসলমানদের সর্ববিধ কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই আঞ্জুমানে ইসলামি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, কলকাতা শহরের বাইরে এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হয়নি বললেই চলে। প্রতিষ্ঠার বছরই (১৮৫৫) ফরিদপুরে এর একটি শাখা স্থাপিত হয়।[২৮] ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি শাখা স্থাপনের কথাও জানা যায়।[২৯] কিন্তু ঐ শাখাগুলো এবং সেগুলোর কর্মকর্তাদের নাম-ধাম ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনো ধরনের তথ্য পাওয়া যায় না। শাখাগুলো যে সক্রিয় হতে পারেনি, তা স্পষ্টই বলা যায়। এমনকি ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পর কলকাতার মূল আঞ্জুমানেরই কোনো ধরনের কর্মকাণ্ডের খবর পাওয়া যায় না। এটি যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ১৮৫৭-৫৮ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহই যে এর অন্যতম প্রধান কারণ সেকথা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। প্রথমত, সমকালীন পরিস্থিতিতে অন্য যে-কোনো ক্ষেত্রের মতো আঞ্জুমানেরও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। দ্বিতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: মুসলমানদের

ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করে সরকার এই বিদ্রোহের জন্য বিশেষভাবে তাদেরকে দায়ী করে এবং এই সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই সরকারের রোষানলে পড়ে।[৩০] এ ঘটনার অনিবার্য প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই আঞ্জুমানের কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, সরকারের প্রতি অনুগত থাকলেও সাংগঠনিকভাবে কিংবা ব্যক্তি পর্যায়ে আঞ্জুমানের সাথে সরকার বা ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি এবং এটি কখনোই সরকারের আস্থা অর্জনের মতো যোগ্য সংগঠনে পরিণত হতে পারেনি। এজন্য আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে এটি সরকারের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু আদায়ও করতে পারেনি। এ কারণে নিজ সম্প্রদায়-সহ বৃহত্তর জনসমাজে আঞ্জুমানের গ্রহণযোগ্যতাও তৈরি হয়নি।[৩১] অন্যান্য কারণের মধ্যে নেতৃত্বের দুর্বলতাই প্রধান। আঞ্জুমানের প্রায় চার বছরের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই সংগঠনে কোনো key person বা বলিষ্ঠ ও অনুসরণীয় নেতা ছিল না। তাছাড়া সাংগঠনিক দুর্বলতা, কোনো হিন্দু সংগঠনের সাথে তেমন যোগাযোগ না-থাকা, সুদৃঢ় জনভিত্তি তৈরি না-হওয়া প্রভৃতি কারণেও আঞ্জুমান নিষ্ক্রিয় ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। যাহোক, অত্যন্ত অল্পকাল ক্রিয়াশীল থাকলেও আঞ্জুমানে ইসলামি সমগ্র ভারতের প্রথম মুসলিম সংগঠন হিসেবে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তা অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে অনেক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী, ইংরেজি শিক্ষা ও চর্চায় অনাগ্রহ-সহ যুগোপযোগী চিন্তা-চেতনা, কর্মসূচি ও কর্মোদ্যমের অভাবে স্বল্পকালে আঞ্জুমানের দৃশ্যমান অর্জন বা সাফল্য নেই বললেই চলে। তবে এর মূল চেতনা ও ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি-সহ পরবর্তী সংগঠনগুলো মুসলমান সমাজের কল্যাণে ব্যাপক অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। বিশেষত, পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে আঞ্জুমানে ইসলামি নামেই স্থানীয় মুসলমানদের সমিতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কলকাতার আঞ্জুমানের পরোক্ষ ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না।

পাদটীকা ও তথ্যসূত্রঃ

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন এস. এম. ছুলায়মান কবীর, *বাংলায় মুসলিম শিক্ষা: সভা-সমিতির ভূমিকা (১৮৯৩-১৯১২)*, (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সভার, ঢাকা, জুন ২০২২), পৃ. ১১-৩৪

২. আঞ্জুমানে ইসলামি সর্বভারতীয় পর্যায়ে পরিচিত কোনো সংগঠন ছিল না। মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি Parent Society বা প্রথম মুসলিম সংগঠন হিসেবে ভারতের সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করে। সুতরাং উক্ত সোসাইটির আট বছর আগে প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে ইসলামি যে বাংলা তথা ভারতের প্রথম মুসলিম সংগঠন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মধ্যে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ভারতের গাজীপুরে স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠিত সায়ান্টিফিক সোসাইটি মুসলিম উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সংগঠন।

৩. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ২০ বছর পর পর সনদ আইন জারি করত। এ ধরনের প্রথম আইন জারি করা হয় ১৭৭৩ সালে। এটা ইতিহাসে নিয়ন্ত্রক আইন (Regulating Act) নামে পরিচিত। এরপর ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ সালে সনদ আইন (Charter Act) জারি করা হয়। বলাবাহুল্য, ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে সরাসরি ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসন পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। এজন্য আর কোনো সনদ আইনের প্রয়োজন হয়নি।

৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা* (কলকাতা : বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০১১, প্রথম প্রকাশ ১৯৪১), পৃ. ১৩৬-৩৮

৫. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা* (ঢাকা: ঢাকা নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৩, ৩য় সং.), পৃ. ১২০

৬. *The Hindoo Inteligencer,* 07 May 1855; *The Hindoo Patriot*, 24 May 1855, দ্রষ্টব্য: স্বপন বসু, *সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ* (কলকাতা: বুকস স্পেস, ২০১৯), পৃ. ৫৫৯-৬০

৭. 'কুজ্জাত' আরবি 'কাজী' শব্দের বহুবচন। সুতরাং কাজী-উল-কুজ্জাত বলতে বুঝায় কাজীদের কাজী বা প্রধান কাজী।

৮. স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১১), পৃ. ২১২

৯. ঐ; ওয়াকিল আহমেদ, 'কলিকাতার মুসলমান সভা-সমিতি', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ১২শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা (জুন ১৯৯৪), পৃ. ৩০

১০. ঐ (ওয়াকিল আহমদ)

১১. ঐ; *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান* (ঢাকা, ২০১১, ৩য় সং.), পৃ. ৪৮

১২. স্বপন বসু, *সংবাদ-সাময়িকপত্রে .... মুসলমান সমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬০

১৩. একই বানান হলেও সংস্কৃত ও হিন্দিতে 'যবন' শব্দের উচ্চারণ 'ইয়োবন'। সম্ভবত এটি আরবি-ফারসি ভাষার শব্দ 'ইয়োনান' থেকে এসেছে। বিদেশি গ্রিকদের বুঝাতে আরব ও পারসিকরা এই শব্দ ব্যবহার করত। উল্লেখ্য, প্রাচীনকালে গ্রিস বা এর অংশবিশেষ আয়োনিয়া নামে এবং এর অধিবাসীরা আয়োনিয়ান নামে পরিচিত ছিল। আয়োনিয়ান থেকেই আরবি-ফারসি ভাষায় 'ইয়োনান' শব্দটি এসেছে। সংস্কৃত ভাষায় বিদেশি ও মুসলমানদের বুঝাতে অনেক সময়ই নিন্দার্থে যবন শব্দটি ব্যবহৃত হতো। বলা বাহুল্য, উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতে মুসলমানদেরকে বিদেশি বা বিদেশাগত মনে করা হতো।

১৪. *সোম প্রকাশ*, ২৯ মে ১৮৫৫, উদ্ধৃত: ওয়াকিল আহমদ, '*কলিকাতার মুসলমান সভা-সমিতি*', পূর্বোক্ত, *পৃ. ৩০-৩১*

১৫. ঐ; পৃ. ২৯-৩০; *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-১ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৩৭

১৬. ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা করেন সৈয়দ আহমদ রায়বেরিলী। শুরুতে ১৮২০-এর দশকে ইসলামি শুদ্ধিকরণ আন্দোলন হলেও অচিরেই এটি রাজনৈতিক-সামরিক রূপ ধারণ করে। প্রথমত এটি শিখ সাম্রাজ্যের মুসলিম নিপীড়নবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল। ইংরেজদের কাছে শিখ সাম্রাজ্যের পতনের (১৮৪৯) পর ওয়াহাবি আন্দোলন পুরোপুরি ইংরেজবিরোধী রূপ ধারণ করে। উল্লেখ্য, সশস্ত্র ওয়াহাবিদের কর্মক্ষেত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে হলেও তাদের প্রতি বাংলা-বিহারসহ

প্রায় সমগ্র ভারতের মুসলমানদের সমর্থন-সহযোগিতা ছিল। আরও উল্লেখ্য, বাংলায় তিতুমীরের এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ-দুদু মিয়ার ধর্মসংস্কার আন্দোলনও ইংরেজবিরোধী রূপ ধারণ করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, আজিজুর রহমান মল্লিক, ডক্টর, *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬)*, ইংরেজি থেকে অনুবাদ-দিলওয়ার হোসেন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৭৬-১৬৪; W W Hunter, *The Indian Musalmans* (New Delhi: Rupa & Co, 2002, first published in 1871), Pp.1-99

১৭. *The Friend of India,* 26 July & 2 August 1855, দ্রষ্টব্য: স্বপন বসু, *সংবাদ-সাময়িকপত্রে ... মুসলমান সমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬০

১৮. *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

১৯. *বেঙ্গল হরকরা অ্যান্ড দি ইন্ডিয়া গেজেট*, ১ নভেম্বর ১৮৫৫, দ্রষ্টব্য: স্বপন বসু, *সংবাদ-সাময়িকপত্রে ... মুসলমান সমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬১-৬২

২০. *The Freind of India,* 17 January 1856, দ্রষ্টব্য: ঐ

২১. Ibid, 24 July 1856

২২. Ibid

২৩. *সংবাদ প্রভাকর*, ৩ এপ্রিল ১৮৫৭, দ্রষ্টব্য: ঐ

২৪. স্বপন বসু, *সংবাদ সাময়িকপত্রে...মুসলমান সমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬১; ওয়াকিল আহমদ, 'কলিকাতার মুসলমান সভা-সমিতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

২৫. ওয়াকিল আহমদ, *চিন্তা ও চেতনার ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০-২১

২৬. ঐ

২৭. *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড - ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

২৮. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

২৯. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

৩০. এ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেতে দেখুন, Muin-ud-din Ahmad Khan, 'The Sepoy Mutiny and the Muslim Society of Bengal', *Journal of the Bangladesh Itihas Samity*, vol. 2(1973), Pp.145-54; সুফিয়া আহমেদ, *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় ১৮৮৪-১৯১২*, অনুবাদ– সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০২), পৃ. ৮৩-৮৪

৩১. সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য না থাকলেও সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি এবং আঞ্জুমানের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

Presence of Trace and Toxic Metals in Pulses, Spices and Sauces in Southeastern Region of Bangladesh

Dr S M Afzal Hossain[*], M Azizul Islam Kazi[**], Md. Aminul Ahsan[***]
Dr M Zahurul Alam Chowdhury[****], Dr Zainul Abedin Siddique[*****]

Abstract: Few potentially essential metals such as Fe, Cu, Mg, Co, Zn and toxic metals like Pb, Cd, As, Cr, Ni were determined in pulses, spices and sauces in southeastern region of Bangladesh by using Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Wet digestion method was applied for the digestion of the samples. Spike recoveries (90 %-103 %) and analysis of NIST standard reference metal solutions demonstrated the reliability and accuracy of the analytical methodologies employed in this study. The amount of toxic metals were determined in pulses ranged from 0.71 to 3.34 mg kg^{-1} of Pb, 0.01 to 0.5 mg kg^{-1} of Cd, 0.004 to 0.03 mg kg^{-1} of As, 0.22 to1.06 mg kg^{-1} of Cr and 0.4 to 9.7 mg kg^{-1} of Ni. In the case of spices and sauces they were in the ranges: Pb: 0.08-2.79 mg kg^{-1}, Cd : 0.02-0.67 mgkg^{-1}, As: 0.012-0.293 mg kg^{-1}, Cr : 0.24-68 mg kg^{-1} and Ni: 0.3-9.32 mg kg^{-1} and Cd: 0.013-0.026 mgkg^{-1}, As: 0.007-0.033 mg kg^{-1}, Cr: 5.17-6.37 mg kg^{-1} and Ni: 0.07-3.03 mg kg^{-1}, respectively. The concentration of Pb, Cd and As of all the samples under the study were lower than those of recommended daily allowance values that indicates the foodstuffs are almost free from contamination of the metals. But the concentrations of Cr and Ni in some food items were higher than those of the tolerance limits in human body. Thus intake of these foods can cause the accumulation of these hazardous metals in body. The possible sources of Cr and Ni and their metabolism are pointed out. All the samples contain the essential elements that are in the range of human necessity. The information gained from this study is expected to be useful to the general people of this region to select foods for their daily diet on the basis of the abundances of the essential metals or to avoid any food by considering the concentration of the toxic metals.

*** Professor, Department of Chemistry, Govt. Saadat College, Tangail**
**** Former Director, BCSIR laboratories, Dhaka, Bangladesh**
***** Former Scientific Officer, BCSIR laboratories, Dhaka, Bangladesh**
****** Professor, Department of Chemistry, University of Chittagong**
******* Professor, Department of Chemistry, University of Chittagong**

Introduction

Toxic metals are potential environmental pollutants. They may enter into foodstuffs through bioaccumulation. They have capability to do problems in human health if present to excess in the food we eat. They are given special attention throughout the world due to their toxic effects even at very low concentrations in human body[1]. Several cases of human disease, disorders, malfunction and malformation of organs due to metal toxicity have been reported[2]. Pulses and spices are essential foodstuffs for human diet of Bangladesh. Many studies pointed out that pulses and spices contaminated with different levels of toxic metals.

The level of toxic metals in foodstuffs has been reported around the world; from East Asia[3], Egypt[4], China[5], Nigeria[6] and Turkey[7]. In many developing countries such data are not readily available.

Jarup et al. (1998) pointed out that cadmium is present in most foodstuffs, but concentrations vary greatly[8]. Cadmium exposure may cause kidney damage and/or skeletal damage[9]. Airborne lead can be deposited on soil, water and plants thus reaching human body via the food chain. Lead is accumulated in the skeleton and cause renal tubular damage and may also give rise to kidney damage[10]. International Agency for Research on Cancer (IARC) classified cadmium and lead as human carcinogen[11].

Food consumption is the main source of daily chromium exposure for most people. Chromium is accumulated in liver, kidney, skin and lung. Small amount of Cr(III) is essential in controlling insulin, cholesterol and lipid biosynthesis[12]. Hexavalent chromium, Cr(VI) is associated with cancer formation in human body. But the mechanism of cancer formation caused by Cr(VI) is not known for certain; however, it has been postulated that Cr(VI) binds to double stranded deoxyribonucleic acid (DNA), therefore altering gene replication, repair and duplication. As a result, severe and often deadly pathological changes (asthma, bronchitis, dermatitis, renal failure etc.) are associated with excessive intake of Cr, especially Cr(VI)[13].

Approximately 90% of total intake of nickel comes from food. Excess amount of nickel is accumulated in skin, lung, throat and kidney. Small amount of Ni(II) in human body play an important role in regulating prolactin and stabilization of RNA and DNA structures. Excess nickel

in human body is the consequence of lung cancer, nose cancer, larynx cancer and prostate cancer, asthma and chronic bronchitis, heart disorders etc[14]. Nickel in zero oxidation state seems to be more toxic than its other state[15].

Arsenic enters into the human body mainly with drinking water and smoking, and accumulates in liver, muscle, hair, nail and skin. The International Agency for Research on Cancer (IARC) has listed arsenic as a human carcinogen since 1980. Elemental arsenic is not toxic but trivalent form of arsenic is more toxic than pentavalent form of arsenic. Chronic arsenic exposure of human is responsible for loss of appetite, nausea and some vomiting, dry throat, shooting pain, diarrhoea, tingling of the hands and feet, skin cancer, jaundice etc[16].

Essential metals are significant in nutrition, either for their essential nature or their toxicity. Iron, copper, magnesium, cobalt and zinc are known to be essential and may enter the food materials from soil through mineralization by crops or environmental contamination with metal-based pesticides. The amount of every such metal should be in certain range, otherwise beyond the range or deficiency of the essential substances in the body may disturb the biological balance and the system becomes unstable causing different type of diseases [17].

Owing to serious health risks, the levels of toxic metals (Pb, Cd, Cr, Ni and As) and essential metals (Fe, Cu, Mg, Co and Zn) were determined in some Bangladeshi foodstuffs which contribute to the infant, young children and adults foods such as pulses, spices and sauces.

Materials and method sampling

Pulses and spices samples were collected randomly from six different markets of Chittagong city area with adequate number of replicates. Selected sauces samples were collected randomly from the chosen reputed companies. The samples were stored in refrigerator until required for the preparation of solution.

Sample preparation

The pulses and spices were washed with water repeatedly to remove the unwanted particles. The washed and cleaned samples were dried at room temperature for 10 hours and ready for digestion. Sauces were taken for digestion as it collected freshly. Pre-weighed (20-25 g)

samples were taken in a three neck round bottom flask and added 50 ml of water with the sample. These were boiled for about four hours and then evaporate the solvent. At room temperature, 100 ml HNO_3 and $HClO_4$ (1:5, v/v) were added with the boiled sample. This was refluxed at 120-125 ^{0}C (20 hours) until a clear solution appeared. The volume of the solution has been reduced to about 10-15 ml by condensation. Few mL of water was added with the solution and filtered through whatman-40 filter paper into a 100 ml volumetric flask and made up to the mark with water. All the sample solutions under the present investigation were prepared in similar manner and stored at room temperature for spectroscopic measurement. A blank solution was also prepared for each group of sample by using all reagents except the sample.

Spectroscopic analysis

The sample solutions were subsequently analyzed for toxic metal and essential metal contents, as dry weight basis, using an Atomic absorption flame emission spectrophotometer, model AAS-240FS, Varian Australia. But the concentration of as was determined by hydride vapor generation of Atomic absorption spectrophotometer, Varian AA 220, Australia. The analysis was carried out using respective hollow cathode lamps under standard instrumental conditions (Table 1). The flame type used for all elements was air-acetylene. Working solutions were prepared by dilution just before the use of 1000 ppm (BDH, England) standard solutions for atomic absorption spectroscopy. For the determination, two solutions were prepared for each sample and three separate readings were made for each solution. The means of these figures were used to calculate the concentrations.

Table 1: Instrumental set up of AAS for the elements studied

Condition	Fe Cu Mg Co Zn Pb Cd As Cr Ni
Wavelength (nm)	248.3 324.8 285.2 240.7 213.9 217 228.8 193.3 357.9 232
Slit (nm)	0.5 0.5 0.5 0.2 1.0 1.0 0.5 0.5 0.2 0.2
Lamp Current (m A)	4 4 4 7 5 10 4 10 7 4
Air flow (L/m)	13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Acetylene flow (L/m)	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0

Quality assurance

Appropriate quality assurance procedures and precautions were carried out to ensure reliability of the results. Samples were generally carefully handled to avoid contamination. Glassware was properly cleaned, and the reagents were of analytical grade. Double distilled deionized water was used throughout the study. Reagents blank determinations were used to correct the instrument readings. A recovery study of the analytical procedure was carried out by spiking and homogenizing several already analyzed samples with varied amounts of standard solutions of the metals. Average recoveries obtained were 90-97, 95-99, 97-103, 98-102, 94-97, 95-100, 96-98, 95.2-101, 92-97 and 96-103 % for Fe, Cu, Mg, Co, Zn, Pb, Cd, As, Cr and Ni respectively. The detection limit of these elements for the instrument under the experimental conditions was determined and the values were 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.003, 0.003, 0.03, 0.002, 0.003, 0.05 and 0.02 ppm respectively. Analysis of NIST standard reference metal solutions also demonstrated the reliability and accuracy of the analytical methodologies employed in this study (Table 2).

Table 2: Accuracy of the analytical data with reference to the NIST standard metal solution

Element	Measured Value (ppm)	Certified Value (ppm)	Deviation	Element	Measured Value (ppm)	Certified Value (ppm)	Deviation
Fe	0.974 ± 0.01	1	2.60%	Pb	0.534 ± 0.01	0.5	6.80%
Cu	0.196 ± 0.01	0.2	2%	Cd	0.197 ± 0.02	0.2	1.50%
Mg	0.104 ± 0.01	0.1	4%	Cr	0.504±0.02	0.5	0.80%
Co	0.496 ± 0.01	0.5	0.80%	Ni	0.491±0.01	0.5	1.80%
Zn	0.196 ± 0.01	0.2	2%	As	0.533±0.01	0.5	6.80%

n= 7: ± = Standard deviation of the measurement

Results and discussion

The amount of essential and toxic metals determined in different pulses, spices and sauces are presented in Table 3, 4, 5, 6, 7 and 8 respectively. The essential metals were determined as follows: pulses (Fe : 4.67-55.34 mg kg^{-1}, Cu: 0.75-8.36 mg kg^{-1}, Mg :15.31-30.26mg kg^{-1}, Co : 0.08-8.15 mg kg^{-1} and Zn : 21.97-58.01 mg kg^{-1}) ; spices (Fe: 8.46-79.43 mg kg^{-1}, Cu: 0.11-13.54 mg kg^{-1}, Mg : 12.18-56.31 mg kg^{-1}, Co: 0.08-8.05 mg kg^{-1} and Zn : 2.16-51.97 mg kg^{-1}) and sauces (Fe : 2.23-23.01 mg kg^{-1}, Cu : 1.74-4.98 mg kg^{-1}, Mg: 20.25-35.72 mg kg^{-1}, Co: 0.04-5.56 mg kg^{-1} and Zn: 1.25-2.49 mg kg^{-1}). The variations are due to the genetic nature of the species of pulses and spices and their abundances in soils from which they enter to the species[18]. The amounts of the essential elements in our findings, in some of the cases are either high or low than those reported in literature. The concentration level of Fe, Cu and Mg of the species are fairly good. So these may be considered as a good source of these metals as human necessity. Similarly pulses, spices and sauces contain higher amount of Co and Zn than those reported in the literature. The study revealed that most of the studied samples contain the trace metals within the expected levels. The recommended daily allowance (RDA) of Fe, Cu, Mg, Co and Zn are 10-15, 1.5-3.2, 350-500, 1-1.5 and 12-15 mg per

day, respectively for a man having weight 70 kg [17]. Pulses and spices are consumed by the general people in daily diet. So these food items contribute an adequate amount of these essential metals in human body. Moreover, the higher percentage of organic materials of proteins and digestive enzymes in pulses and spices made them significant foodstuffs [19]. The study on sauces is very limited. However our finding shows that these foodstuffs are also fairly good sources of Mg, Co, Zn and Cu but the concentration of Fe in sauces is comparatively lower than those in pulses and spices. Our finding shows no harmful effect on human health for these sorts of pulses, spices and sauces.

Table 3: Amounts (mg kg^{-1}) of essential metals of different pulse

Sample	Fe	Cu	Mg	Co	Zn
Gram	55.34±2.33	2.33±0.04	ND	5.67±0.06	58.01±2.05
Lentil	33.03±1.25	4.22±0.50	28.33±1.04	5.07±0.23	57.27±1.04
Grass pea	38.14±0.53	5.02±1.02	21.31±0.67	8.15±0.07	32.74±1.03
Green gram	25.45±1.20	8.36±0.31	28.04±2.04	6.09±0.12	37.7±0.45
Pea	50.16±0.43	5.01±0.04	15.31±0.87	2.64±0.14	43.89±1.04
Garden pea	4.67±1.01	0.75±0.04	30.26±1.63	0.08±0.03	21.97±1.11
Lablab	28.52±0.51	3.74±0.03	19±2.03	5.71±0.5	23.06±1.02
Cow pea	6.17±0.05	7.19±0.02	19.38±1.06	5.07±0.45	50.33±0.78
Black gram	14.88±1.07	3.44±0.23	25.23±0.75	0.09±0.02	42.24±1.04
Pea	26.39±0.07	5.10±0.13	21.61±1.08	0.39±0.01	37.24±0.04

Table 4: Amounts (mg kg^{-1}) of toxic metals of different pulses

Sample	Pb	Cd	As	Cr	Ni
Gram	1.68±0.01	0.5±0.02	0.02±0.01	1.06±0.21	5.9±0.31
Lentil	0.71±0.02	0.22±0.01	0.03±0.01	0.7±0.03	2.44±0.15
Grass pea	BDL	0.03±0.01	0.01±0.01	0.22±0.04	0.4±0.03
Green gram	BDL	0.03±0.01	0.02±0.01	BDL	BDL
Pea	BDL	0.04±0.03	0.02±0.01	0.7±0.04	2.29±0.16
Garden pea	1.56±0.01	0.01±0.01	0.01±0.01	0.56±0.03	BDL
Lablab	3.34±0.02	0.25±0.01	0.01±0.01	0.23±0.12	9.7±0.18
Cow pea	BDL	0.02±0.01	0.03±0.01	0.26±0.03	4.51±0.17
Black gram	BDL	0.01±0.01	0.02±0.01	0.5±0.10	6.63±0.17
Pea	BDL	0.02±0.01	0.02±0.01	0.31±0.04	BDL

The concentration of Pb was found below the detection limit in most of the pulses samples (Table 4). Lablab contains the highest amount of Pb (3.34 mg kg^{-1}), which is significantly higher because the maximum permissible amount of Pb is 0.3 mg per day from all sources of diet for human [17]. From the same consideration, gram (1.68 mg kg^{-1}) and garden pea (1.56 mg kg^{-1}) of pulses also contain elevated amount of Pb. Nevertheless most of the pulses are safe to human health from Pb toxicity. Though cinnamon and red chilli contains 2.47 and 2.79 mg kg^{-1} of Pb, respectively (Table 6), these are not harmful as their intake is not more than 10-15 gm per day per person usually [20]. As a result, the amount of Pb that present in the spices is not harmful to health because the contribution of Pb from the food would be far below the maximum permissible value. Hossain *et al*. reported that the Pb concentration in pulse of Bangladesh was in the range 0.5-3.5 mg kg^{-1} and Krejpeio *et al*. reported the Pb concentration in spices of Poland was in the range 0.17-5.43 mg kg^{-1} [21-22]. These reported data resemble to our study.

In the same study, Cd in pulses of Bangladesh was in the range 0.5-1.0 mg kg^{-1} [21] (21. Hossain et. al., 2009). Ozkutlu *et al*. reported that spices of Turkey have 0.018-0.206 mg kg^{-1} of Cd [23]. But our study shows only poppy seed (0.67 mg kg^{-1}) and cinnamon (0.42 mg kg^{-1}) contain higher amount of Cd and rest of the samples contain lower amount of Cd compared to the literature data. The amount of Cd found in sauces is very negligible compared to the MPL value (0.2 mg per day) [17]. Since the consumption of spices and sauces is limited, these foods supply a little amount of Cd into human body. Therefore, they are safe to human health.

The permissible daily allowance of as is 0.7 mg kg^{-1} and the maximum permissible limit of as in foodstuffs is 1 mg kg^{-1} [17]. The present investigation shows that the amount of as in all the pulses, spices and sauces are very negligible. Thus these foodstuffs are free from as contamination and need not pay much attention.

The concentrations of Cr in pulses, spices and sauces are in the ranges 0.22-1.06 mg kg^{-1}, 0.24-68.19 mg kg^{-1} and 5.17-6.37 mg kg^{-1}, respectively (Table 4, 6 and 8). The concentration of Cr in pulses of Bangladesh is in the range 1.0-3.0 mg kg^{-1} and that in spices of Pakistan is in the range 115-368 mg kg^{-1} [20-21]. So the concentration of Cr in the pulses is lower than the reported value and that in spices is far below than those reported previously. According to the permissible value of Cr (0.06 mg per day)[17] all the pulses contain slightly higher level of Cr. But a number of spices, e.g., cinnamon (68.19 mg kg^{-1}), coriander (36.77 mg kg^{-1}), turmeric (17.92 mg kg^{-1}), poppy seed (15.9 mg kg^{-1}), red chilli (11.81 mg kg^{-1}) and cumin (8.77 mg kg^{-1}) contain significant amount of Cr. On the basis of the values determined it can be said that all the pulses are free from chromium contamination but few spices (Cumin, coriander, cinnamon, turmeric and red chilli) are the sources of Cr in body and are thus harmful to health. Though the amount of Cr in sauces (5.17-6.37 mg kg^{-1}) are in consistent and comparatively higher than those found in pulses and spices. But the consumption of sauces is very limited, so the people need not worry on the toxicity of Cr for this foodstuff.

The highest amount of Ni was found in lablab pulse (9.7 mg kg^{-1}) followed by black gram (6.63 mg kg^{-1}), gram (5.90 mg kg^{-1}) and cow pea (4.51 mg kg^{-1}) (Table 4). Red chilli, onion, coriander and cinnamon contain 9.32, 7.9, 4.41 and 2.25 mg kg^{-1} of Ni respectively (Table 6).

Tomato sauces of Ahmed brands and tamarind sauces of Pran brand contain 3.03 mg kg^{-1} and 2.82 mg kg^{-1} of Ni respectively (Table 8). The presence of Ni in the rest of samples is negligible compared to the MPL value of Ni (0.45 mg per day, Toxicology 2nd ed., 1980) and safe from Ni toxicity[17]. Hossain et al. reported that the amount of Ni in pulses of Bangladesh was 9-37 mg kg^{-1} that is higher than our study[21].

Table 5: Amounts (mg kg^{-1}) of essential metals of different spices

Sample	Fe	Cu	Mg	Co	Zn
Green chilli	24.38±1.12	0.66±0.04	47.13±2.32	0.14±0.04	2.62±0.78
Onion	17.47±0.34	0.31±0.56	26.1±1.08	0.26±0.33	2.16±0.32
Garlic	17.89±0.25	1.34±0.76	35.1±2.05	0.22±0.04	7.97±0.89
Zinger	8.46±0.24	0.11±0.04	13.88±2.12	0.08±0.01	BDL
Cumin	30.52±1.03	10.38±0.76	41.27±3.06	2±0.5	41.24±2.66
Coriander	24.54±0.54	12.77±1.04	28.28±1.07	5.98±0.78	45.63±1.65
Poppy seed	18.93±0.45	13.54±1.23	56.31±1.02	1.69±0.35	51.97±1.87
Cinnamon	9.05±1.07	3.75±0.45	17.25±1.10	4.47±1.04	4.97±0.85
Turmeric	45±2.02	6.59±0.76	22.8±1.32	1.7±0.67	18.46±0.45
Red chilli	79.83±1.75	10.87±1.67	12.18±0.54	8.05±0.34	20.51±2.07

Table 6: Amounts (mg kg^{-1}) of toxic metals of different spices

Sample	Pb	Cd	As	Cr	Ni
Green chilli	ND	0.02±0.01	0.1±0.01	0.24±0.14	0.76±0.06
Onion	ND	0.02±0.01	0.01±0.01	0.26±0.03	7.9±0.45
Garlic	ND	0.02±0.01	0.02±0.01	0.35±0.06	0.37±0.06
Zinger	0.08±0.02	0.03±0.01	0.01±0.01	ND	0.51±0.52
Cumin	0.38±0.05	0.12±0.01	0.1±0.01	8.77±0.76	0.3±0.16
Coriander	1.06±0.23	0.1±0.01	0.29±0.12	36.77±0.16	4.41±0.14
Poppy seed	ND	0.67±0.05	0.23±0.13	15.9±1.03	0.69±0.87
Cinnamon	2.47±0.44	0.42±0.03	0.1±0.01	68.19±2.87	2.25±1.04
Turmeric	0.19±0.05	0.06±0.01	0.16±0.01	17.92±1.04	1.66±0.32
Red chilli	2.79±0.03	0.4±0.04	0.12±0.01	11.81±1.06	9.32±0.44

Table 7: Amounts (mg kg^{-1}) of essential metals in different sauces

Sample	Fe	Cu	Mg	Co	Zn
Chilli (*BD foods*)	4.09±0.12	1.74±0.43	29.15±2.32	0.04±0.01	1.65±0.23
Tamarind (*Pran*)	5.97±0.32	2.13±0.45	32.98±1.43	5.56±0.45	1.93±0.43
Tomato (*Meridian*)	8.18±1.02	2.53±0.16	34.21±2.54	0.39±0.02	1.51±0.5
Tomato (*Kwality*)	2.23±0.34	2.62±0.15	21.29±2.22	0.21±0.03	1.25±0.15
Tomato (*Nur foods*)	22.95±2.23	3.77±0.72	20.25±2.54	0.13±0.04	2.49±0.32
Tomato (*Ahmed foods*)	22.66±1.57	3.43±0.73	25.94±1.43	5.48±1.11	2.05±0.37
Tomato (*BD foods*)	23.01±1.87	4.98±0.75	35.72±3.32	0.26±0.23	1.89±0.33

Table 8: Amounts (mg kg^{-1}) of toxic metals in different sauces

Sample	Pb	Cd	As	Cr	Ni
Chilli (*BD foods*)	ND	0.03±0.01	0.01±0.01	5.84±0.55	0.07±0.01
Tamarind (*Pran*)	ND	0.02±0.01	0.02±0.01	5.74±0.22	2.84±0.24
Tomato (*Meridian*)	ND	0.02±0.01	0.02±0.01	5.17±0.67	0.35±0.10
Tomato (*Kwality*)	ND	0.01±0.01	0.01±0.01	5.17±0.52	0.21±0.04
Tomato (*Nur foods*)	ND	0.02±0.01	0.01±0.01	6.37±0.44	0.37±0.12
Tomato (*Ahmed foods)*	ND	0.02±0.01	0.03±0.01	5.3±0.33	3.03±1.03
Tomato (*BD foods*)	ND	0.01±0.01	0.01±0.01	5.43±1.21	ND

Conclusion

All kinds of pulses, spices and sauces contain appreciable amount of nutrients and toxic elements within consumable limits. Most of them are found to be safe from cadmium and arsenic toxicities. But few of them bear noticeable amount of toxic metals such as Pb, Cd, Cr and Ni. The present study suggests avoiding these food items as much as possible. The accumulation of heavy metals might have middle term and long term health risks, so strict and periodic surveillance is advisable. Moreover, concerned authority should take necessary steps for finding out the ways in reducing the contamination of toxic metals into the food chain. This study also provides baseline data of toxic metals in pulses, spices and sauces in this region of Bangladesh.

References

1. Das. A. 1990, 'Metal Ion Induced Toxicity and Detoxification by Chelation Therapy', first ed., *A text book on medical aspects of bioinorganic chemistry*, (CBS, Delhi) Pp.17-58
2. Jarup, L. 2003, 'Hazards of Heavy Metal Contamination'. *British Medical Bulletin 68*, Pp.167-182
3. Wu Leung, W. and R. Butrum. 1972, 'Proximate Composition, Mineral and Vitamin Contents of East Asian Foods'. In: *Food Composition Table for Use in East Asia*, Pp. 5-187
4. Hussein, L. and J. Bruggeman, 1997, 'Zinc Analysis of Egyptian Foods and Estimated Daily Intakes Among an Urban Population Group', *Food Chemistry 58*, Pp. 391-98

5. Zhang Z., T. Watanabe, S. Shimbo, K. Higashikawa and M. Ikeda, 1998, 'Lead and Cadmium Contents in Cereals and Pulses in North-eastern China', *Science and Total Environment*, *220*, Pp. 137-45
6. Onianwa, P., I. Adetola, C. Iwegbue, M. Ojo and O. Tella. 1999, 'Trace Heavy Metals Composition of Some Nigerian Beverages and Food Drinks', *Food Chemistry, 66*, Pp. 275-79
7. Saracoglu, S., M. Tuzen, D. Mendil, M. Soylak, L. Elci and M. Dogan, 2004, 'Heavy Metal Content of Hard Biscuits Produced in Turkey', *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 73,* Pp. 264-69
8. Jarup, L., M. Berglund, C. Elinder, G. Nordberg and M. Vahter, 1998, 'Health Effects of Cadmium Exposure–A Review of the Literature and A Risk Estimate', Scan. J. Work Environ. *Health* 24:1-51
9. WHO, 1992, 'Cadmium', *Environmental Health Criteria*, (Vol. 134, Geneva)
10. WHO. 1995, 'Lead', *Environmental Health Criteria*, (Vol. 165, Geneva)
11. IARC 1993, 'Cadmium and Cadmium Compounds Exposure in the Glass Manufacturing Industry', *IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans,* (Vol. 58) Pp. 119-37 (*International Agency for Research on Cancer*, Lyon)
12. Adams I.U and Happiness I.U, 2010, 'Quantitative Specification of Potentially Toxic Metals in Tomatoes', *Nature and Science*, 8(4), Pp. 54-58
13. Saryan L. A and Reedy M, 1988, *Journal of Analytical Toxicology,* 12, Pp. 162–64
14. Permyakov E. A., Metalloproteomics, John Wiley and Sons, 2009, P. 467
15. Khan M. H and Qayyum K, 2002, *Pakistan Journal of Biological Sciences, 5*(10), Pp. 1104-1107
16. Mukherjee S. C., M. M. Rahman, U. K. Chowdhury, M. K. Sengupta, D. Lodh, C. R. Chanda, K. C. Saha, D. Chakraborti, 2003, *J. Environ. Sci. Health*, A (38), Pp. 165–183
17. Casarett and Doul, 1980, *Toxicology the basic Science of poisons*, 2nd ed., (Macmillan Publishing Co., Inc.) Pp. 410-53
18. Alam S., Karim M. R and Rahman M. A, 2002, *J. Bangladesh Acad. Sci.,* 26, Pp. 21-27
19. Chowdhury M. Z. A., Uddin M. M., Alam M. F., Uddin M. R., Hossain M. J and Alam M. S., 2003, 'Essential and Toxic Metals in Rice and Fishes', *Pak. J. Anal. Chem.* 4(2), Pp. 99-103
20. Mobeen H., Neem I., Taskeen A and Saddiqe Z, 2009, 'Investigations of Heavy Metals in Commercial Spices Brands', *New York Science Journal,* 2(5), ISSN: 1554-0200
21. Hossain M. B., Rahman M. A., Deb A. K and Alam A. M. S., 2009, 'Nutritional Status of Edible Pulses Commonly Consumed in Bangladesh', *Dhaka Univ. J. Sci.,* 57 (2), Pp. 181-185
22. Krejpcio Z., Krol E and Sionkowski S., 2007, 'Evaluation of Heavy Metals Contents in Spices and Herbs Available on the Polish Market', *Polish Journal of Environ,* 16, Pp. 97-100
23. Ozkutlu F., Sekeroglu N and Kara S. M., 2006, 'Monitoring of Cadmium and Micronutrients in Spices Commonely Consumed in Turkey', *Research Journal of Agriculture and Biological Science, (INSInet Publication, 2006) Vol.* 2(5), Pp. 223-226

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

Do Birds Prefer Native Plants over the Non-native one? A Comparative Analysis Using Avian Diversity Index in Human-dominated Landscape of Bangladesh

Ferdousi Akter* **and Dr M Abdul Aziz****

Abstract: This study was conducted to investigate the avian diversity in the native and non-native plants in Jahangirnagar University campus between October, 2018 and March, 2019. We observed 20 native and 20 non-native plants in this study under grid sampling approach. Each sample tree was visited in each month to record bird species, their number and activities. A total of 281 bird individuals of 26 species were recorded from native plants and 156 individuals of 18 bird species were recorded from the non-native plants. The Simpson's Diversity Index (*D*) of birds was 0.045 and 0.043 in the native and non-native plants, respectively which revealed that birds preferred native plants over the non-native one. The abundance of birds was highest (16.37%) in the Chhatim (*Alestonia scholaris*) while it was the Teak (*Tectona grandis*) (19.87%) among the non-native plant. This study highlights the importance of native plant species for supporting the abundance and diversity of the bird species.

INTRODUCTION

There has a strong relationship between plant and animals where both show an inseparable mutualism. The avifauna are dependent to plants for their daily activities like feeding, nesting, inhalation as if all basic needs. In order to maintain daily life and reproduction, a vast number of birds builds their nests in shrubs and trees and use plant materials for nest construction. They also retreat to trees and bushes as protection from predators and to rest and roost. On the other hand, birds help plant in their pollination, seed dispersion, controlling pests and parasites by eating as foods. Birds primarily favour green space made up of various kinds of herbs, shrubs, and woodlands. In particular, *native plants* **are special** because they have evolved over thousands of years alongside native bees, birds, and wildlife. The intricate relationships that have

***Assistant Teacher, Kacharikandi Govt. Primary School, Homna, Cumilla**
****Professor, Department of Zoology, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka**

developed between local flora and fauna are extremely specialized and cannot be replaced with ornamental, non-native plants (Linz, 2023).

The native plants are those that evolved to exist and flourish naturally in the particular area, where they offer a complement to the indigenous landscape, giving the area a direct sense of landscape character (Idilfitri et al., 2014). The US Environmental Protection (2012) has listed four advantages of native plants: environmental and productivity benefits, aesthetic values, educational and recreational advantages, and economic (maintenance) advantages. The native plants are the most appropriate living environment condition to the local natural setting and a part of natural heritage in terms of environmental as well as economic benefits. They can provide urban inhabitants with educational and recreational benefits, especially by offering a fascinating location for wildlife photography, such as birds, squirrels, and butterflies, as well as a nature walk (Applied Ecological Services, 2012). Conversely, the non-native plants are those that are accidentally introduced or purposefully disseminated into the local environment by people from other nations (DCNR, 2009). Although they may cause more damage to the local ecosystem than beneficial, there are circumstances in which they are necessary, such as in the process of erosion control and ecosystem restoration (Young, 2010).

Bangladesh possesses rich species diversity particularly for angiosperms and avifauna. There are a total of 3,611 species of angiosperm reported from Bangladesh, where around 2,623 species under 158 families belong to dicotyledons and 988 species under 41 families belong to monocotyledons. However, is very likely that the total number of angiosperm species may reach up to 5,000. The available records suggest that at least 16 endemic species of flowering plants occur in Bangladesh (Ahmed et al., 2008).

Bangladesh has a long history of species introduction from different countries or geographic regions (Hossain, 2009). It is reported that more than 300 non-native species have been either domesticated or cultivated in the country at different times. In particular, large number of timber species was introduced during the late 1980s to meet the country's rapidly growing demand for timber, fuel wood and fodder (Ahmed et al., 2008).

The native plants are unique because they are known to provide food

and shelter for native wildlife. Unfortunately, adapting so many non-native plants into our landscapes might have caused challenges for pollinators and wildlife species (Linz, 2023). Our study is, therefore central to understand the impact of non-native plants on the abundance and diversity of avifauna, thereby suggesting the management of non-native vegetation in the urban landscape.

STUDY AREA

Jahangirnagar University (JU) is located in Savar upazila of Dhaka district, Bangladesh, between 23.8671°-23.8977°E and 90.2588°-90.2731°N, and 32 kilometers north-west of Dhaka city along the Dhaka-Aricha highway (Figure 1). This landscape is moderately undulating and made up of red lateritic soil for the presence of iron. The climate of JU prevails three distinct seasons: summer (March-May), monsoon (June-October), and winter (November-February). Summer is warm, rainy, and humid during the study period, while winter was cool and dry. Based on the last decade's records, monthly average temperatures in the study area range from 30°-41°C, 29°-32°C, and 19°-25°C, rainfall ranges from 12.1-154.2 mm, 106.42-350.8 mm, and 0-19.5 mm, and humidity ranges from 42-82%, 74- 98%, and 38-67% in summer, rainy, and winter seasons, respectively. According to the past 30 years of records, the average rate of monthly total rainfall in this region is declining across the three seasons, while the tendency of monthly average temperature is going up in summer but decreasing a bit in rainy and winter seasons.

JU campus is semi-natural habitat for wildlife which current vegetation is secondary in nature and was once a tropical deciduous *Sal* (*Shorea robusta*) forests (Begum, 2016). The majority of *Sal* forests have gone as the consequence of urbanization. Yet, along the Dhaka-Aricha highway, a few isolated areas remain to be spotted. The university campus authority restricts and protects the utilization of land, which enables the preservation of historical relics. The current habitats on campus include grasslands, woodlands, agricultural fields, wetlands (ponds and lakes), scrubland, marsh, and human settlement. As a result, the university campus provides the birds with ample food and roosting space, nesting infrastructure, and a secure environment. As a consequence, the JU campus has a diverse avifauna compared to other landscapes in the country.

JU campus is a densely wooded area with both native and foreign plant species. There are about 917 species of vascular plants from 145 families and 574 genera were reported in this campus area. While the remaining species are farmed or planted, 70.34 percent of these species are wild. 36.21% of the species are foreign to Bangladesh, while 63.79% are native. There are 22 and 12 species of Pteridophytes and Gymnosperms, respectively, compared to 883 species of Angiosperms (Khan et al., 2021).

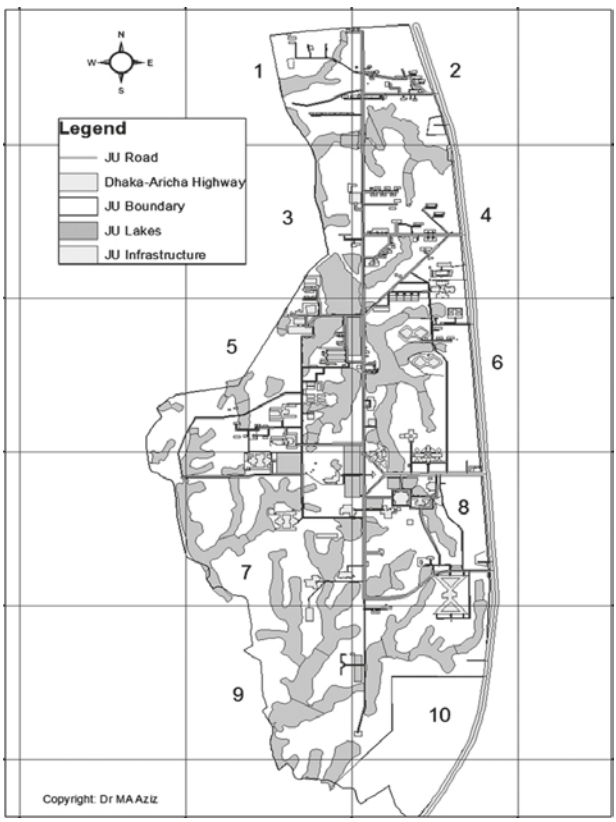

Figure 1: Map showing the sample grids in the Jahangirnagar University campus.

MATERIALS AND METHODS

This study was conducted from October 2018 to March 2019. The field work was carried out three days per month and four hours in each day,

two hours in the morning and two hours in the late afternoon. Grid sampling method was followed to determine sample plants. Data on the avifauna species abundance and diversity was collected by direct observation.

This survey and data collection was carried out using the grid sampling approach (Figure 1). First, the campus map of JU was divided into ten grids, and four plants were selected from each grid, comprising two native plants and two non-native species. The total number of sample plants was 40, with 20 native plants and 20 non-native plant species. During sampling, species diversity, habitat variation, and plant distance were all taken into account.

Table 1: Native and non-native plant species studied under this research.

Sample grid	Native plant species		Non-native plant species	
	Scientific name	Bengali name	Scientific name	Bengali name
1	*Bombax ceiba*	Shimul	*Tectona grandis*	Segun
1	*Butea monosperma*	Polash	*Swetnia macrophylla*	Mahagoni
2	*Anthocephalus kadamba*	Kadam	*Gmelina arborea*	Gamari
2	*Zizipus mauritiana*	Boroi	*Samania saman*	Rain tree
3	*Artocerpus heterophyllus*	Kanthal	*Swetnia mahagoni*	Mahagoni
3	*Mangifera indica*	Aam	*Ficus elastic*	Rabar
4	*Delonix regia*	Krishnochura	*Acacia auriculiformis*	Akashmoni
4	*Alestonia scholaris*	Chatim	*Dulbergia sissoo*	Shisu
5	*Albizia lebbeck*	Siris	*Eucalyptus globolus*	Eucalyptus
5	*Cocus nucifera*	Narikel	*Caryota urens*	Toddy Plam
6	*Azadirecta indica*	Neem	*Araucaria cookie*	Kooki Pine
6	*Aegle marmelos*	Beel	*Leucaena glauca*	Epil
7	*Dillenia indica*	Chalta	*Samania saman*	Rain tree
7	*Averrhoa carambola*	Kamranga	*Dysoxylum procerum*	Lambu
8	*Plumeria alba*	Kathgolap	*Cassia javanica*	Java Cassia
8	*Ficus benghalensis*	Bot	*Swetnia mahagoni*	Mahagoni
9	*Ficus religiosa*	Aswath	*Eucalyptus camadulensis*	Kamal gas
9	*Cassia fistula*	Shonalo	*Mesua ferrea*	Nageshwor
10	*Trema orientalis*	Jibon	*Xylia dolabiformis*	Loha-kath
10	*Barringtonia acutangula*	Hijol	*Acacia mangium*	Mangium Acacia

Direct observation of birds visiting the study site was conducted, and all bird species were identified and carefully examined. We have

identified birds using the Red List of Bangladesh—Volume 3: Birds (IUCN Bangladesh, 2015). Photographs were taken using a NIKON D7100 camera in a number of instances to confirm identification. The data of plant phenology also recorded to correlate the phenological events and presence of birds on the plant species.

Following parameters of plant phenology have been observed:

Fruit appearing	:	when fruits started to bloom;
Fruit ripening	:	when fruits became matured and ready for feeding;
Fruit disappeared	:	when no fruits were found in the plants;
No flower and fruits	:	only leaves occurred;
Only flower	:	when flowers were blooming;
Leafing out	:	when plants expelled all leaves, and
New leaves	:	when new leaves started to grow.

Scan sampling method by using Bushnell 8 x 21 binocular was followed to record the activities of birds on selected plants. This scan sampling method yields useful data for defining broad feeding choice in chimps and other species (Gilby et al., 2010). During the sampling, the following parameters of activity were recorded: feeding, resting, nesting, moving, and preening of birds.

Data was collected by observing the individual bird species in each sampled plant during the study period. Necessary pre-designed data sheet was used for conducting the work. Geographical Positioning System (GPS location) with latitudes and longitudes of plants was recorded by using Garmin GPS, time of observation, meteorological conditions and temperature of study area also noted to data sheet. The Simpson's Diversity Index (D) was conducted to calculate the bird diversity in native and non-native plants. The index is most commonly employed in ecological research to assess species diversity. The value of D will always be between 0 and 1, with 1 representing entire diversity and 0 representing no diversity. The density of birds was calculated in percentage to investigate bird abundance.

RESULTS AND DISCUSSION

We have recorded a total of 44 species of birds from our sampled plants, with 281 individuals in native plants and 156 in non-native plants. Of these, 26 bird species were found in native plants and 18 bird

species in non-native plants. Fifteen species of birds were identified in both native and non-native plant species.

The abundance of bird species was substantially higher in native plants than in non-native one. The *Alstonia scholaris,* a natural plant of the Plumeriae family, from which, 46 bird individuals of 14 species were observed throughout the study period. The non-native plant with the most bird species was *Tectona grandis*, which had around 13 bird species.

The Simpson's Diversity Index (*D*) was used to calculate a measure of diversity that takes into account both the quantity and the abundance of something. The *D* value for native plants was 0.049, which is greater than the average for non-native plants (0.042), indicating that the diversity of birds in native plants is greater than the diversity in non-native plants.

In comparison to non-native plants, native plants had a significantly higher species diversity and abundance due to the fact that the majority of non-native plants produce no or inedible fruits or food for birds. It is also noteworthy that the majority of the non-native plants are largely woody, with little or no parasites/insect fauna due to their resistance to these bird foods. As many birds depend on insects residing in plants, without the insects and parasites, birds will not prefer this plant for foraging. This study suggests that our native birds are not adapted to non-native plants; hence they avoid the non-native plants. Conversely, the majority of native plants were fruiting, because of their variety food resources, native plants have been preferred by birds. According to Burghardt et al. (2009), native plants supported much more native species of birds in terms of biomass, species richness, abundance, and diversity.

The number of bird individuals fluctuated between months. During the month of November, a considerable number of birds were observed among native plants; approximately 80 bird individuals were observed. On the other hand, more bird individuals have been recorded in non-native plants during the month of January, totaling 42 bird individuals of various bird species. The number of bird species varies according to the month as well. The highest bird species were found in native plants in November, whereas the most bird species were found in non-native plants in January. Even, the frequency of birds in plants could be influenced by the time of day; birds were more active in the early morning (when the sun rose) and afternoon (when the sun light

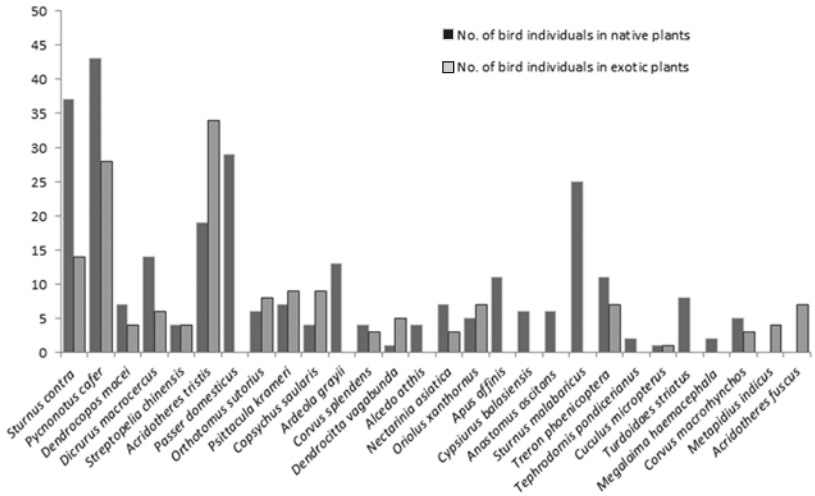

Figure 2. Occurrence of the bird species in native and non-native plants of JU campus.

Plant phenology has influenced the abundance of birds during different months of the study period (Table 2). For example, birds were abundant throughout the fruiting and flowering seasons, but there were a few or no birds in the plant at other times. Bird availability was also affected by plant size and shape. Birds like the middle-sized round-shaped plant (*Alestonia scholaris*) and avoid the excessively long and sparsely branching plants.

Month	Number of species		Number of individuals		*D* value	
	Native	Non-native	Native	Non-native	Native	Non-native
November	11	8	80	15	0.096	0.011
December	9	9	21	28	0.006	0.041
January	13	13	62	40	0.057	0.084
February	13	6	46	32	0.031	0.054
March	14	6	48	21	0.034	0.023

Topography and location of the sampled plant species appeared to be an important factor of birds to choose to feed, rest, nest, and forage. In particular, ponds, roadways, human settlements, highlands, and lowlands influence birds' abundance and diversity any particular study grid. Our study showed that birds were more abundant among the plants near the ponds and lake, where there was little or no disturbance. On the other hand, the number of birds was lower in plants along the road, near human settlements, and in densely vegetated areas. The location of plant species also influenced the diversity and density of birds. Interestingly, irrespective to native or non-native of plants, nearby of ponds tend to have higher bird diversity and densities because many aquatic birds congregate nearby to wait for pond fish to be caught. However, due to disturbances like noise, pollution, food shortages, etc., plants along roadsides and close to populated areas do not exhibit a wide variety of bird species.

The majority of birds were engaged in resting and the least in nest building in both native and non-native plants. Of the recorded 281 birds in native plants, 16% of them were found feeding, 49% resting, 7% nest building, 19% moving, and 9% preening. On the other hand, of the total 156 bird individuals seen in the non-native plant, approximately 21% were found in feeding, 46% resting or sitting, 27% moving, and 6% preening. There was a total of 16 nests established by various bird species, with 13 nests in native plants and three in non-native plants. The majority of the nests were created by Asian Pied Starling (*Sturnus contra*), who opted for plants randomly.

The seasonal variations of avifauna diversity show that higher diversity of birds was in November than other months throughout the study period, when fruits were available for birds. Afterwards, the temperature gradually dropped when plant growth was slowed down. According to Van and Seddon (1999), spring and late summer are the seasons of greatest bird diversity and abundance. Bird abundance was increased when plants were abundant with blooms and fruits because the birds consumed the fruits and flowers. However, the plants without flowers and fruit reflect a lower density and diversity of birds during the winter. According to Kissling et al. (2008), environmental conditions have different direct effects on plants and avian trophic guilds, and bird and woody plant variety are related at this scale via vegetation structural complexity. The bird diversity and density also

fluctuated during different time of day. Birds were more active in the morning and late afternoon. At this time, they foraged foods in the tree's barks, branches, leaves, flowers and fruits. For this reason, this was the peak time for birds. According to Robbin (1981), most species' activity peaks around the hour surrounding sunrise or the hour afterward. The majority of species' activity then progressively decreases as the morning go on, reaching a low point in the middle of the day.

Birds began building their nests in March. A total of 16 bird nests was recorded, 13 of which were found in native plants and 3 in non-native plants. Due to the fact that natural plants were better for birds where native flora provide a suitable nesting place and additional food sources. According to Jahan et al. (2018), *Albizia* spp. (native or long naturalized species) were the most frequently used trees for bird nesting, while no nests were located in *Eucalyptus* spp. and only a few nests were discovered in *Acacia moniliformis*, both of which are non-native trees that have been planted in significant numbers on the campus. This suggests that birds do not prefer non-native tree species for nesting as well.

Conclusion

Native plants are in integral part of the natural lives of everything from bacteria to birds to people. In fact, most native fauna including birds, butterflies, primates, etc have been known to avoid most of the imported plants. For example, native Blueberry in North America has been observed hosting about 285 native species of butterflies and moths in north America while non-native Flowering quince (*Chaenomeles speciosa*) was observed hosting only 6. Similarly, the native Oaks support over 500 native species of butterflies whilst the Common reed, *Phragmites australis*, a non-native plant and invasive menace, supports 170 species of Lepidoptera in its homeland, while supporting only 5 species here (Tallamay 2009). Other studies have shown that bird richness and abundance—especially bird species affiliated with tree- and shrub-dominated ecosystems—were greater in native than non-native-landscaped yards (Tallamy 2009, Smallwood and Wood 2023).

While landscaping with native plants in human-dominated urban landscape generally benefits wildlife, ironically, we have loaded our urban landscapes with non-native plans at the expense of the native plants in JU campus and across the country that once supported our local ecosystems. We recommend replacing non-native vegetation with the native fruit-yielding plant species in the future landscaping process of the JU campus.

References

Ahmed, Z.U., Hassan, M.A., Begum, Z.T.N., Khondker, M.S., Kabir, M.H., Ahmad, M.,Ahmed, A.T.A., Rahman, A.K.A. & Haque, E.U. eds. (2008). *Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh*, Vols. 6-12. (Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka)

Altmann, J. (1974), 'Observational Study of Behavior: Sampling Methods', *Behaviour*, 49 (3-4): Pp. 227-266

Applied Ecological Services. (2012), 'Native Landscape Design', *Retrieved* (January the 2nd, 2013 at https://newleafnatives.com/pages/ecological-services)

Begum, S. (2016). *Birds of Jahangirnagar University Campus*. (Arannayk Foundation, Bangladesh)

Burghardt, K. T., Tallamy, D. W., & Gregory Shriver, W. (2009), 'Impact of Native Plants on Bird and Butterfly Biodiversity in Suburban Landscapes', *Conservation biology*, *23*(1): Pp. 219-24.

Gilby, I. C., Pokempner, A. A., & Wrangham, R. W. (2010), 'A Direct Comparison of Scan and Focal Sampling Methods for Measuring Wild Chimpanzee Feeding Behaviour', *Folia Primatologica*, *81*(5), Pp. 254-64

Hossain, M.K. (2009). 'Alien Non-native Plant Species and Their Effects on Hill Forest Ecosystems of Bangladesh', R.K. Kohli, S. Jose, H.P. Singhand D.R. Batish (ed.) *Non-native Plants and Forest Ecosystems*, (New York) Pp. 133–41

Idilfitri, S., Sulaiman, S., & Salleh, N. S. (2014). 'Role of Ornamental Plants for Bird Community' Habitats in Urban Parks', *Procedia-social and behavioral sciences*, *153*, Pp. 666-77

IUCN Bangladesh. (2015). Red List of Bangladesh—Volume 3: Birds. International Union for Conservation of Nature, Gland, Switzerland.

Jahan, I., Begum, S., Feeroz, M. M., Das, D. K., & Datta, A. K. (2018), 'Nesting Pattern of Birds in Jahangirnagar University Campus, Bangladesh', *Journal of Threatened Taxa*, *10*(5), 11618-11635

Khan, S. A., Sultana, S., Hossain, G. M., Shetu, S. S., & Rahim, M. A. (2021), 'Floristic Composition of Jahangirnagar University Campus - A Semi-natural Area of Bangladesh', *Bangladesh Journal of Plant Taxonomy*, *28*(1), Pp. 27–60

Kissling, W. D., Field, R. & Böhning-Gaese, K. 2008, 'Spatial Patterns of Woody Plant and Bird Diversity: Functional Relationships or Environmental Effects', *Global Ecology and biogeography*, *17*(3): Pp. 327-39.

Knick, S. T., Rotenberry, J. T., & Leu, M. 2008, 'Habitat, Topographical, and Geographical Components Structuring Shrubsteppe Bird Communities', *Ecography*, *31*(3): Pp. 389-400.

Linz, N. (2023), 'Why are Native Plants So Important?', *Ohio Native Plants Month at Ohionativeplantmonth.org*

Monroe, B. L. and Sibely, C. G. 1997, *A World Checklist of Birds*, (Yale University Press, London, UK) Pp. 416

Protection, U. E. (2012), 'Quantification of the Benefits of Native Landscaping Current Knowledge', In: *Exploring the Environmental, Social and Economic Benefits Conference*.

Smallwood, N. L. and M. E. Wood. (2023), 'The Ecological Role of Native-plant Landscaping in Residential Yards to Birds During the Nonbreeding Period', *Ecosphere* 14 (1): e4 360

Van Heezik, Y. & Seddon, P. J. (1999), 'Effects of Season and Habitat on Bird Abundance and Diversity in a Steppe Desert, Northern Saudi Arabia', *Journal of Arid Environments*: *43*(3), Pp. 301-317

Young, S. L. (2010), 'What Contributions are Non-native Plant Species Making to Ecosystem Services?', *Journal of Soil and Water Conservation*, 65(2), Pp. 31A-32A.

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

Bangladesh's Foreign Policy Peaceful Coexistence Views of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Khadija Aktar*

Abstract: This study has highlighted the influence of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's ideals and beliefs on Bangladesh's foreign policy. It has uncovered that the principles of Peaceful Coexistence and non-aligned doctrine shaped the foreign policy of Bangladesh. The post-liberation reality demanded the supremacy of the national interest in the foreign policy formulation of the new nation. Since independence, the People's Republic of Bangladesh has maintained peaceful coexistence and non-alignment as guiding principles of its foreign policy. The paper shows that the ideas behind this concept originated before independence and have their origins in the values, beliefs, and ideals of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Introduction

Foreign policy is the sequence of acts and approaches taken by a country in its dealings with other countries to accomplish national objectives and advance national interests. Geopolitics, historical motivations, national interests, people's desires, ethnicity, elite perception, economic necessity, religious sentiments, the value system, domestic politics, domestic policy, and the external environment may all influence foreign policy objectives.[1] Bangladesh's foreign policy goal was to gain acceptance in the international community and join the United Nations as a full member, which was the biggest challenge for the government after the liberation war. Such formal recognition of the nation was needed to protect its sovereignty and independence.

The initial phase of Bangladesh's foreign policy was mainly directed towards seeking international public opinion for the freedom movement and developing diplomacy for recognition in the international arena.[2] During the Liberation War, Bangladesh did not

***PhD Fellow, IBS, Rajshahi University, Rajshahi**

get support from most countries except India. Moreover, the USA, China, and certain Arab countries shifted toward Pakistan during the war. Furthermore, the nation's economy was utterly destroyed after independence. The massive loss and devastation Bangladesh experienced during the liberation period had additional adverse effects on an already vulnerable economy. With a predominately agricultural economy, the lowest per capita income even by Asian standards, and an already dense population overgrowing out of proportion to its natural resources and capacity to absorb people, independent Bangladesh inherited these conditions. The rapid population growth, changing expectations, the already beginning social disintegration and the need for reconstruction, and the massive rehabilitation of thousands of refugees who had fled to India during the Liberation War all pointed to an escalation of poverty and internal instability. In this situation, as the leader of a newly independent country, Bangabandhu realized the vulnerabilities of his people and tried to remake relations with countries that were hostile to Bangladesh. However, with a focus on safeguarding national interests, Bangladesh's foreign policy aims to balance and harmonize the internal and external environments due to insufficient economic and military force.

Regarding this, Bangabandhu's government had followed an independent and non-aligned foreign policy fostering friendship with all nations of the globe based on mutual respect for sovereignty, equality, territorial integrity, and non-intervention in the international affairs of other states. Bangladesh's foreign policy was laid down in Article 25(1) of the Constitution of Bangladesh. The articles are given below:

> Article 25(1): The state shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, non-interference in the internal affairs of other countries, peaceful settlement of international disputes, and respect for international law and the principles enunciated in the United Nations Charter, and based on those principles shall:
>
> (a) Strive for the renunciation of the use of force in international relations and for general and complete disarmament;
>
> (b) Uphold the right of every person freely to determine and build up its own social, economic, and political system by ways and means of its own free choice; and
>
> (c) Support oppressed people throughout the world in waging a just struggle against imperialism, colonialism, or racialism.[3]

Conceptually, the principle shaped in Article 25(1) should be viewed as the foundation of Bangladesh's foreign policy planning.

The paper explores Bangabandhu's ideals, beliefs, and values in relation to peaceful coexistence and Bangladesh's foreign policy. A historical method was used in this study. To achieve this goal, data was collected using content analysis based on primary and secondary sources. In this study, three books by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, his speeches, and government documents have been used as primary sources. The personality traits and extensive political experiences that shaped and formed Bangabandhu's perceptions, thoughts, and ideals are discussed in this article. These factors, in turn, influenced his decisions about foreign policy concepts and principles, particularly on peaceful coexistence. This research will help analysts and academics understand how Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's ideals shaped Bangladesh's foreign policy, which will ultimately help them comprehend the dynamics of Bangladesh's foreign policy.

Conceptual Understanding

Many factors influence shaping a country's foreign policy. Geographical and historical factors are constants, but a country's foreign policy must consider its internal circumstances, its internal system's needs and values, its leadership, its institutions, the political participation of its citizens, and the global and regional environment. The role of humans is essential when choosing between several alternative objectives and techniques for creating and executing foreign policy. Thus showing that foreign policy is always dynamic and cannot be static. James Rosenau has emphasized the connections and interconnectedness of domestic as well as global politics throughout his theory of decision-making.[4] Rosenau divides the factors that influence the formulation of foreign policy into five main categories: idiosyncratic, role, bureaucratic, national, and systemic.[5] The thoughts, perceptions, and individual traits of the decision-makers are the focus of the idiosyncratic factors.[6] Individuals' beliefs, intellectual strengths, weaknesses, past experiences, emotional needs, and personality traits can influence foreign policy design and execution, affecting their understanding of the international arena and its objectives.[7]

Another scholar stated that individual people are the ones who decide and take the actions that constitute international relations.[8] That means international relations involve interactions between states and institutions, with leaders, diplomats, activists, and experts playing a

crucial role in determining a nation's foreign policy and global interactions. These people's opinions, attitudes, experiences, and beliefs affect how international relations develop and can significantly impact the world stage.

There are many scholarly articles[9] on how leaders' traits influence a nation's foreign policy. Individuals' personalities or perceptions—how they interpret their surroundings and events—may be the focus of an analysis. The first focus encourages the study of personality traits, beliefs, and values as factors that influence foreign policy decisions. It highlights the persistent characteristics of an individual decision-maker. Understanding a person's personality, character, beliefs, and values helps us better understand what drives decision-makers. Furthermore, decision-makers for a nation's foreign policy take action based on their interpretation of reality rather than in response to reality itself.[10] Perceptions are connected to decisions made in foreign policy and might be helpful as independent variables.[11] In words, Individuals shape the course of history because it is their choices and decisions that drive the course of events.[12]

From the existence literature and conceptual understanding, it is defined that the leaders' traits play an essential role in determining foreign policy and international relations. Despite societal and governmental limitations, legitimate, democratically elected leaders traits can influence foreign policy through dynamic leadership, wise diplomacy, strategic personality traits, beliefs, and values. The particular combination of a person's ideas, capacity for thought, background, emotional need, and character traits impacts them. The following discussion examines the role of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the origins of Bangladesh's concept of peaceful coexistence in foreign policy.

Early Life of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Childhood, family, schooling, socio-economic environment, and Bangabandhu's long standing political career significantly influenced his beliefs, values, and perceptions. Bangabandhu was born on March 17, 1920, in a wealthy rural family at Tongipara village in Gopalganj. In childhood, Sheikh Mujib had a friendly environment that was a combination of kindness, a big heart, and openness. During the crisis, he was often seen donating his clothes to needy children and raising grain for the starving peasantry. His father's traits and good activities

influenced Mujib from an early age. His ideas and knowledge were built up in the family. He said,

> … My father used to keep many newspapers. He subscribed to Ananda Bazar, Basumati, Azad, the Monthly, Mohammadi, Saugat, and other newspapers. I used to read them from an early age.[13]

It means that he grew up in a caring and stimulating community that pushed him to expand his mind and broaden his perspective. It also emphasizes the importance of having a friendly environment where one can learn about various sources of information to promote critical thinking, education and informed citizenship. These factors were crucial in the life of Sheikh Mujibur Rahman and ultimately contributed to his leadership in the struggle for rights and developed his perception of coexistence views with interactions with others.

Sheikh Mujib's father felt pride in Mujib's generosity, even though he strongly criticized his son's activities. He said in his autobiography, *The Unfinished Memoirs*, ' … In some cases, we resorted to having such people's houses pelted with stones at night. My father often punished me for following this policy.'[14] Early in life, Mujib was impacted by his father's two character traits of honesty and forthrightness. Sheikh Mujibur Rahman possesses both of these qualities. According to *The Unfinished Memoirs*, '… My father said to me at this time, Son, … if you have sincerity of purpose and honesty of purpose, you will never be defeated in life. I never forgot these words of advice he had for me.'[15]

Bangabandhu's words are a timeless reminder that morality and sincerity are the cornerstones of character that can promote moral and personal development, overcome adversity with courage, and lead to a sense of success and fulfillment in life. It inspires people to develop and integrate these characteristics and incorporate them into their social interactions and decision-making processes.

Bangabandhu's teacher's efforts inspired him to establish a Muslim welfare association and alms collection campaigns for underprivileged students in Gopalganj, enabling them to continue their education.[16] He didn't expect admiration from his friends; he expressed with satisfaction, 'I feel immense pleasure when I see smiles on someone's lips.'[17]Bangabandhu addressed this in his autobiography, '… In those days, Hindus owned eighty present of the shops in town. …we didn't treat Hindus and Muslims differently then. I was very friendly with the

Hindhu boy.'[18] In 1938, a public exhibition was held honouring Chief Minister A. K. Fazlul Haque and Labour Minister Shaheed Suhrawardy of Bengal at Gopalgonj. Mujib, then a student, led a team of volunteers, including young men from the Scheduled Castes. However, upper-caste Hindu youths withdrew due to local Congress officials' orders. 'I was surprised at hearing this news,' Mujib later wrote, 'because, to me, there was nothing at that time called Hindus or Muslims. I got along well with the Hindu boys. We used to play music, sing, play games, and go out.'[19] Fortunately, despite fears that this meeting would be the focal point of a communal disturbance, the entire schedule went off without any problems. Later, Mujib frequently lamented the conflicts between Muslims and Hindus.

The terrible communal riots of 1946 impacted Bangabandhu who strongly condemned them and stood by the victims. Bhavatosh Dutta, a well-known Indian economist, recalled in his memoir that–

> The horrific communal riots in 1946 proved how much help Islamia students could provide. Traveling from Ballyganj to Islamia College was risky, so students would cross the street and drive to the college on Wellesley Street. Sheikh Mujibur Rahman, one of these students, crossed the dangerous area with the students.[20]

That means Sheikh Mujibur Rahman's message strongly opposed the adverse effects of communalism. It emphasized the value of harmony, mutual aid and coexistence across religious and social boundaries, especially in crises and conflicts. His desires for peace, tolerance, and rejection of the divisive philosophies that had initially led to bloodshed in the community were all reflected in this message. In his later political career, Sheikh Mujibur Rahman promoted these ideals. He played a crucial role in founding Bangladesh, a country born of resistance to oppression in politics and religion. Subsequently, Sheikh Mujib also spoke out against adopting the words "Islamic Republic" to the nation's name in 1955 while serving as a member of the Pakistan Constituent Assembly.[21] The word 'Muslim' had been eliminated from the Awami Muslim League's name in 1955 when Bangabandhu was the General Secratery of that party.

His upbringing in a middle-class socio-economic background influenced his outlook, fostering traits like humility, prudence, and wisdom. A distinguished diplomat remarked that Bangabandhu's political worldviews were influenced by his family, community, mentors, and societal upbringing.[22] These characteristics emerged in his

interactions with friends and neighbours, encouraging him to adopt coexistence-focused views. That also influenced his later life and played a significant role in helping him gain sufficient credibility to overcome the challenge of reconstructing Bangladesh. As a result, his behaviours and interactions allowed him to express himself and his ideas.

Bangabandhu's involvement in Politics

In 1937, Mujib's leadership abilities were evident when Chief Minister A. K. Fazlul Haq visited Faridpur. During the visit, Mujib presented demands for funding, repairs, and playground maintenance. Haq listened patiently and sought support from local politicians, marking a turning point in Mujib's life. Mujib realized political prospects through friendship with Waheduzzaman's family and Sher-e-Bangla. He joined the District Muslim League's student branch and became a dedicated student political activist in 1940.

After passing the matriculation examination in 1941, Sheikh Mujib attended Islamia College in Calcutta and involved in political activities. He was obsessed with Pakistan's establishment and focused on two states. The Bengal Provincial Muslim League had two factions: one led by Muhammad Akram Khan and Khawaja Nazimuddin and the other under Suhrawardy and Abul Hashim. Because of this, the latter group was seen as progressive.[23] This faction aimed to free the Muslim League from establishment rule and transform it into a people's institution from Khan Bahadur, Nawabs, Zamindars, and Jotdars[24] and furthermore, wanted to abolish the Zamindari system. Abul Hashim inspired him to work full-time for the Muslim League, and he is a member of the latter group.

Bangabandhu's Participation in Independence War

Bangladesh, then East Bengal, became part of Pakistan after the partition of the Indian subcontinent in 1947. East Bengal, with a Muslim majority, was integrated into Pakistan as East Pakistan, with no similarities except for religion. The geographical separation of Pakistan into two wings played a significant role in political and economic unrest. The West Wing received three-fourths of the foreign aid, leading to a 61% higher per capita income in 1970 while East Pakistan received only a tiny amount of federal investment.[25] The 1965 India-Pakistan war highlighted East Pakistan's vulnerability and

inability to defend itself using Western forces.[26] The focus was on religious affiliation rather than location or cultural background, and Bengal Muslims sought to improve their living standards in the newly introduced Muslim state. The Six-Point, a popular political demand in East Pakistan, was declared in 1966, lead to extreme political divisions between the Western and Eastern Wings.

Sheikh Mujib's political party, the Awami League, rose to prominence in East Pakistan during the 1970 elections, raising concerns about its potential threat to the West. The election resulted in a victory for Bengali nationalism and the Awami League. However, the military Junta of Pakistan did not hand over power to Sheikh Mujibur Rahman, leading to a violent protest in 1971. East Pakistan's people, under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, proclaimed their independence and turned East Pakistan into Bangladesh. The guerrilla operations against Pakistan's forces, known as the Liberation War of Bangladesh, took place from March to December 1971.

The conflicts between East and West Pakistan were part of a more significant international situation involving the United States, the Soviet Union, China, and the Middle East. India's participation in the Liberation War helped resolve the civil unrest in East Pakistan, resulting in increased military and humanitarian support for the Mukti Bahini and associated liberation groups. In contrast, the policy of the superpower in South Asia added a new dimension to the Bangladesh problem. During this period, there was a conflict between the USA and the Soviet Union.

The Banglees participated in the Liberation War in 1971 against the brutal Pakistani army to achieve freedom from poverty and economic advancement. The aim was to create a society of equality in a democratic and non-communal state where people of different religions, cultures, and languages could live harmoniously and peacefully together. In this regard, Bangabandhu stated at Suhrawardhy Uddyan on his triumphant return Dhaka on 10th January 1972:

> My brethren in West Pakistan, I have no ill-will against you. I want you to live in happiness. Your army has killed thousands of my men, dishonoured our mothers and sisters and has ravaged our villages. Yet I bear no hatred against them. May you live in freedom and may we live in freedom. We may have friendship with you as we may have friendship with any other nations of the world.[27]

Bangabandhu, in this speech, expresses a desire for peace and harmony for West Pakistan and their community despite the bloodshed and suffering. The purpose described in the message is that both parties would be able to live in freedom and foster friendships, just like they would with any other country in the globe. It feels like a plea for harmony and a commitment to a peaceful future.

Peaceful Coexistence

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman prioritized international relations, utilizing a balanced strategy of 'friendship to all and malice towards none' and promoting peaceful conflict resolution as a fundamental foreign policy principle. It is one of the remarks from Bangabandhu that became the foundation of Bangladesh's foreign policy. Bangabandhu's statement, "Friendliness to all and hatred towards none," became the foundation of Bangladeshi foreign policy. The phrase "friendliness to all and hatred towards none" was mentioned by Bangabandhu in an interview on January 10, 1972, after his return home from the then Pakistan. He also added that Bangladesh would be the Switzerland of Asia.[28] The fundamental assumption behind his desire is that, like Switzerland, Bangladesh wants to uphold peace, foster economic growth, and maintain a neutral stance towards controversial world politics.

The ideology of peaceful co-existence with all countries and hatred against none was included in the election manifesto of the Awami League in 1970. The following was recorded under the title 'Foreign Policy' and the subheading 'Peaceful Coexistence'.

> In keeping with the basic principles of friendship to all and malice towards none, we wish to live in peaceful co-existence with all countries, including our neighbours, based on justice and mutual respect for each other's security. Consistently, with this aim, we shall not and cannot afford to be drawn into global conflicts, which are raging in the world today.[29]

Bangabandhu stated at Racecourse Maydan before almost two million people in Dhaka on 3rd January 1970:

> …We support peaceful coexistence. The Awami League government maintained friendly relations with all nations, including India, China, Russia, Iran, Afghanistan, Turkey, Singapore, and Burma. If a disagreement arises, a peaceful resolution will be arranged … I urge the superpowers to reduce arms competition and stand by the people of poor countries with this money spent on arms.[30]

History shows that even during the Pakistani era, the Awami League leaders who initially created Bangladesh's foreign policy supported friendly relations and peaceful coexistence with India. The Awami League-led United Front's provincial election platform for East Pakistan in 1954 and their enthusiastic support for the Tashkent Agreement between India and Pakistan in 1966, which promoted a policy of cooperation rather than confrontation, both demonstrated this attitude towards India.[31]

After being freed from Pakistani imprisonment, Sheikh Mujibur Rahman said during his first news conference in London, 'We live in a small nation. We seek friendship with everyone and hatred for no one.'[32] Focusing on a different philosophy, to stay peaceful coexistence Bangabandhu adopted the policy of non-alignment, it can be claimed that this option was essential and benefited Bangladesh in the years after the Liberation War. Yet, choosing a specific procedure was not a post-war innovation. As was mentioned, this policy choice was part of the foreign policy guidelines of the government in exile during the war of freedom. If we look back even further, The Awami League has consistently opted for an independent, non-aligned foreign policy since Bangabandhu Sheikh Mujib gained control of the party as general secretary in 1953. The Awami League, a strong opposition party, illustrated staunch support for non-aligned foreign policy as a protest against the Muslim League's pro-Western plans to develop Pakistan's joining of SEATO and the Bagdad Pact.[33]

Furthermore, Bangabandhu was a firm supporter of anti-imperialism and non-alignment. Following the Bandung Conference in April 1955, Bangabandhu showed firm support for non-alignment in foreign policy and an anti-imperial stance even before the non-alignment movement officially started in 1961. On August 31, 1955, while the Constituent Assembly of Pakistan was in session, Bangabandhu raised a point of privilege and requested the speaker to adopt a resolution denouncing the French government's actions concerning the deaths of innocent citizens of Algeria and Morocco.[34] Bangabandhu also proposed a resolution to the French government and victims of the tragedy, urged action to stop global freedom struggles, and called for a minute of silence to remember those who sacrificed for independence.

His 1952 trip to China, where he saw China's rapid development and the end of repression, impacted Bangabandhu's anti-imperial policies

and disassembly.[35] He adopted a non-alignment philosophy in foreign affairs after the visit. He also said in his book that he became pretty anti-western imperialism during this tour.

Regarding Jammu-Kasmir dispute, he clarifies that the military caste and the capitalists have used the Kashmir dispute to justify oppression and significant military spending. He continues, and yet, we have not fulfilled our obligation to the people of Jammu and Kashmir.[36] It is the best of relations with India that Bangabandhu desires. He claims that we share a sub-continent, and we have to live and trade together whether we like it or not. He emphasises Bangladesh's foreign policy with China is dictated by the facts of geography and procedures, but this does not mean that we change our system or outlook; we are Muslims and shall never accept communism.[37] On February 19, 1971, in an interview in Dhaka with a correspondent for the Tehran daily Keyhan, he spoke about his foreign policy and said it consisted of nonalignment combined with active friendship with all nations worldwide.[38]

Undoubtedly, Bangabandhu maintained his unequivocal commitment to promoting peace on an international, regional, and national level. A content analysis of 22 multilateral and bilateral events from 1972 to 1975 shows that Sheikh Mujib expressed the word 'peace' 151 times while speaking at such discussions, followed by 'world' and Asia-76 and 33 times, respectively.[39] Such a dedication to peace was the result of his own personal experience, which was the result of his internment for 4,682 days for launching political campaigns against the repressive state of Pakistan. When Bangabandhu addressed the international community at the United Nations, he reiterated the following message:

> The very struggle of Bangladesh symbolized the universal struggle for peace and justice. It was therefore, only natural that, Bangladesh, from its very inception, should stand by firmly by the side of the oppressed people of the world.[40]

Conclusion

Bangabandhu's middle-class upbringing shaped his outlook, fostering humility, prudence, and wisdom. These traits influenced his coexistence-focused views, gaining credibility for reconstructing Bangladesh and allowing him to express himself. Bangabandhu's insights are based on his experiences, focusing on his observation of

the past conflicts between the United States and the Soviet Union during the Cold War. These tensions were notably visible during the Liberation War of Bangladesh in 1971. However, Bangabandhu had additional reasons for opposing the arms race and aligning. One of these reasons was his concern over Pakistan's decision to align with the US through its membership in CENTO and SEATO in the mid-1950s. This alignment resulted in the militarization of Pakistan while simultaneously depriving the eastern wing of Pakistan (now Bangladesh) of the necessary funds for the empowerment and development of its people. Mujib's opposition also came from his belief that accumulating military power may not have been the most effective approach. There is strong evidence to suggest that Mujib, based on his personal experiences in British India and post-partition Pakistan, believed that these periods were characterized by colonialism, significant oppression, and a negative impact on human lives. Bangabandhu worked tirelessly throughout his life to ensure that the Bangalee people would benefit from independence and triumph over hunger, poverty, disease, illiteracy, and unemployment. In the same way, he desired that all people have access to these rights and stay coexistence. This goal is repeatedly reflected in his speech to the U.N. The meaning of Bangabandhu's statement that Bangladesh adopted a non-aligned foreign policy based on "the principles of peaceful coexistence and friendship to all" is clear.

The principles of the People's Republic of Bangladesh's foreign policy, which the country has adhered to since attaining independence, include peaceful coexistence and non-alignment. The paper provided evidence that the formulations of this doctrine are a pre-independence phenomenon. These articulations also originate from the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. In essence, it represented his ideals, principles, and beliefs.

References

1. Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*, 2nd ed. (New York: Rowman &LittlefieldPublisherss, 2014)), P. 34
2. Imtiaz Ahmed, 'Bangladesh Foreign Policy: Constraints, Compulsions, and Choices', *Bangladesh Institute of International Strategies Studies*, Vol.32, no. 3, (July 2011), P. 208
3. Article 25, *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh* (Dhaka: Government Printing Press, 1979), Pp. 8-9

4. James N. Rosenau, *Scientific Study of Foreign Policy* (New York Free Press, 1971), P. 145
5. William C. Potter , "Issue Area and Foreign Policy Analysis," *International Organization* , Vol. 34, No. 3 (Summer, 1980), P. 408; https://www.jstor.org/stable/2706496,
6. Herbert C. Kelman, 'The Role of the Individual in International Relations: Some Conceptual and Methodological Considerations', *Journal of International Affairs*, Vol. 24, No. 1 (1970), P. 7 https://www.jstor.org/stable/24356661
7. James N. Rosenau, op.cit., P. 318
8. Herbert C. Kelman , op. cit. , Vol. 24, No. 1 (1970), P. 1
   URL: https://www.jstor.org/stable/24356661
9. Margaret G. Hermann, 'Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders', *International Studies Quarterly*, Vol. 24, No. 1 (Mar., 1980), Pp. 7-46; Margaret G. Hermann, Thomas Preston, Baghat Korany and Timothy M. Sha, 'Who Leads Matters: The Effects of Powerful Individual', *International Studies Review*, Vol. 3, No. 2, (Summer, 2001), Pp. 83-131; Valerie M. Hudson, 'Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations', *Foreign Policy Analysis*,Vol.1,No.1,(March2005), p. 1-30 https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2005.00001.x
10. K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis* (New Jersey: 1967), P. 158
11. Richard Herrmann, 'The Power of Perceptions in Foreign-Policy Decision Making: Do Views of the Soviet Union Determine the Policy Choices of American Leaders?', *American Journal of Political Science* , Vol. 30, no. 4 (November 1986) P. 841, https://doi.org/10.2307/2111276.
12. Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (Palgrave Macmillan: New York,2007) P.12
13. Sheikh Mujibur Rahman, *The Unfinished Memoirs* (Dhaka: University Press Limited, 2020), P. 9.
14. *Ibid*, P.14
15. *Ibid*, P. 22
16. *Ibid*, P. 8
17. Yatindra Bhatnagar, *Mujib: The Architect of Bangladesh A Political Biography* (India: Indian School Supply Deport Publication, 1971) P. 30
18. Sheikh Mujibur Rahman, op. cit., P. 10
19. *Ibid.*
20. Bhavatosh Dutta, *At Dashak* [*Eight Decades*] (Calcutta, 1988), P. 177, cited in Anisuzaman, 'Look at Bangabandhu' in Kabir Chowdhudury ed. *Bangabandhu: Jononayok Theke Rastronayok* [Bangabandhu: from Public hero to Statesman] (Dhaka: Annesha Prokashan, 2019), P. 143
21. Shahryar Iqbal, *Sheikh Mujib in Parliament (1955-58)*, 2nd edition, (Dhaka: Agamee Prokashini, 2016), P. 163

22. Tariq Karim, 'Bangabandhu: the architect of Bangladesh's foreign policy ', *The Daily Star, 7* September 2020 https://www.thedailystar.net/in-focus/news/bangabandhu-the-architect-bangladeshs-foreign-policy-1956905

23. *Bangabandhu the People's Hero*, (External Publicity Wing, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2020) P. 21

24. *Ibid*.

25. Hussain Haqqani, *Magnificent delusions: Pakistan, the United States and An epic history of Misunderstanding* (New York: Public Affairs, 2013), P. 136

26. Jagmohan Meher, 'Dynamics of Pakistan's Disintegration: The Case of East Pakistan 1947-1971', India Quarterly: *A Journal of International Affairs,* Vol. 71, No. 4 (December 2015), Pp. 300-17 https://www.jstor.org/stable/45072741, doi:10.1177/0974928415600849

27. Rabindranath Trivedi*, International Relations of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: 1971-1973*, Vol. 1 (Dhaka:Parama, 1999), P. 63

28. Kamal Hossain, *Bangladesh Quest for Freedom and Ju*stice (Dhaka: University Press Limited, 2016), P. 167

29. Sheelendra Kumar Sing, et.al.,*Bangladesh documents*,Vol.1, (Dhaka:University Press Limited,1999), P. 81

30. A K Abdul Momen (ed.), *Bhashonsamagra by Sheikh Mujibur Rahman* [Speeches by Bangabandhu] (Dhaka: Charulipi Prokashon, 2020), P. 179

31. Dalia Choudury, 'Bangladesh Foreign Policy Outlook: Regional and International Settings', In: Emajuddin Ahamed & Abul Kalam (ed.), *Bangladesh South Asia and the World* (Dhaka: Academic Publishers, 1992), P. 48

32. *The Morning News*, January 9, 1972 https://drive.google.com/file/d/16M1Z7AlgHB5l3-nufOk1xtxej2ABE_Au/view

33. Talukder Maniruzzaman, *TheBangladesh Revolution and its Aftermath,* (Dhaka:Univwesity Press Limited, 1988), P. 22

34. Shahryar Iqbal (ed.), op. cit, Pp. 14-17

35. Sheikh Mujibur Rahman , *Amar Dekha Nayachin* [A visit to New China] (Dhaka: Bangla Academy,2020), P. 19

36. Sheelendra Kumar Sing, at. al., op. cit., P. 167

37. *ibid.*

38. *ibid*, P. 166

39. Imtiaz Ahmed, 'Bangabandhu Sheikh Mujib and Global Peace in Father of the Nation' Sheikh Hasina (ed.), *Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Birth Centenary Volume*, (Dhaka: Colorline, 2021), P. 287

40. United Nations General Assembly Twenty-Ninth Session official Records, 25 Sptember, 1974 https://bdun.org/wpcontent/uploads/2020/03/Bangabandhu_speech_on_September_25_1974_at_the_UNGA_in_English.pdf

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023

ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

Institutional Quality Assurance at Higher Education in Bangladesh: A Study in the Mawlana Bhashani Science and Technology University, Bangladesh

**Md Sirajul Islam[1], A K M Mohiuddin[1]
A K Obidul Huq[1] and Ajmer Singh Malik[2]**

Abstract: The Mawlana Bhashani Science and Technology University (MBSTU) started the journey for quality assurance initiatives in twelve departments to promote the quality culture and enhance continuous improvement and to get accreditation. It has been realized that in order to enhance and ensure quality in higher education, the higher educational institutions (HEIs) are required to be more responsive to the changing needs of the stakeholders. Therefore, the Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) of MBSTU organized multiple number of workshops and training programs on various aspects of self-assessment activities, attended by faculty members, officers, students, alumni, and auxiliary staff of the university. The IQAC also coordinated, monitored and managed 12 team building workshops, 12 survey sharing workshops, 11 post self-assessment improvement plan training workshops, and 14 curriculum design review and development workshops. The Honorable Vice Chancellor effectively led the university and motivated all to participate in quality assurance activities during the project period. The outcomes of the IQAC activities, which are mainly in the form of suggestions and recommendations were duly considered and a good number of steps to meet the requirements of the stakeholders have been undertaken by the university.

Introduction

Bangladesh intends to avail the opportunities offered by globalization to build a knowledge society. Improving the quality of its tertiary education

[1] Professors, and Members of Institutional Quality Assurance Cell, Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail

[2] Professor, Department of Public Administration, Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana, India

is vitally necessary to spur the country to a higher growth trajectory for attaining the middle-income status by 2020**.** The tertiary education in Bangladesh, currently, has been facing many deep rooted and intertwined challenges. These include inadequate enabling environment for improving the quality of education and research, weak governance and accountability, poor planning and monitoring capacities, and insufficient funding (IQACOM, 2014). The government recognized that the country is at risk of being marginalized in a highly competitive global economy because its tertiary education system is not adequately prepared to capitalize on the creation and application of knowledge. It also realizes that the state has the responsibility to put in place an enabling framework that would encourage tertiary education institutions to be more innovative and responsive to the demanding needs for rapid economic growth, and to empower the graduates with right skills for successfully competing in the global knowledge economy (IQACOM, 2014).

The University Grant Commission (UGC), a statutory body, entrusted with the responsibility to regulate the affairs relating to public and private universities in Bangladesh also recognized that there is a need to initiate quality assurance mechanism for bringing qualitative improvement of higher education as is evident from its Strategic Plan for Higher Education 2006-2026 and subsequently in National Education Policy (NEP) 2010. The Strategic Plan, *inter alia*, recommended the establishment of an independent Accreditation Council for both public and private universities in Bangladesh. Following the recommendations made in the *Strategic Plan,* the Ministry of Education prepared and launched (in mid 2009) the Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP) with the financial support of the World Bank (IQACOM, 2014). The experience and lessons learned from the 25 Self-Assessment sub-projects implemented in fifteen universities under HEQEP generated heightened awareness among the faculty members and management regarding the need for initiating Quality Assurance (QA) in higher education. It also prepared the ground and readiness on the part of the institutions to follow up the recommendations made in Self-Appraisal (SA) reports and widened the scope of appraisal to include all HEIs in phases.

The Ministry of Education, the UGC and the HEIs,on the basis of these developments, realized that it is high time to establish institutional QA cell in every public and private university to develop a mechanism for the systematic review of study programs, to ensure quality teaching-learning, research, knowledge generation and support services standards at an

acceptable level (IQACOM, 2014). Consequently, a Quality Assurance Unit (QAU) within the organizational structure of the UGC, Bangladesh was created under HEQEP to initiate the QA mechanism in Bangladesh's HEIs. As a first step in this endeavor, the HEQEP supported the establishment of IQACs in universities and the QAU provided necessary guidance and extended technical assistance to the IQACs in order to make them functional. The QAU remained as a temporary council until the formation of the national level Quality Assurance and Accreditation Council, Bangladesh (QAACB) in 2016. The QAU prepared national qualifications framework and other quality documents for undertaking quality assessment of HEIs, which were subsequently handed over to QAACB and continued to perform a linkage between IQAC, UGC and QAACB in respect of QA activities. The QAU is retained as a unit within the UGC with revised roles and responsibilities (IQACOM, 2014).

There are some studies were documented on digital teaching and learning for teacher (Cator *et al*., 2014); effective teaching and learning in vocational education (Faraday *et al*., 2010); curriculum and pedagogical issues in education and management (Haule, 2019; Mastropieri and Scruggs, 1994); and teacher attitude with experience on inquiry method of teaching (Tenaw, 2014) in abroad. But there is no information about standardization and validation check for academic program in tertiary education level was done for accreditation in Bangladesh. In this regards, the Quality Assurance Unit of the UGC, Bangladesh took initiatives to establish IQAC in 31 public and 38 private universities of the country including Mawlana Bhashani Science and Technology University (MBSTU) in 2016. It was a 3-year project started from January 2016 and completed in December 2018 with a general aim to initiate the quality culture within the university system of the country. The main objectives of the IQAC of MBSTU are: i) to ensure continuous improvement of quality of teaching; ii) to ensure stakeholders (viz. parents, teachers, students, staff, employers, funding agencies and society in general)of the higher education concerned about its quality and probity; iii) to review the existing policies and procedures of the MBSTU; iv) to institutionalize the quality assurance culture within the university; v) to coordinate all quality assurance (QA) activities at the national level and liaise with UGC and other external QA agencies; vi) to prepare the university to meet the external quality assurance assessment and accreditation requirements; and vii) to monitor and evaluate the self-assessment (SA) practices and processes through audit, survey and other instruments.

Methods and Process

The process of quality accreditation envisages the need to undergo a self -assessment exercise at program level once in every four-year. The whole process, starting from organizing for self-assessment to approval of the improvement plan including preparation of SA reportand external peer review, need to be completed within one year (Fig. 1). The steps of the self-assessment process adopted were as follows:

Scheduling for self-assessment: Self-assessment is a permanent and cyclical processof quality culture. As such, the IQAC prepared a schedule for self-assessment of different departments of the university. According to the schedule the Director of IQAC forwarded a written official communication to every eligible department to constitute the Self-Assessment Committee (SAC)as per the norms laid down for this purpose.

Formation of SAC: The head of the concerned departments called the meeting of their respective faculty members and constituted SAC for their departments by representing interested, experienced and qualified members after receiving communication from the director IQAC in this regard. Thus, the committee for each program was constituted as per the IQAC Operational Manual and with due intimation to the Director IQAC of the university.

Approval of SAC: The director IQAC placed the recommendations of the departments regarding SACs for the necessary approval and informed back to the Heads of the concerned departments about the due approval received from the office of the vice chancellor.

Planning: Each SAC designed an activity schedule to complete the self-assessment exercise after obtaining the due approval for the purpose.

Team Building: According to the activity plan, the head of the SAC, in consultation with the head of the department, organized an awareness building workshop on self-assessment and quality assurance in higher education. This workshop was for developing clear understanding about the SA process and team building. The objective was to ensure the cooperation, participation and commitment of all faculties of the department under assessment.

Preparing for survey: The SAC prepared the survey tools (questionnaire) for major stakeholders i.e., students, alumni, employers, academic staff, non-academic staff, etc. following the self-assessment

criteria and standards. The SAC selected the respondents using appropriate methods for the purpose of opinion survey.

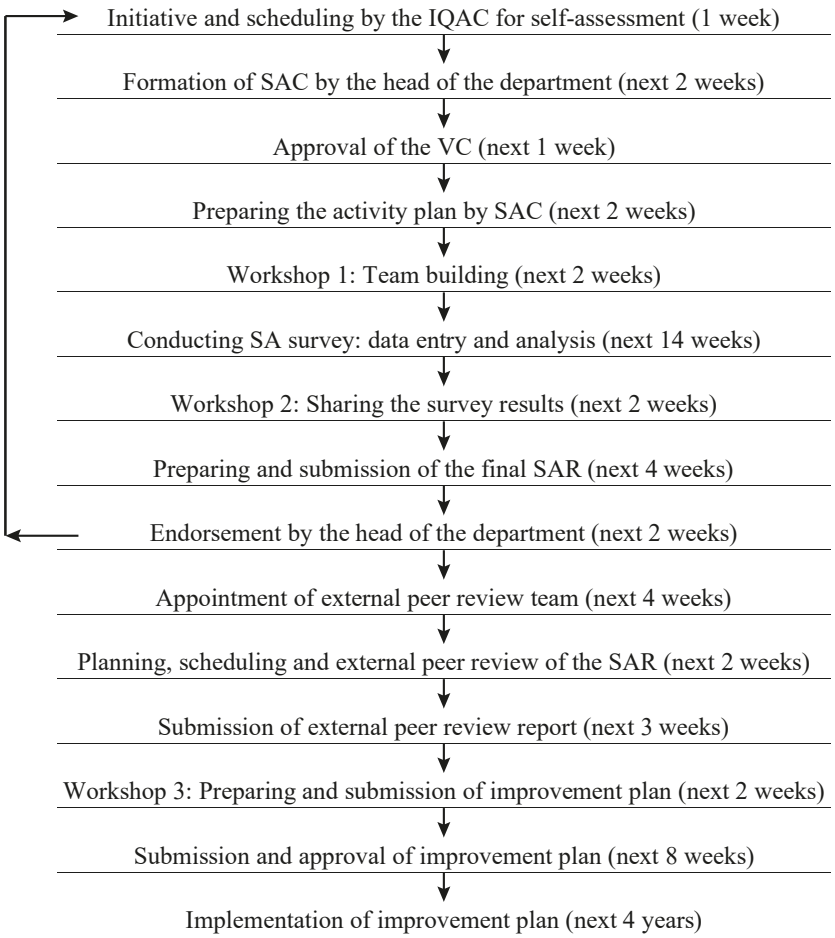

Fig. 1. Self-assessment process (4 years cycle) flow chart followed in the study.

Conducting survey and review: In cooperation of the faculty members, the SAC conducted the opinion survey to collect data and feedback from major stakeholders using separate formatted questionnaire. In addition, SAC also made a critical review of documents related to teaching-learning and research like curriculum, laboratory facilities, student performance assessment tools, students' progress and achievement, etc. Necessary arrangements were made for

data entry and analysis of information and feedback collected by stakeholder survey. On the basis of information collected, feedback and critical review observations the SAC prepared the draft self-assessment report (SAR) on the pattern ofthe format given in the SA manual.

Sharing the survey results: The SAC organized workshop to share the self-assessment results with the faculty members. Wherever needed, the concerned SAC arranged an open hearing and discussion over the second draft with all faculty members, officials and student representatives.

Preparing the final SAR: After all these activities, the concerned SAC prepared the final SA report incorporating the valid suggestions and observations of the workshop and discussion. It was expected that the concerned SAC carried out the SA work activities sincerely and had to submit the final SA report within six months after getting approval of the constitution of SAC.

Submission of SAR for endorsement: The SAC submitted the final SA report to the head of the department for his/her endorsement before it is submitted to the IQAC. The director has to take necessary initiative to complete the external peer review and submission of peer review report within next three months after submission of the final SAR and that was duly taken by it.

Selecting the external peer review panel: While submitting the SA report to IQAC, the SAC also proposed the panel for external peer review to the IQAC. The director IQAC to make necessary arrangements for selection and hiring of the peer reviewers and signing of contract with them.

Facilitating external per review: The external peer review schedule was prepared by the concerned SAC in consultation with the IQAC and head of the program offering entity. Concerned SAC was expected to make all arrangements including meeting with the major stakeholders separately, ensuring necessary supports for external peer review so that the reviewers conduct the review process smoothly within the stipulated time. At least two weeks prior to the visit, the head of the SAC was expected to provide the reviewers with an advance copy of the self-assessment report, review schedule, peer review checklist and university handbook containing university mission and objectives and

department details. It is also the responsibility of the head of the SAC to provide necessary documents and facilities for effective external peer review as stated in the SA manual, on the arrival of peer review team.

Preparing the draft improvement plan: After the completion of external per review, the concerned SAC prepared a draft improvement plan with benchmarking in respect to the SA report findings and the recommendations of the external peer review panel. It was shared with the faculty members in a workshop organized for this purpose. The priority and timeline for undertaking improvement activities were decided in this workshop.

Submission: Finally, the concerned SAC submitted the improvement plan to the head of the department for further necessary actions and sent a copy of improvement plan to the director IQAC.

Results and Discussion

Workshops and trainings organized

The director, IQAC attended a 14-day long international training on *Quality Assurance in Higher Education* in Kuala Lumpur, Malaysia and additional director in Bangkok, Thailand, before starting the SA activities in the university. At the university level, the IQAC of the MBSTU organized 09 workshops (Table 1) and four training workshops (Table 2) on different aspects of quality assurance in higher education and accreditation process during the period of the project, i.e., January 2016 to December 2018.

Inception workshop: The first workshop on induction program was organized with a view to orient the faculties and making thrust on quality assurance program among the representatives from the university related to institutional quality assurance processes. The global perspective on quality assurance, reasons for the rapid growth of quality assurance practices and quality assurance agencies worldwide, quality assurance networks, quality in education, principles of internal quality assurance and external quality assurance were discussed. About 120 teachers of the university participated in this day long workshop.

Table 1. Workshops organized during the project period by the IQAC

S. No.	Workshop Theme	Number of participants	Who participated
1	Inception workshop of IQAC in Mawlana Bhashani Science and Technology University	120	All teachers with Dean, Chairman and SAC
2	Team building and self-assessment process at program level in the university	70	Dean, Chairman, SAC, Senior Officers
3	Workshop on good governance in office management and financial management	50	Dean, Chairman, SAC, Senior Officers
4	Workshop on post self-assessment improvement plan for continuous development of the program entity	50	Dean, Chairman and SAC
5	Workshop on online academic management, teaching, examination and evaluation techniques	50	Dean, Chairman and SAC
6	Workshop on development and management of result preparation and tabulation	50	Dean, Chairman and SAC
7	Workshop on university policy and strategy (act, rules and ordinance) development	40	Dean, Chairman, Head of SAC, Head of offices
8	Workshop on quality assurance for stakeholders' (student, academics, non-academics, parents, community leaders, alumni)	80	Student, Teachers, Officers, Parents, Community Leaders and Alumni
9	Workshop on review and modifications of university rules, regulations and ordinances for good governance	50	Dean, Chairman, Head of SAC, Head of offices

Team building and self-assessment process at program level: Workshop on team building and self-assessment process was organized in the university (Fig. 2). In this workshop discussions were centered on team building for self-assessment activities as well as data collection from various stakeholders.

Good governance in office and financial management: In this workshop, the focus was on good governance, financial responsibilities, payments from operating accounts, cash basis accounting, books of account and supporting documents, bank account operation, petty cash management, bank reconciliation, petty cash reconciliation, general ledger reconciliation, month end ledger balancing, office management, building mindset, internal and external audit.

Post self-assessment improvement plan: Workshop on this topic was held with the dean, chairman and SAC members. The focus was to develop necessary skill among all participants to prepare post self-assessment plan.

Online teaching, examination and evaluation techniques: The workshop covered the background, preconditions, essential technologies and technology infrastructure for online education, designing online courses, technical and administrative supports, educational supports, skills required to be imparted to the teachers, online learning tools, types of online assessment and advantages of online assessment etc.

Development and management of result preparation and tabulation: This workshop was focused on the activities before examinations, during examinations and after examinations; time management; record keeping and issues related to confidentiality.

University policy and strategy (Act, rules and ordinances): In this workshop, the discussion was centered on the historical perspective of higher education and university, basic characters of university, university governance, importance of governance, statutory framework including statutory bodies and their role in operationalization of the university, shared governance, role of leadership and internationalization.

Stakeholder's workshop on quality assurance: A day long workshop was organized for the stakeholders on the above topic. The stakeholders were the teachers, non-academic staff, students, alumni, parents, employer, local leader, and auxiliary staff.

Review and modification of university rules, regulations and ordinances: The topics of the discussion were syndicate, academic council, university authority, disciplinary board, office attendance, leave rules, punishment and accreditation. During the project period, the IQA cell organized four training workshops on different topics in the university campus for QA stakeholders (Table 2).

Curriculum concepts, models and development strategy: In the training workshop, topic covered different nature and types of curriculum, principles and steps of curriculum development, issues in designing curriculum, basic points to consider in curriculum planning,

components of curriculum, elements of specific learning objectives, lesson plan, structure of lesson plan, learning outcome and Bloom's taxonomy.The discussion was centered on the concept of outcome-based education, factors to be considered in outcome-based education, benefits of outcome-based education, deficiencies of traditional education, curriculum design, curriculum mapping, learning pyramid, program learning outcome, generic skill, graduate profile and assessment of learning outcome. Its importance is evident from the fact that the members of the external peer review team of each and every academic program expressed the need to replace the existing traditional syllabus system with the outcome-based curriculum.

Table 2. Training workshops organized during the project period by the IQAC.

S. No.	Topic of training workshops	No. of participants	Types of participants
1	Training workshop on curriculum concept, models, designs and development strategy	121	Teachers
2	Training workshop on research methodology, e-research, research proposal and report writing	126	Teachers
3	Training workshop on quality assurance at the tertiary education level in Bangladesh	140	Teachers
4	Training workshop on role, responsibility and ethical principles of University teachers	140	Teachers

Research methods, e-research, research proposal and report writing: A training workshop with focus on research methodology, study design, research proposal and report writing, e-research, descriptive vs. analytical studies, observational vs. experimental studies, cross sectional study, case-control study, randomized controlled trial, cohort study, sampling, randomization publication types, journals with impact factors, university ratings was organized for the faculty members of the university.

Quality assurance at the tertiary education level in Bangladesh: Another one-day training workshop was organized to orient the self-assessment concept, activity and techniques; and techniques for assessing the students learning outcomes. Emphasis was given on the assessment of an academic program as well as self-assessment to post self-assessment activities.

Role, responsibility and ethical principles of university teachers: The last training workshop was organized to orient the teachers regarding the roles, responsibilities and ethical principles. The discussions were centered on the concept of teaching and learning, qualities of a good teacher, students' development, student assessment, total workload per week, criteria of acompetent teacher/master teacher, teaching and research responsibilities of a teacher, responsibilities to the institution, responsibilities to the public and academic freedom.

In addition, the IQAC of the MBSTU monitored and managed 12 team building workshops, 12 survey sharing workshops, 11 post self-assessment improvement plan training workshops, and 14 curriculum design review and development training workshops.

Self-assessment activities

The Mawlana Bhashani Science and Technology University Tangail has 15 departments and 12 departments qualified the criteria for their inclusion in self-assessment process. Therefore, self-assessment activities were conducted in all 12 departments and SAC constituted in each department performed the necessary activities assigned in accordance with the guidelines. The assessment was made on the nine (09) criteria listed in Table 3.

Table 3. Criteria followed to perform the self-assessment processes.

S. No.	Criteria	Sub-criteria
1	Governance	Mission and objectives, Management
		Accountability and transparency
		Academic leadership and autonomy
		Stakeholder feedback
2	Curriculum contents, design and review	Evaluation, Review
3	Students admission, progress and achievements	Entry qualification, Admission procedure
		Progress and achievement
4	Physical facilities	Physical facilities, Infrastructures
5	Teaching, learning and assessment	Teaching and learning, Student assessment
6	Student support services	Academic guidance and counselling
		Co-curricular and extra-curricular activities
		Alumni services, Community services
7	Staff and facilities	Recruitment, Staff development
		Peer observation, Career development
		Key performance indicators (KPI)
8	Research and extension	Research and extension
9	Process management and continuous improvement	Process management
		Continuous improvement

Further, for each academic program, institutional quality assurance cell planned one workshop named 'Team building workshop' for customization of a predesigned questionnaire; conduction of a survey among stakeholders; preparation of self-assessment report; external peer review of self-assessment report and preparation of an improvement plan on the basis of recommendations made by the external peer review team and findings of self-assessment report. For self-assessment of academic programs, data were collected from stakeholders like faculties, non-academic staffs, students, alumni, employers, parents, etc. Out of 12 departments, 11 departments were completed the SA activities up to post self-assessment improvement plan (PSIP) successfully. Only one department is unable to follow the planned schedule as could not complete the PSIP.

External peer review activities

A team for external peer review (EPRT) was constituted for each of the academic program reviewed (Fig. 3). Each team consisted of three members. One member of the team was a foreign quality assurance expert; one member was a local quality assurance expert and one member was a subject expert (Table 4). None of the team members was from the university or the university officials were not associated with EPRTs.

The external peer review teams reviewed each academic program based on the nine criteria (Table 3). The EPRT examined the self-assessment report and held meetings with the management viz. vice-chancellor, dean, chairman, provost, registrar, librarian, medical center, physical and sports office, etc. The team also interacted with the stakeholders like faculties, students, employers, alumni, non-academic staff of the concerned department.

The teams inspected audited documents and records maintained in the department and related to the examination procedures, minutes of meetings, list of academic staff members and their qualifications, list of publications, syllabus and curriculum, activities of committee of courses and studies, sample of question papers of students exams, sample of answer scripts, student attendance file/record, class schedule and course files. The external peer review team also observed the classroom teaching. The information relating to university organogram, admission test procedure, recruitment and promotion policy of teachers, handbook, lecture plan, was also sought and probed. The team visited faculties office room, library, department offices, laboratories, teaching and learning facilities, institutional quality assurance cell office, administrative office, examination hall, university computer center, sports facilities, transport facility, gymnasium, auditorium and cafeteria.

Table 4. External peer reviewers involved in the self-assessment process of the project

S. No.	Departments	External peer reviewers		
		Foreign (International) QA Expert	Local (National) QA Expert	Subject Expert
1	Computer Science and Engineering	**Prof. Dr. Ahmad Shukri Yahaya** School of Civil Engineering, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia.	**Prof. Dr. Bikash Chandra Sarker** Additional Director, IQAC, HSTU, Dinajpur.	**Prof. Dr. M. Shorif Uddin** Department of CSE, JU, Savar, Dhaka.
2	Information and Communication Technology	**Prof. Dr. Fauziah Ahmad** School of Civil Engineering, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia.	**Dr. Mohammad Najmul Islam** Director, IQAC, Pabna Science and Technology University, Pabna.	**Prof. Dr. A. M. A. Rahman** Department of ICE, University of Rajshahi, Rajshahi.
3	Environmental Science and Resource Management	**Prof. Dr. Ahmad Shukri Yahaya** School of Civil Engineering, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia.	**Prof. Dr. Mushfiq Ahmed** Director, IQAC, University of Rajshahi, Rajshahi.	**Prof. Dr. Md. Danesh Miah** Institute of Forestry and Environmental Sciences, CU.
4	Criminology and Police Science	**Prof. Dr. Ajmer Singh Malik** Department of Public Administration, Kurukshetra University, Haryana, India.	**Prof. Dr. Md. Solaiman Ali Fakir** Director, IQAC, BAU, Mymensingh.	**Prof. Dr. Monirul Islam Khan** Department of Sociology, University of Dhaka, Dhaka.
5	Food Technology and Nutritional Science	**Prof. Dr. Ahmad Shukri Yahaya** School of Civil Engineering, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia.	**Prof. Dr. Goutam Kumar Debnath** Additional Director, IQAC, CVASU, Chittagong.	**Prof. Dr. Md. Akhtaruzzaman** Institute of Nutrition and Food Science,DU, Dhaka.
6	Biotechnology and Genetic Engineering	**Prof. Dr. Fauziah Ahmad** School of Civil Engineering, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia.	**Prof. Dr. K. Alam Bhuiyan** Director, IQAC, BSMRAU, Gazipur.	**Prof. Dr. S.M. Mahbubur Rahman** Discipline of BGE, KU, Khulna.
7	Textile Engineering	**Prof. Dr. Partha Sarathi Roy** Center for Earth and Space Sciences, University of Hyderabad, India.	**Prof. Dr. M. Sayadur Rahman** Director, IQAC, Comilla University, Comilla.	**Prof. Dr. Md. Abdus Shahid** Dept. of Textile Engineering, DUET, Gazipur.
8	Chemistry	**Prof. Dr. K.K.D.S.Ranaweera** Dept. of Food Sci. and Tech., Univ. of Sri Jayewardenepura, Nugegoda, Sri Lanka.	**Dr. Md. Mer M. Hossain** Additional Director, IQAC, JUST, Jessore.	**Prof. Dr. Shariff Enamul Kabir** Department of Chemistry JU, Savar, Dhaka.
9	Physics	**Prof. Dr. Fauziah Ahmad** School of Civil Engineering, Universiti Sains Malaysia, Malaysia.	**Prof. Dr. M. Forhad Hossain** Director, IQAC, Bangladesh Textile University, Dhaka.	**Prof. Dr. Saleh Hasan Naqib** Department of Physics, University of Rajshahi, Rajshahi.
10	Mathematics	**Prof. Dr. Ajmer Singh Malik** Department of Public Administration, Kurukshetra University, Haryana, India.	**Prof. Dr. Ajit Kumar Majumder** Director, IQAC, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.	**Prof. Dr. Ganesh Chandra Ray** Dept. of Mathematics University of Chittagong.
11	Statistics	**Prof. Dr. Ajmer Singh Malik** Department of Public Administration, Kurukshetra University, Haryana, India.	**Prof. Dr. Tuhin Suvra Roy** Additional Director, IQAC, Sher-e-Bangla Agricultural University.	**Prof. Dr. Soma Chowdhury Biswas** Department of Statistics University of Chittagong.
12	Business Administration	**Prof. Dr. Partha Sarathi Roy** Center for Earth and Space Sciences, University of Hyderabad, India	**Prof. Dr. Sukumar Saha** Additional Director, IQAC, BAU, Mymensingh.	**Prof. Dr. Shah Alam** Department of AIS, University of Rajshahi, Rajshahi.

The external peer review teams adjudged the academic programs based on the nine criteria used for self-appraisal and with the cumulative numerical weight of 50 on a rating scale of 5. The rating was 5-Excellent (46-50), 4- Very good (36-45) and3- Good (26-35)**.** As per

this rating scale, the minimum to maximum score for an academic program ranged from 15 to 50.The departments those were completed the self-assessment activities, obtained scores ranging from 26-45 (Table 5). Ten departments were ranked 'good' and obtained marks in between 26 to 34. Two departments were ranked 'very good' and got a score of 36 to 45. The Computer Science and Engineering, and Chemistry departments got the highest score of 38.6.

Table 5. Judgment of the external peer reviewers based on the self-assessment reviewed

Sl. No.	Departments	Final score	Overall judgment
1	Computer Science and Engineering	38.6	Very Good
2	Information and Communication Technology	30	Good
3	Environmental Science and Resource Management	26-35	Good
4	Criminology and Police Science	26.5	Good
5	Textile Engineering	26-35	Good
6	Food Technology and Nutritional Science	26-35	Good
7	Biotechnology and Genetic Engineering	31	Good
8	Chemistry	38.6	Very Good
9	Mathematics	34.5	Good
10	Physics	29	Good
11	Statistics	34.2	Good
12	Business Administration	27	Good

Note: 0-15: Unsatisfactory, 16-25: Poor, 26-35: Good, 36-45: Very Good, 46-50: Excellent.

Views of external peer reviewers

The external peer review teams assessed the department on the basis of SARs and recommended to make up the deficiencies and adopt such measures oriented to bring quality changes in the university. These are:

Governance: The reports emphasized the need to digitalize the governance system both at university and department level in order to make available information (relating to vision and mission; students admission including handbook of information for guiding students to choose a course and institution; general information; statutes including rules and regulations relating to disciplinary actions, documents, administrative procedures, decisions and related matters; all matters related to examination; and feedback from concerned stakeholders) to all. A website for the department should be established and information as per global standards be made available there. The need for delegation of necessary powers especially to the office of the dean was also suggested to promote adequate faculty participation in decision making process with regard to financial management, curriculum development and review process etc. A culture to sign memorandum of understanding (MoU) with other reputed institutions including government is also expected as that may enrich not only academically but also professionally and with the financial and physical resources.

Curriculum contents, design and review: Linking education with employment sector is endorsed by all stakeholders. How to undertake it? The review process in this regard lead to conclude that the course curriculum should be re-oriented to achieve desired learning objectives and it should be practice-oriented instead of being theoretical one. Developing necessary communication skills and other soft skills among all students and its inclusion in the curriculum is also universally accepted by all stakeholders. Teaching-learning and learning assessment strategies with required level of clarity should also be an integral component of the curriculum. The academic contents of the course have to be made to match global standard and professional/ industry/employment sector needs. Since, there is inadequacy of teaching faculty therefore the team emphasized the need to make it up at the earliest and train the existing faculty for developing proper understanding and bringing requisite behavioral changes crucial for qualitative enhancement of higher education.

Student admission, progress and achievements: The EPRTs observed that the ICT has become instrumental in managing affairs of an entity in an effective manner and it is equally true in case of managing affairs of the students in every department. The teams consider that the department should initiate the process of making a digital data base to regulate all affairs like program implementation plan, weekly academic program, scholarship announcement, progress and achievements of the students and communication for various academic activities concerning students and continuous feedback from the stakeholders.The department should arrange regular seminars on the themes relevant to the academic program for quality enrichment of students and the seminar presentation must be made an integral part of the curriculum. The practice to conduct some classes by the practitioners/institutions/social organizations and people with real world data and faculty performance evaluation including by incorporating students is also emphasized.

Physical facilities: The teams observed the need for the provision of many physical facilities like enriched periodical section of the university library, computerizing library and procuring online resources to boost research activities of teachers and students; construction of students' halls (hostels) and quality boarding lodging facilities; quality health care facilities by procuring clinical laboratory, doctors and paramedical staff and ambulance for all including faculty, employees and students and; safe drinking water facilities at more places in the university. The seminar library in the department should be accessible to students and equipped with relevant reading materials (reference and text- books and journals). Provision of modern teaching aids in the classrooms, computer facilities for the students and staff should be undertaken. There is also the need of trained and skilled staff in the department for laboratories and administrative work.

Teaching, learning and assessment: It is true that the traditional teaching-learning method has its own significance but it must be improved by informing the students about the aims, objectives, learning outcomes and assessment methods of the program, informing about course and academic calendar and by providing course outlines/lesson plans before classroom deliberation, reported by external peer review teams. The written examination system requires improvements with due emphasis on presentation and case-study based

exam questions. The teams observed that there is a need for increasing students-teacher contact hours and formal feedbacks from the students need to be taken for the improvements and effective teaching-learning process.

Student support services: The students and their intellectual, social and psychological development is the primary concern of a university.Perhaps, with this belief in mind, external peer review teams emphasized the need for a student support/ advisory system for career counseling, academic counseling, sharing social and moral values and focusing skill development. A carrier guidance unit facilitating liaison between employers with students and provide training for interviews in the job market, writing resumes and other related activities for the job placement. There should be a student activity teacher in-charge for each batch of students to look after all kinds of academic and career counseling needs of the students. Besides, recommendations were also made to create sports and gymnasium facilities for students, strengthening transport services both for students and staff. The promotion of extra-curricular and co-curricular activities and their incorporation in academic calendar, organizing annual /alumni meet regularly may bring healthy academic culture in the university. The team also recommended to establish a female counseling cell for the female students.

Staff and facilities: The objectives of setting up a university can be realized only with the efficient and competent staff. The visiting review team emphasized professional development of faculty members both on teaching pedagogy and outcome-based education (OBE) and betterment of teacher-students ratio in the university. It is advised to maintain the academic performance records, KPI system and mentoring system for faculty members by the university. The university and department should arrange and encourage the faculty members to participate in the staff development activities; organize lecture series, seminar and workshop at regular interval for their professional development. Periodic training programs for non-academic staff of the university/department are also essentially required to keep them updated with the current issues related to their job areas and to be prepared for multi-tasking, observed by the reviewers.

Research and extension: The external peer review teams examined the research and extension activities of all entities under review and concludes that: teachers should be encouraged to go for PhD course and university/UGC should have suitable policy for this purpose as the existing one is not helpful in retaining the talent in the university, involve post-graduate students in research projects for developing their research skills and interest, motivate the faculty to hunt research fund from international and national funding agencies and priority should be given for innovative and need based research. The review process also focuses on the need to develop a mechanism to disseminate their research outcomes to the community by seminars or conferences, publish it in high impact factor and indexed journals of international repute and due weightage should be given while assessing the teacher for their career advancement. The research advisory board (RAB) should be formed including learned/well accomplished experts, industry and other stake holders.

Process management and continuous improvement: The experts also recommended that the university and every department of the university should develop a strategic improvement plan for the next four years and take initiative to review its existing policies and procedures, which are very important for better program management and quality assurance. The plan must have components like formal and peer review evaluation of teaching-learning to bring necessary improvements in it; installing grievance redressal systems for students, faculty members and non-academic staff; periodic self-assessment review by the department itself with due reflection of stakeholders in this review process; introduction of performance appraisal system for teaching and non-teaching staff; and training needs of the administrators for improving their interpersonal skills and to create a harmonious work ambience and culture. Concluding, the teams emphasized the role and importance of the IQAC institution in ensuring that the faculty members of the department are well-trained and well-versed in teaching learning, pedagogy and assessment-related matters.

Conclusions

The impact of institutional quality assurance process undertaken in MBSTU has created an awareness among stakeholders to strive for quality enhancement of existing teaching-learning system by identifying: requisite needs; securing necessary physical and human resources; restructuring existing curriculum with required learning outcomes; developing effective academic collaborations with the experts and professional institutions; and by bringing necessary modifications in the university administrative processes. The process of change is not static and one-time affairs rather it is dynamic and likely to continue in future. The self-assessment report itself had identified a number of areas for improvement together with weaknesses and challenges to achieve desired outcomes in teaching-learning and research. There is a difference of opinion of the current students, alumni and that of faculty members and the gap is evident in almost all aspects covered in the survey. Therefore, in order to enhance and ensure the quality in higher education, educational institutions are required to be more responsive to the changing needs of the stakeholders and the accreditation process is likely to help in meeting the standards. Therefore, the university authority took a good number of steps considering the reviewers comments and suggestions to meet the requirements of the stakeholders.

References

Cator, K., Schneider, C. and Ander-Ark, T. 2014. Preparing teachers for deeper learning. Digital promise. Accelerating innovation in education. Getting smart. Think, learn, and innovate. Retrieved from www.gettingsmart.com/publications

CP (Complete proposal). 2016. Complete project proposal for establishment of IQAC at Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail-1902, Bangladesh.

EPRR (External peer review report). 2018. External peer review reports of various departments of Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail-1902, Bangladesh.

Faraday, S., Overton, C. and Cooper, S. (2011). Effective teaching and learning in vocational education, information and customer centre. London, UK. Retrieved from www.skillsdevelopment.org

Haule, M.J. 2019. Curricula and pedagogical issues in designing oil and gas management programmes in Tanzania: a stakeholder based perspective. *International Research Journal of Curriculum and Pedagogy*, 5(1): 89-98.

IQAC Document. 2018. Documents related to workshops/ trainings organized by the IQAC, Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail-1902, Bangladesh.

IQACOM (Institutional Quality Assurance Cell Operations Manual). 2014. Institutional Quality Assurance Cell Operations Manual, Quality Assurance Unit of the University Grants Commission, Ministry of Education, HEQEP, Bangladesh.

Islam, M.S. and Paul, H.K. 2018. Activities of institutional quality assurance cell of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. *Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal*, 11: 315-321.

Mastropieri, M.A. and Scruggs, T.E. 1994. Text versus hands-*on science curriculum. Remedial and Special Education,* 15: 72-85.

PCR (Project completion report). 2018. Project completion report of IQAC at Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail-1902, Bangladesh.

SAM (Self-assessment manual). 2016. Self-assessment manual, 2nd ed., Quality Assurance Unit of the University Grants Commission, Ministry of Education, HEQEP, Bangladesh.

Tenaw, Y.A. 2014. Teacher attitude, experience and background knowledge effect on the use of inquiry method of teaching. *International Research Journal of Teacher Education*, 1(1): 2-9.

Journal of Saadat College
Volume-04, December 2023
ISSN: 2663-791X (Print)
2663-8304 (Online)

সুলায়মান কবীরের বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী একটি পর্যালোচনা

সানজিদা আক্তার কেয়া* শিপন রহমান**

ভূমিকা

উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের সূচনা, এর ক্রমবিকাশের কালপর্ব এবং বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে একটি ঐতিহাসিক সত্য অনস্বীকার্য যে, বাঙালি মুসলিমসমাজে নবজাগরণের উপলব্ধি এবং এতে তাদের অংশগ্রহণ বিলম্বিত হয়েছে। পলাশী যুদ্ধ ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের ম ধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান, অত্যন্ত বিবেকহীন শোষণের কারণে মাত্র দেড়যুগের মাথায় ভয়াবহ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' সংঘটন, আদালতে ফার্সির বদলে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের কারণে শিক্ষিত (আরবি-ফার্সি শিক্ষিত) মুসলমানদের বেকারত্ব, ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয়, অহমিকা, অন্ধ ঐতিহ্যপ্রীতি, সংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদি কারণে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজদের প্রতি চরম বিরুদ্ধ মনোভাব ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা ও অনাগ্রহ পোষণ করে যুগধর্মের স্বাভাবিক গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ-উত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলমান এলিট শ্রেণির মধ্যে স্বসমাজের পশ্চাৎমুখিনতা সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তা-চেতনার উদ্ভব হয়। বাস্তবতার অনিবার্য আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমান এলিট শ্রেণি একদিকে যেমন পরপর কতগুলো কার্যকর সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলে ও শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করে, অন্যদিকে তেমনি স্বসমাজের শিক্ষিতজনদের মধ্যে বোধের উন্মেষ ঘটাতে কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ ও তাতে লেখনির মাধ্যমে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। পশ্চাৎপদ শিক্ষাবিমুখ বাংলার মুসলিমসমাজের অস্তিত্ব রক্ষার এই নতুন সামাজিক সংগ্রামে বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সম্মুখবর্তী আলোক-সহযাত্রী মহৎপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পূর্ববাংলার ঐতিহ্যবাহী আটিয়া পরগনার জমিদার পরিবারের সন্তান ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলায় মুসলিম জাগরণের এই নবযাত্রায় আলোকবর্তিকা ধারণকারীদের মধ্যে

***পিএইচডি গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী**
**** কথাসাহিত্যিক**

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী নিজের নামটি সংযোজন করতে পেরেছিলেন সমকালীন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অনক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ মুসলিমসমাজে শিক্ষার আলো পরিব্যাপ্ত করে তাদের যুগধর্মের অগ্রসরমান কর্মপ্রবাহে অংশীজন করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, প্রজাহিতৈষী জমিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জনকারী আটিয়া পরগনার এই জমিদার পরিবার সম্পর্কে সাধারণ বাঙালি তো বটেই, শিক্ষিত বাঙালিদেরও ব্যাপক অংশের ধারণা অত্যন্ত ধোঁয়াশাচ্ছন্নই রয়ে গেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বাস্তবতার অভিঘাতে বিপর্যস্ত মুসলিমসমাজের ন্যুব্জ, ভগ্ন ও বিড়ম্বিত অবস্থার পরিবর্তনে নিরত ওয়াজেদ আলী খান পন্নী কিংবা তাঁর পরিবার সম্পর্কে ইতিহাসের শিক্ষক-গবেষক সুলায়মান কবীরের পূর্বে আর কেউ কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেছেন বা সমৃদ্ধ কোনো গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায় না; লেখকও তাঁর ভূমিকা অংশে আমাদের সেই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সুতরাং *বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী শিরোনামের* গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালের শূন্যতা পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। গ্রন্থটি লেখকের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে গবেষণালব্ধ এমফিল অভিসন্দর্ভ **বাংলায় মুসলিম রেনেসাঁ ও ওয়াজেদ আলী খান পন্নী**-এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ। ২০২০ সালের একুশে গ্রন্থমেলায় গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে সুবর্ণ।

ইতিহাস গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে সুলায়মান কবীর প্রণীত এই গ্রন্থটি স্থানীয় গবেষণার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু অধুনা সামগ্রিকভাবে সামাজিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এ জাতীয় গবেষণা স্বীকৃত ও গুরুত্ববহ। কেননা, বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সামাজিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে স্থানীয় ইতিহাসকে গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে এবং স্থানীয় ইতিহাসকে সামাজিক ইতিহাসচর্চার একটি শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনেক সময় জাতীয় ইতিহাসের ভিত্তি ও গতিপথকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে স্থানীয় ইতিহাসকে গুরুত্ব দিতে হয়। বর্তমানে এর জনপ্রিয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে সুলায়মান কবীরের গবেষণা গ্রন্থ *বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী* স্থানীয় ইতিহাসচর্চার একটি অনন্য উদাহরণ ও সংযোজন।

মূলপাঠ

গ্রন্থ পাঠে অগ্রসর হওয়া যাক। লেখক গ্রন্থটি তাঁর পরলোকগত পিতা-মাতার উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। সূচিপত্রের দিকে নজর দিলে দেখা যায়– ভূমিকা, উপসংহার,

১০টি পরিশিষ্ট (যার মধ্যে সা'দত কলেজের ছাত্র মাহফুজুর রহমান খানের নিকট লেখা কবি কাজী নজরুল ইসলামের চিঠি রয়েছে), গ্রন্থপঞ্জি, ১৬টি আলোকচিত্র-সহ ২৪০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির মূলপাঠ ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে।

ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকাতেই তিনি ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পরিচয়, জীবনের ব্যাপ্তিকাল এবং বাঙালি মুসলিম সমাজে নবজাগরণের ক্রমবিকাশমান কালপর্ব ও নবজাগরণের আলোকবর্তিকা হাতে অন্ধকার প্রশমনের আয়োজনে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের বরাত দিয়ে লেখক বাংলায় মুসলিম নবজাগরণের কালপর্ব নিরূপণ করেছেন ১৮৬৩ থেকে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ। অর্থাৎ ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর কমবেশি ৬৬ বছরের জীবনকাল (১৮৭১-১৯৩৬) এই কালপর্বের অন্তর্গত। ষোলশতকের শেষপাদে উত্থানপর্বের পরের চারশ বছর ধরে চলে-আসা বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার দক্ষিণ-পূর্ব অংশজুড়ে বিস্তৃত আটিয়া পরগনার এই প্রজাবৎসল জমিদার পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ সদস্য ওয়াজেদ আলী খান পন্নী। জমিদারির সিংহভাগ জনকল্যাণে ওয়াকফ করা, গণমুখী রাজনীতির ধারা অনুসরণ এবং ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের সক্রিয় অংশীজন হয়ে কারাবরণ, শিক্ষাবিস্তারে পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিভিন্নমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, বিভিন্ন শিক্ষাসমিতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা, প্রজাদের সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে প্রজাদেরকে তাদের ভোগদখলকৃত জমিতে পাকাবাড়ি নির্মাণ, পুকুর খনন ও গাছ কাটার অধিকার প্রদান প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি বাংলায় নবজাগরণের কালপর্বে নিজেকে একজন উজ্জ্বল আলোক-সহযাত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভূমিকায় ওয়াজেদ আলী খান পন্নী সম্পর্কে লেখকের সংক্ষিপ্ত এই চিত্রপট অঙ্কন এই গ্রন্থ পাঠে পাঠককে অধিক আগ্রহী করে তোলে।

অধ্যায় বিন্যাস

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। আলোচনাও আবর্তিত হয়েছে এই জমিদার পরিবারের বংশানুক্রমিক পদবির উৎস অনুসন্ধানকে কেন্দ্র রেখে। ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পূর্বপুরুষ এবং ঐতিহ্যবাহী এই জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ সাঈদ খাঁ পন্নী থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রজন্ম 'পন্নী' পদবি ব্যবহার করে আসছে। শুরুতেই লেখক 'পন্নী শব্দের অর্থ বা উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো ধারণা পাওয়া যায় না' স্বীকার করেও উৎস অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন এবং তা করতে গিয়ে

তিনি এ সম্পর্কে প্রচলিত মত ও পন্নী পরিবারের নিজস্ব বিবরণী নাকচ করে দিয়েছেন তথ্যসূত্র ও গবেষণার মাধ্যমে। এমনকি সৈয়দ গিসুদারাজ নামের আরব ধার্মিক পুরুষের উত্তরপ্রজন্ম বলে পন্নী পরিবারের দাবিও তিনি ভারতবর্ষে আগত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, বিশেষ করে মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর বংশগতির নৃতাত্ত্বিক ধারা-উপধারা সম্পর্কে তথ্য-উপাত্তসম্বলিত ব্যাখ্যা উপস্থাপনের মাধ্যমে ভুল প্রমাণে সমর্থ হয়েছেন। যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্বক লেখক পরিশেষে আফগান বংশধারায় পান্‌রী (Panri) উপগোত্র থেকে বিবর্তিত হয়ে 'পান্‌নী' বা পন্নী শব্দ বা পদবির উদ্ভব ঘটেছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সংক্ষিপ্ত এই অধ্যায়টি পাঠ করলে লেখকের গবেষণাপদ্ধতি, গবেষণার প্রতি নিষ্ঠা এবং বিস্তর পঠন-পাঠন সম্পর্কে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গ্রন্থটি পাঠে অগ্রসর হওয়ার অনুকূল ধারণা তৈরি হয়।

পদবিসংক্রান্ত আলোচনা শেষ করে লেখক দ্বিতীয় অধ্যায়ে পন্নী পরিবারের সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা ব্যাপক ও বিস্তৃত। দু'শর অধিক তথ্যসূত্র ও পাদটীকা সংযোজনের মাধ্যমে লেখক দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারটি শিরোনামে, যথাক্রমে– 'করটিয়ার পন্নী পরিবারের উদ্ভব সংক্রান্ত বিতর্ক', 'সাঈদ খাঁ পন্নীর জায়গিরদারি ও জমিদারি লাভ', 'ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পূর্ব পর্যন্ত পন্নী পরিবারের ঐতিহ্য', 'ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পরবর্তী সময়ে পন্নী পরিবারের ঐতিহ্য (২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)', আলোচনা বিন্যস্ত করেছেন। প্রতিটি শিরোনামে উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক উপশিরোনামের অন্তর্ভুক্তি পাঠককে গ্রন্থ পাঠের একঘেয়েমি থেকে রক্ষা করে।

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী এই জমিদার পরিবারের চারশতাধিক বছরের বিভিন্নমুখী ইতিবাচক ঐতিহ্যের গতিধারা উপস্থাপন করে লেখক একটি যুক্তিনির্ভর চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচনার এই পরিসরে পাঠক জানতে পারেন কয়েক শতাব্দীব্যাপী স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী এই পরিবারের ইতিহাসের ধারা কালের প্রেক্ষাপটে কীভাবে জাতীয় ইতিহাসের গতিধারাকে বেগবান ও সমৃদ্ধ করেছে। জানা যাচ্ছে, এই পরিবারের ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয়। অকুণ্ঠিতভাবে জনকল্যাণে অনুরাগী জমিদারির অযৌক্তিক দম্ভ ও আস্ফালনের চিরকালীন স্পর্ধা বর্জন করে সততা-নিষ্ঠা-ন্যায়ানুগ বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনচর্চার মাধ্যমে পন্নী পরিবার কীভাবে তাদের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রেখেছে এই গ্রন্থ থেকে সে বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

সাঈদ খাঁ পন্নীকে করটিয়া তথা টাঙ্গাইল অঞ্চলের পন্নী পরিবারের আদি পুরুষ বা বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। গবেষক পন্নী পরিবারের উদ্ভব সম্পর্কিত প্রচলিত বিবরণীর বিপরীতে যুক্তি ও তথ্য প্রমাণের আলোকে সাঈদ খাঁ পন্নীর জন্মের

ইতিহাস এবং তাঁর এ অঞ্চলে আগমনের ঘটনা পরম্পরা উপস্থাপন করেছেন। গবেষকের মতে, মীর্যা নাথানের "বাহারিস্তান-ই-গায়বী' গ্রন্থে উল্লিখিত অন্যতম মুঘল সেনাপতি বায়েজিদ খাঁ পন্নীই পন্নী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সাঈদ খাঁ পন্নীর পিতা। বাংলায় মুঘল শক্তির অগ্রযাত্রাকল্পে সাঈদ খাঁ পন্নী মুঘল সেনাপতি মানসিংহের সহকারী হিসেবে বাংলায় আসেন এবং ঈসা খাঁ ও মুঘলবিরোধী শক্তিজোটের বিরুদ্ধে মুঘল সেনাপতিকে সাহায্য করার জন্য আটিয়া অঞ্চলের জায়গির ও সরকার বাজুহার শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে কীভাবে আটিয়া পরগণা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং পন্নীদের জমিদারির সূচনা হয়েছিল সেই সব তথ্যও গবেষক সুনিপুণভাবে যুক্তিতর্কে তুলে ধরেছেন। আটিয়া পরগনার উত্থান ও বিকাশের বর্ণনার পাশাপাশি কীভাবে এ অঞ্চলের চূড়ান্ত অবক্ষয় হয়েছিল সে বিষয়েও গবেষক তথ্যের পাশাপাশি অনুমিত যুক্তির আলোকে পরবর্তীকালে আটিয়া থেকে মহকুমা সদর, আদালত ও থানা টাঙ্গাইলে স্থানান্তর, আটিয়াতে পন্নী জমিদারদের স্থায়ী কোনো আবাস গড়ে না ওঠার কারণ বর্ণনা করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যমুনা নদীর উদ্ভব এবং লৌহজং নদীর প্রবাহ ও গুরুত্ব হ্রাস পাওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ বলে মত দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে গবেষক আটিয়া অঞ্চলের নামকরণ, পন্নীদের আদি বাসস্থান, ঐতিহ্যবাহী আটিয়া জামে মসজিদ ও বাবা আদম শাহ কাশ্মীরীর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে পন্নীদের স্থায়ী বাসস্থান করটিয়া অঞ্চলে স্থানান্তর, বিশেষত সা'দত আলী খান পন্নী ও মাহমুদ আলী খান পন্নীর কর্মকাল ও জমিদারি ভাগ হয়ে অন্যান্য যে সকল ছোট বড় জমিদারির উদ্ভব হয়েছে তার বর্ণনাও এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

জন্মলগ্ন থেকে ক্রমঅগ্রসরমান জীবনের পথে এগিয়ে যেতে যেতে পরিণত বয়সে আত্মসংবরণপূর্বক স্থানিক ও কালিক পরিপার্শ্ব নিরীক্ষণ করে যুক্তিনির্ভর পন্থা অবলম্বন করে কর্তব্যকর্ম স্থির করতে পারে যে মানুষ ইতিহাস তাকেই কালজয়ী বরপুত্র বলে স্বীকৃতি দেয় কিংবা তাকে ঘিরেই ইতিহাসের গতিধারা নিয়ন্ত্রিত হয়–ওয়াজেদ আলী খান পন্নী সম্পর্কে এই মূল্যায়ন সর্বাংশে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন গ্রন্থকার গবেষক সুলায়মান কবীর। তৃতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত গ্রন্থকার ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর স্বরূপ সন্ধান করেছেন। বলা বাহুল্য, এই অংশই গ্রন্থের মূল উপজীব্য। পিতা হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর তত্ত্বধানে পারিবারিক পরিমণ্ডলে সুশৃংখল জীবনবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে বুৎপত্তি গভীরভাবে প্রোথিত হয় ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর জীবনগতিতে তারই একটা ইতিবাচক ফল ভোগ করে তাঁর সমকালীন সমাজ এবং বৃহত্তর অর্থে পূর্ববাংলার মুসলমান সম্প্রদায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা'। শিরোনামের দিকে লক্ষ করলেই আলোচনার পরিধি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। নাতিদীর্ঘ এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও জমিদারি সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়সমূহ। বিভিন্ন ভাষণ, বিবৃতি ও বাণী থেকে বাংলা ও ইংরেজিতে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি ফারসি ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ধার্মিক ও রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও পন্নী পরিবারে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার ঐতিহ্য, বিদ্যোৎসাহী মনোভাব এবং সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্যে তিনি একজন শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুবকরূপে গড়ে ওঠেন। তরুণ বয়সেই তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। এই অধ্যায় পাঠে পন্নী পরিবারে অভ্যন্তরীণ বিবাদ এবং সেই কারণে শরিকানা মামলা, অতঃপর দীর্ঘদিন মামলা-মোকদ্দমার পর সমঝোতার ভিত্তিতে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী পৈত্রিক সম্পত্তির বেশির ভাগ অংশ প্রাপ্তি সম্পর্কিত ঘটনা পরম্পরা বর্ণনার মাধ্যমে গ্রন্থকার মূলত ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর ব্যক্তিগত গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা যে সময় থেকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে সে সময়ে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী পরিবারের বৃহত্তর অংশের জমিদারির পূর্ণ কর্তৃত্ব (১৯০৫) পেয়েছেন। 'পূর্ণ কর্তৃত্ব' কথাটা এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, আধুনিক পন্নী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সা'দত আলী খান পন্নীর ওয়ারিশনামা অনুসারে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আটিয়া পরগণার জমিদারি প্রাপ্ত হলেও এ নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে এবং তা শেষ পর্যন্ত আইনি লড়াইয়ের পর্যবসিত হয়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী জমিদারির ১০ আনা অংশের মালিকানা লাভ করে বড় তরফের জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত আটিয়া পরগনার অংশবিশেষ নিয়ে তার মূল জমিদারি গড়ে উঠলেও তৎকালীন ময়মনসিংহ, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর জমিদারি বিস্তৃত ছিল।

গ্রন্থকার এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে জমিদারি প্রাপ্তিসংক্রান্ত বিরোধ-বিসংবাদের খবর জানিয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। জমিদার হিসেবে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী প্রজাবৎসল ছিলেন–এ তথ্য তাঁর পরগণার মধ্যে সর্বজনবিদিত। কিন্তু গ্রন্থকার এই গবেষণার মাধ্যমে সমসাময়িক ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনার উল্লেখপূর্বক একটি চমৎকার তথ্য উপস্থাপন করেছেন– ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'র মাধ্যমে জমিদারের জমির ওপর একচ্ছত্র মালিকানা অর্জন, অতঃপর ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাতে প্রজাস্বার্থবিরোধী ধারা সংযোজনের মাধ্যমে অর্জিত কর্তৃত্বের মাধ্যমে উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের জমিদারিতে প্রজাপীড়নের

যে সচরাচর চিত্র ইতিহাসে বিধৃত আছে আটিয়া পরগণার জমিদারিতে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না, বিশেষ করে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী যখন জমিদার তখন তো নয়ই। গ্রন্থকার আমাদের আরও একটা অনন্য তথ্য জানিয়েছেন– সামান্য শিক্ষা কর দিতে বেশির ভাগ জমিদারের অস্বীকৃতি এবং এ বিষয়ে প্রবল আপত্তির কারণে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় আইন পরিষদে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করানো যায়নি। কিন্তু ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ব্যতিক্রম উদাহরণ সৃষ্টি করেন। যেখানে অনেক জমিদারিতে প্রজাসন্তানদের শিক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল সেখানে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করতে অগ্রসর ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সা'দত কলেজই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এবং এটাই অবিভক্ত বাংলায় কোনো মুসলমান জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ। এখানেই ওয়াজেদ আলী খান পন্নী অনন্য। তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক একজন প্রজাদরদি জমিদার। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত অতঃপর মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেও প্রজাদের ওপর তিনি অতিরিক্ত কোনো কর ধার্য করেননি। বরং যথাযথ পরিচালনা ও ব্যয় সংকোচননীতি গ্রহণ করে তিনি জমিদারিকে লাভবান করে তোলেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনা, জনহিতৈষী নীতি ও প্রজাদের আন্তরিক সহযোগিতার কারণে জমিদারিতে কোনো প্রকার পত্তনি প্রথা বা মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব ঘটেনি বলে এ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থকার তথ্য ও প্রমাণের আলোকে দেখিয়েছেন, জমিদারিতে প্রজাসাধারণ নিপীড়নমূলক প্রশাসন ও অতিরিক্ত করভার থেকে নিরাপদ ছিল এবং সমকালীন মুসলিম জমিদারদের মতো তিনি লক্ষ্ণৌ বা কলকাতায় আমোদ-প্রমোদে সময় ব্যয় করেননি, বরং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে সভা-সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা, অতি দরিদ্রদের সহায়তার জন্য বিশেষ দপ্তর গঠন ও কর্মের ব্যবস্থা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার মতো বহুমুখী কল্যাণকর্মে নিয়োজিত ওয়াজেদ আলী খান পন্নী বাংলায় দ্বিতীয় মহসীন নামে পরিচিতি লাভ এবং আটিয়া পরগনার সর্বসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত 'আটিয়ার চাঁদ' খেতাবে ভূষিত হওয়ার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ইতিহাসের আলোকে তথ্যসমৃদ্ধভাবে গ্রন্থকার পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'উদার ও গণমুখী রাজনীতিবিদ'। শিরোনামের চমৎকারিত্বেই অধ্যায়টি পাঠে ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই আগ্রহী হবেন। জমিদার রাজনীতি করতে পারেন এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক জমিদার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজ তোষণের নিমিত্তে রাজনীতিতে অংশগ্রহণও করেছেন। কিন্তু ওয়াজেদ আলী খান পন্নীকে রাজনীতিবিদ হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে গ্রন্থকার পূর্বে দুটো বিশেষণ যোগ করেছেন– 'উদার ও গণমুখী'। জমিদার উদার ও গণমুখী

রাজনীতির ধারা অনুসরণ করেছেন– এই বিষয়টি অনন্য বললে অতিশয়োক্তি হবে না এবং কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। গ্রন্থকার বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা, সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং উনিশ শতকে বাংলায় পুনর্জাগরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং এর ক্ষেত্র প্রস্তুতে সভা-সমিতির ভূমিকা, বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন রাজনীতি, অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত এবং উত্তরকালে এর প্রভাব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর উদার ও গণমুখী রাজনীতির স্বরূপ সুস্পষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রন্থকার তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ যেমন করেছেন তেমনি পাশাপাশি শিক্ষাবিস্তারে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, নেতৃবৃন্দের স্বাতন্ত্র্যবাদীনীতি ও কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব, সরকারি আনুকূল্য থেকে বঞ্চনার আশঙ্কা প্রভৃতি কারণে মুসলিম নেতৃবৃন্দ যেখানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত ছিলেন সেখানে জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী গণমুখী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেন এবং সে কারণে কারাবরণ করলেন– গভীরভাবে ভেবে দেখলে সমকালীন প্রেক্ষাপটে এটা বিস্ময়কর মনে হবে। কেন পারলেন, কোন প্রেরণা তাঁকে তাড়িত করেছিল, এই অনুপ্রেরণার উৎসমূল কোথায়–গবেষক সুলায়মান কবীর এসব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন তথ্যসমৃদ্ধ পদ্ধতিগত গবেষণার আলোকে এবং সুস্পষ্ট করতে পেরেছেন যে, প্রতিভার ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল বহুধা বিস্তৃত কল্যাণমুখী কর্তব্যে নিযুক্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর রাজনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ সমন্বিত আদর্শ, পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠী-সহ অহিংস উপায়ে গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রধান উপকরণ হলো শিক্ষা। ওয়াজেদ আলী খান পন্নী এই সত্যটি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়। সে কারণেই বাংলায় মুসলিম জাগরণের পথ প্রশস্ত করতে তাঁর কর্মপ্রবাহ অব্যাহত দেখতে পাই। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের শেষ অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর কর্মময় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি-সহ বিভিন্ন সংগঠন ও সম্মেলনে অংশ গ্রহণ, করটিয়াতে হাইস্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপন ছাড়াও অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম উদ্যোগে প্রথম কলেজ স্থাপন, শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যেই জমিদারির অধিকাংশ ওয়াকফকরণ, বহু গুণী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং অনেক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে সহায়তা করা প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সমকালীন মুসলিম জমিদার ও নবাব পরিবারসমূহের শিক্ষাবিস্তারে অনগ্রসরতা ও উদাসীনতার যুগে ওয়াজেদ আলী পন্নী নিজেকে সমাজবিপ্লবের একজন ব্যতিক্রমী উদ্যোক্তা হিসেবে

প্রতিপন্ন করতে পেরেছিলেন। সা'দত কলেজে সকল ধর্ম-বর্ণের শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে তিনি অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবের পরিচয় দেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পরপরই অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থগারও তিনি স্থাপন করেন। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ হিসেবে সা'দত কলেজের প্রতিষ্ঠা-সহ শিক্ষাবিস্তারে তাঁর বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের ফলেই পল্লী বাংলার নিভৃত জনপদ করটিয়া সারাদেশে পরিচিতি পায়, সম্মানের অধিকারী হয়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম করটিয়াকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন–'আমি না দেখলেও জানি, করটিয়া শুধু একটা সাধারণ বিদ্যাপীঠ নয়– এ একটা অভিনব জ্ঞানকেন্দ্র। অতীতের আল-আযহার, বোগদাদের স্বপ্ন দেখছে করটিয়া।' তথ্য-উপাত্তের সমন্বয়ে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনাসমৃদ্ধ এই অধ্যায় পাঠে চমৎকৃত হতে হয়।

ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর জনহিতকর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল করটিয়া। তাঁর জমিদারির দূরবর্তী অঞ্চলের প্রজারা তাঁর প্রজাবাৎসল্যের তেমন সুফল পায়নি এমনকি তাঁর প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক তদারকি থেকেও বঞ্চিত ছিল। তিনি সুশীল চরিত্রের অধিকারী হলেও বিলাসী জীবন যাপন করেছেন। ঢাকা ও কলকাতায় জমিদারির কাজে ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাস করলেও রাঁচীতে বাস করতেন জমিদারসুলভ বিলাসিতায়। তিনি শিক্ষানুরাগী হিসেবে শিক্ষার প্রসারে কাজ করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি জমিদারদের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার পক্ষে ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করলেও নিজ উদ্যোগে কোনো পত্রিকা প্রকাশ করেননি। এ সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বলা চলে তাঁর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে পাদপ্রদীপের আড়ালেই থেকে গেছেন। প্রথম জীবনের শরিকি মামলা ও শেষ জীবনে মহামন্দাজনিত আর্থিক ক্ষতি এবং দীর্ঘ জেলজীবনের স্বাস্থ্যহানি তাঁর কর্মকাণ্ডকে অনেকটা বাধাগ্রস্ত করেছে। তাই সার্বিক বিবেচনায়, লেখক তাঁকে বাংলার মুসলিম জাগরণ বা রেনেঁসা যুগের একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিরূপে গণ্য করেছেন।

শেষকথা

আলোচ্য গবেষণাগ্রন্থে বিবরণ ও বিশ্লেষণ উভয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রধানত এটি তথ্য অনুসন্ধানমূলক গবেষণাগ্রন্থ। এ গবেষণা কাজে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় প্রকার উৎসই ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ করে মনে হয়েছে যে, গবেষক বিভিন্ন রকম তথ্য-উপাত্তের পাশাপাশি দক্ষতার সাথে যুক্তিনির্ভর অনুমান সংযুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থকার একদিকে যেমন

ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর কর্মকৃতি তুলে ধরেছেন তেমনি একনিষ্ঠ গবেষক হিসেবে তাঁর দুর্বলতা, দোষ ত্রুটিও তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তবে গবেষক পন্নীদের গুণকীর্তনে যতটা যত্নবান ছিলেন, তাঁদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতে ততটা যত্নবান ছিলেন বলে মনে হয় না। নিঃসন্দেহে এটি এই গ্রন্থের অন্যতম দুর্বল দিক। তাছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়বিন্যাসেও সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। কিছু মুদ্রণত্রুটিও সহজেই চোখে পড়ে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, গ্রন্থটিতে বাংলায় মুসলিম রেনেসাঁর প্রেক্ষাপটে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর জীবন ও কর্মকাণ্ড আলোচিত হলেও এতে রেনেসাঁ সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত। এ বিষয়ে পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ একটি অধ্যায় সংযোজন করলে নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির মান আরও বৃদ্ধি পেত।

কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও করটিয়া তথা আটিয়া পরগনার জমিদার পন্নীদের এবং এ অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস জানার জন্য বর্তমান গবেষণাগ্রন্থটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহার এবং যথোপযুক্ত বিশ্লেষণের কারণে সুলায়মান কবীর প্রণীত গ্রন্থটি আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়কগ্রন্থ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। বাহুল্যবর্জন, বক্তব্যের সীমানা সম্পর্কে সচেতনতা, তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারে সতর্কতা, প্রায় নির্ভুল বানানরীতি অনুসরণ, বর্ণনার ভাব ও ভাষার সাবলীল গতি গ্রন্থটি আগ্রহী পাঠকের কাছে অনবদ্য হবে বলেই প্রতীয়মান হয়।